COL-H04915-2-P

[illegible] তাঁহার ও কথামৃতের নিকট তাহা [illegible]ণীয়

[illegible] লিখিয়াছেন—"জাহাঙ্গীর [illegible] যে [illegible]রাগ দেখাইতেন—তাহা তাঁহার ধর্ম [illegible]। খ্রীষ্টধর্মে মদ্যপানসম্বন্ধে যেরূপ [illegible] তাহার কেবল তাহারই জন্য [illegible] তাহাদের [illegible]।

[illegible] যদিও [illegible] চলিত [illegible] ধর্ম [illegible] মধ্যে [illegible] দলই বেশী। তাহা- [illegible] সন্ধ্যার পর মদিরাপানের [illegible] ও নৃত্যগীতাদি চলিত; [illegible] বিশ্বাস করিত না। যদিবা- [illegible] তাঁহার [illegible] ধরিয়া [illegible]।

[illegible] উপবাস করিতেন, সে [illegible] করিতেন। তাহার [illegible] শৃঙ্খলাবদ্ধ [illegible] [illegible] তাহার [illegible]

[illegible] ছিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সাহেব তাঁহার লিখিত জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের [illegible] কহিয়াছেন—"[illegible] খুব চলিয়াছে—[illegible] বেগ [illegible] ধারণ করিয়াছে। [illegible] তাহাকে [illegible] [illegible] বর্ষ পতাকা উড্ডীন করিতেও পারে, এমন [illegible] সৈন্যাধ্যক্ষ মোকারেব খাঁ বাদশাহের সঙ্গে যোগ দিতে [illegible] বর্ষা আসিয়া তাঁহাকে [illegible] মোকারেবকে আর হাতীর উপর উঠিতে হইল না। এই [illegible] গিরিঠি জাহাঙ্গীরের পেয়ালা-বাহক পান-পাত্র [illegible] লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। বাদশাহ [illegible] বসিয়া মদিরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। [illegible] উপেক্ষিত করা হইল [illegible]

[illegible] পুনঃপুনঃ নিষেধসত্ত্বেও জাহাঙ্গীর [illegible] করিতেন। পরিশেষে যদিও রাজ্ঞী সম্রাটের এই [illegible] পরিমাণে সংশোধিত করিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীর [illegible] তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—[illegible] বিপদের [illegible] তাঁহার মদিরাসক্তি প্রবল ভাব ধারণ করিত। [illegible] তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে লইয়া যান [illegible] অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইলে [illegible] দেখিলেন, স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্র [illegible] [illegible] উপর [illegible] পড়িয়া [illegible]

[illegible] চেনার [illegible] মধ্যে [illegible] অবস্থানে [illegible] "জাঁহাপনা [illegible] কি [illegible] করিতে পারি [illegible] মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া [illegible] প্রশ্ন করিলে [illegible]

না। প্রেমের সহিত যদি সখ্য, বাৎসল্য, দয়া ও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল
হা হইলে সে ব্যক্তি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়; সে গার্হস্থ্য
গের উপযোগী পাত্র; সে বন্ধুবান্ধব পরিবারবর্গে পরিবৃত
সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করে। ইহার সহিত প্রতিবিধিৎসা
হিংসা বৃত্তি প্রবল হইলে নিজ পরিবারবর্গকে সে সাহস
শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাদের স্বত্বসমূহ বজায়
ার চেষ্টা করে এবং যদি তাহাদের প্রতি কেহ অন্যায়
চার করে তাহাকে বিধিমতে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়। স্ত্রৈ-
ক আসক্তির সহিত যাহার প্রশংসা-লালসা ও ভাবুকতা
সে স্ত্রীজাতি কিসে সন্তুষ্ট হয় কেবল তাহারই চেষ্টা করে;
দের নিন্দা প্রশংসা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে; বেশ-
যে রকম ধাঁচা তাহারা ভাল বলে তাহারই সে অনুবর্ত্তী
লে। যদি অর্জ্জন-স্পৃহা কম হয় এবং প্রশংসা-লালসা ও
শি হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের জন্য সে অকাতরে
করিতে পারে। যদি জুগোপিষা ও সখ্য প্রবল হয়,
হইলে সে ভালবাসা বাহিরে বেশি প্রকাশ করে না।
ভাব অনেক সময়ে তাহার হৃদয়েই বদ্ধ রাখে। কখন
সে ঔদাস্যেরও ভান করিয়া থাকে। কিন্তু জুগোপিষা
ইলে, সে তাহার হৃদয়ের প্রেম মুক্তভাবে ব্যক্ত করে;
ার একেবারে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এবং সেই সঙ্গে
আত্মমর্য্যাদা কম হয়, তাহা হইলে সে প্রেমে একেবারে
থাইতে থাকে। কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ও দৃঢ়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি-
বেশি হইলে, প্রেমে সে মগ্ন হইতে পারে কিন্তু এতটা অহ-
াকে যে সে সম্পূর্ণরূপে প্রেমের দাস হইয়া পড়ে না।
হার সখ্য, ভাবুকতা, প্রশংসা-লালসা, হাস্যপ্রিয়তা অত্যন্ত

বেশি ও অনুমিতি মাঝামাঝি, সে সুন্দরী, আমুদে ও জলাবর্তী লোকের সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করে এবং তাহাদিগকেই খোঁজে। যাহার সখ্য, দয়া, ভক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধি বেশি, সে সুরূপ ধর্ম্মানুরাগী ভগবৎ-ভক্ত স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগী হয়। সহিত তাহার যদি আবার বুদ্ধিবৃত্তি বেশি থাকে তবে সে ধর্ম্মরাগী, সুরুচিসম্পন্না বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের নিতান্ত ভক্ত এবং আমুদে স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যদি ধর্ম্ম কম ও অনুমিতি মাঝামাঝি ও ভাবুকতা অত্যন্ত বেশি তবে স্ত্রীলোকের নৈতিক গুণের জন্য সে বড় লালায়িত না; সেই সঙ্গে যদি ভাবুকতা, প্রশংসা-লালসা, হাস্যপ্রিয়তা, আশা ও ভাষা বেশি থাকে এবং ধর্ম্মবুদ্ধি যদি কম তবে সে স্ত্রীলোকদের সহিত ও তাহাদের সম্বন্ধে ঠাট্টাঠুট্টি থাকে এবং অবৈধ আমোদ-প্রমোদে রত হয়। যাহার ভাবুকতা, কৌতুকপ্রিয়তা, দয়া ও বুদ্ধিবৃত্তি বেশি, সে সুরুচিপূর্ণ অথচ সরস ও মধুর ভাষায় আপন প্রেম ব্যক্ত কিন্তু যাহার ভাবুকতা ও কৌতুকপ্রিয়তা কম সে কুরুচি ইতর ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি সে প্রবল প্রলোভনেও আত্মসম্বরণ করিতে পারে। ইহার তাহার যদি দৃঢ়তা, সাবধানতা ও অনুমিতি-বৃত্তি প্রবল হয় সে কিছুতেই প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করে না। কিন্তু সাবধানতা ও অনুমিতি যদি মাঝামাঝি হয়, তবে সে কখন প্রলোভনে পতিত হয়, কিন্তু তাহার পরেই অনুতাপ করে। তাহার সহিত প্রশংসা-প্রিয়তা প্রবল হইলে অত্যন্ত অনুতাপ লজ্জিত হয়। যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও অনুমিতি কম, সে এই বৃত্তির অপব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

যেতে নাহি দিব।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
নভের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর;
জনশূন্য পল্লিপথে ঘূর্ণি উড়ে বায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত কুকুরটি ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ধুলায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন,—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে;
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
বাঁধিছে বক্সের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও নয়ন তাঁর নাহি ফেলিবার
একদণ্ড তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কি কাণ্ড!
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোঝা বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কি করিব লয়ে? কিছু এর বেশি নাই
[illegible]

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোন জন। "কি আনি দেবাৎ
এটা ওটা আয়শ্চিত্ত যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিজুঁই বিশেষে!—
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান;
ও হাঁড়িতে চাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি; কিছু শুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভাল রাই-সরিষার তেল;
আমসত্ত্ব আমচুর; সের দুই দুধ;
এই সব শিশি কৌটা ঔষধ বিশুদ্ধ।
বিষণ্ণ রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়োনা, খেয়ো মনে করে।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ভার।

তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের; এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে গেছে স্নান সমাপন,

মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে ; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহারে। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে
চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"যাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল!

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে!
কে রে তুই, কোথা হতে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে' দুটি ছোট হাতে,
পারিবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
যদি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে কইটুকু বুকভরা স্নেহ!

ব্যথিত হৃদয় হতে মৃদুতম বাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করিবারে
এ জগতে,—শুধু বলে রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি।" সেই কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দি[illegible]।" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভোরে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে' এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
ভোঁড় পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপার্শ্বে, চেয়ে আছে সারাদিন
আকাশ ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রামত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।—দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর

"যেতে আমি দিব না তোমায়!" ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাব্ধির সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব" "যেতে নাহি দিব!" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব!" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব!"
আয়ুঃক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব না রে!"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব!" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!

চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয়-সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জনতা আঁখিতে
"দিবনা দিবনা যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে' তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।
সম্মুখ উর্ম্মির ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিবনা দিবনা যেতে"—নাহি আসে কেউ,
নাহি কোন সাড়া!

চারিদিক হতে আজি

বিশ্বাস করে মোর উঠিতেছে কাঁপি
সেই বিশ্বকর্মীদের [illegible] মতন
মোর [illegible] লিপির মতন
[illegible] দিবাকাল [illegible]
[illegible] পায় তাই সে [illegible], [illegible] সে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মত
অফুল্ল প্রেমের গর্বে [illegible] সে ডাকি
"যেতে নাহি দিব" : [illegible] অশ্রু-আঁখি,
[illegible] পলে পলে [illegible] গরল
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিচ্ছেদের ভাবে [illegible] কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
[illegible]—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন [illegible],
এমন [illegible], এমন অতুল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!
এত বাহু [illegible] করে সে [illegible]
"যেতে নাহি দিব!"—তখনি দেখিতে পায়
[illegible] ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিঃশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অবশেষে [illegible] দুটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে ধূলিতলে
[illegible]—তবু প্রেম বলে

"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।" তাই ক্ষীণবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি! মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা।
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে ধরিয়া আছে নিখিলের হিয়ে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে এ যেখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের এ মায়া!

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস উদাস্যভরে
মধ্যাহ্নে তপ্তবায়ু নিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে, খেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া দীর্ঘতর করি' অস্তাচলের তলে।

মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে আঙুরীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দীর্ঘশ্বাসে লীন, স্তব্ধ সর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

টা টো টে।

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির রূপ ভিন্ন প্রকার ভেদ কেন হয় এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাঙ্গলা শব্দে যে সকল উচ্চারণ-বৈষম্য আছে মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায় এ কথা আমি সাধনার পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাঙ্গলায় আদ্যাক্ষরবর্ত্তী অ স্বরবর্ণ কখন কখন বিকৃত হইয়া ও হইয়া যায়—যেমন কলু (কোলু), কাল (কোলি), ইত্যাদি—স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায়—যেমন খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা), ইত্যাদি—কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন গুটি-কতক নিয়মের অনুবর্ত্তী।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ই এবং উ স্বরবর্ণ বাঙ্গলার বহু

সংযুক্ত উচ্চারণ-বিকারের মূলীভূত কারণ উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। সে অথবা এ শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন সেটা, এটা। কিন্তু সেই অথবা এই শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে। যেমন এইটে, সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর টা হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সঙ্গত হয় না। ইকারের পরবর্ত্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

হইয়া—হয়ে	হিসাব—হিসেব
লইয়া—লয়ে	যাইনা—যাইনে
পিঠা—পিঠে	ভিক্ষা—ভিক্ষে
চিঁড়া—চিঁড়ে	শিক্ষা—শিক্ষে
শিকা—শিকে	নিন্দা—নিন্দে
বিলাত—বিলেত	বিনা—বিনে

এমন কি, যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায় সেখানেও এ নিয়ম খাটে। যেমন—

করিয়া—করে'

মরিচা—মর্চ্চে

সরিষা—সর্ষে

আ এবং ই মিলিত হইয়া যুক্তস্বর ঐ হয়। এজন্য ঐ স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায়। যেমন—

কৈলাস—কৈলেস

তৈয়ার—তয়ের

কেবল ইহাই নহে। ককারের সহিত সংযুক্ত আকারই একারে পরিণত হয়। কারণ, ককারই এবং ককারের যুক্তস্বর। যথা—

অজ্ঞান—অজ্ঞেন

কন্যা—কন্যে

বন্যা—বন্যে

ইত্যা—ইত্যে

আমরা যে বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও ইকার যায়। যেমন, নক্ষ (নোক্ষ), দক্ষ (দোক্ষ), ইত্যাদি। যে কারণবশতঃ ক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী অ ওকারে পরিণত হয় সেই কারণেই ক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার ও ইকার যায়। যথা রক্ষা—রক্ষ। আর আর যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে উদাহরণ আবশ্যক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই বিরত হইলাম।

ককারের অন্য ককারযুক্ত একটি কথা বলিয়া রাখি। ককারের ককারযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আকারের এ নিয়ম খাটে না; যেমন ত্যাগ, ন্যায়, ক্ষান্ত, আকাশ ইত্যাদি।

বাঙ্গালার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ছিল করিলা, যাইলা, করিবা, যাইবা, করিবা, যাইবা। এখন হইয়াছে করিলে, যাইলে, করিতে, যাইতে, করিবে, যাইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের এ হওয়াতেই যে আ স্বরবর্ণের এরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে ইকারের যেমন পরবর্ত্তী আ এ হইয়া যায় তেমনি পূর্ব্বে ইকারের পরবর্ত্তী আ ও হইয়া যায় এরূপ উদাহরণ বিরল আছে। যথা—

ফুটা—ফুটো

মুঠা—মুঠো

কুলা—কুলো

চুলা—চুলো

কুয়া—কুয়ো

চুমা—চুমো

ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ, ঔ, অ এবং উ মিশ্রিত যুক্তস্বর। যথা—

নৌকা—নৌকো

কৌটা—কৌটো।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার দুই একটা উচ্চারণ-বিকার এমনি দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হৌক তাহার অন্যথা দেখা যায় না। যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কে আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই ও উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় বদিও মুঠোকে মুঠো বলি তথাপি গ্রন্থ পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি—চলিত ভাষায় বড়ি নিন্দে, সাধু ভাষায় বাদ নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

অভিব্যক্তির ধারাত্রয়।

আশ্চর্য্য! এককালে দেখিয়াছি—

অ্যাঙ্ (A) বলিলেন "অভিব্যক্তি"।

ব্যাঙ্ (B) বলিলেন "অভিব্যক্তি"।

খোন্‌সে (C) বলিলেন "অভিব্যক্তি"।

এখন দেখিতেছি বিপরীত,—

এখন A বলিতেছেন "অভিব্যক্তি"।

B বলিতেছেন "অভিব্যক্তি"।

C বলিতেছেন "অভিব্যক্তি"।

ইহার অর্থ সকলেই বুঝিতেছেন—টীকা করা অধিকন্তু।

প্রথমে ডারুইন যখন নরের সংজ্ঞা করিলেন লাঙ্গুল-ভ্রষ্ট বানর তখন বড় বড় পাদ্রি সাহেবেরা তাঁহাকেই তাঁহার সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন; কাজেই তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিতে লোকে ভয় পাইল। এই জন্য, তখন ডারুইনের অন্তরঙ্গ-শ্রেণীর A-মহোদয়েরা যদি বলিতেন "অভিব্যক্তি", তাঁহার বহিরঙ্গ-শ্রেণীর B-মহোদয়েরা বলিতেন "অভিব্যক্তি" এবং তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় C-মহাত্মারা বলিতেন "অভিব্যক্তি"। কিন্তু সে দিন গিয়াছে;—এক্ষণে লোকে ডারুইন সাহেবকে তাঁহার সিদ্ধান্তের ব্যভিচার-স্থল বলিয়া কীর্ত্তন করে এবং তাঁহার প্রতিপক্ষদিগকে তাঁহার সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন করে;—এক্ষণে A-শ্রেণীর লোকেরা ডারুইনের সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার অনেক স্থানের গ্রন্থি-বন্ধন কাঁচা দেখিতে পাইয়াছেন, তাই এক্ষণে তাঁহারা "অভিব্যক্তি" না বলিয়া বলিতেছেন

"অভিব্যক্তি"; কিন্তু B-শ্রেণীর মহাত্মারা একবার যে-কোনো গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহার বাহিরে তাঁহাদিগকে নড়ানো যায়;—তাঁহারা গুরুপরম্পরায় যাহা পান তাহাতেই পরম সন্তোষ অবলম্বন করেন—গুরুর চক্ষুই তাঁহাদের চক্ষু, গুরুর কর্ণই তাঁহাদের কর্ণ;—সুতরাং প্রমাণের তাঁহারা বড়-একটা ধার ধারেন না;—এই জন্য ইহাঁরা নির্ভয়ে বলেন "অভিব্যক্তি"; C-মহাত্মারা অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ যে কি তাহাও জানেন না—কিন্তু সে বৃত্তান্তটি লোকের নিকটে গোপন করিতে ইচ্ছুক, তাই তাঁহারা বলেন "অভিব্যক্তি", অর্থাৎ তাঁহারা যেন এক এক জন এক এক ডার্‌উইন।

এই কারণগতিকে অভিব্যক্তিবাদ প্রথমে ছিল অবরোহী শ্রেণী

(A) অভিব্যক্তি (B) অভিব্যক্তি (C) অভিব্যক্তি

এখন হইয়াছে আরোহী শ্রেণী——

(A) অভিব্যক্তি (B) অভিব্যক্তি (C) অভিব্যক্তি

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবী যেমন গোলাকৃতি, পৃথিবীর গতিও সেইরূপ চক্রাকৃতি;—(১) দিন হইতে রাত্রি—রাত্রি হইতে দিন; (২) শীত হইতে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম হইতে শীত; (৩) ভাঙন হইতে গড়ন, গড়ন হইতে ভাঙন; (৪) অভিব্যক্তি হইতে লয়, লয় হইতে অভিব্যক্তি; (৫) অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি।

প্রথম বিবেচনায় এইরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় একটি বিবেচনা এখনো অবশিষ্ট আছে—সেটি এই; যদিও দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, তথাপি দ্বিতীয় দিন প্রথম দিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন—তৃতীয় দিন আরো বিভিন্ন, ইত্যাদি। মনে কর, আশ্বিন কি ভাদ্র মাসের শেষ দিন—রৌদ্র প্রচণ্ড; তখন হইতে দিকে

উত্তাপ অল্পে অল্পে হ্রাসের দিকে চলিতে লাগিল;—চারি মাস পরেই শীতের কনকনানি দীন দরিদ্রের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। দিন যেমন প্রতিদিনই নূতন, বৎসরও তেমনি প্রতিবৎসরই নূতন; আমাদের দেশে বিজয়া-দশমীর দিন এক সময়ে বৎসরের আরম্ভদিন ছিল এরূপ অনুমান হয়—এক্ষণে তাহা কত পিছাইয়া পড়িয়াছে!

অতএব পৃথিবীর গতি-মার্গ শুধু যে কেবল চক্র তাহা নহে, তাহা প্রচক্র; অর্থাৎ প্যাঁচ।

এই উপলক্ষে বাহিরে প্রসারণ বুঝায়;—প্রসারণ শব্দটিই আমার প্রমাণ। প্রশ্বাস অর্থাৎ বাহিরে প্রসারিত শ্বাস;—নিশ্বাস অর্থাৎ ভিতরে টানিয়া লওয়া শ্বাস; প্রবাস অর্থাৎ স্বদেশের বাহিরে বাস; নিবাস অর্থাৎ স্বদেশের ভিতরে বাস, ইত্যাদি। অতএব, প্রচক্র শব্দটি আমরা যদিও নূতন গড়িলাম, কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশীয় ভাষার প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে না; কেননা প্রচক্র শব্দের অর্থ আমরা এইরূপ করিতেছি—ভিতর হইতে বাহিরে ক্রমশ-প্রসারিত চক্র।

প্রচক্র চক্র

চক্রের উপর দিয়া চলিলে কিয়ৎ কাল পরে আমরা স্থানে আসিয়া পড়ি; কিন্তু প্রচক্রের উপর দিয়া চলিলে হয় আমরা ক্রমশই বাহির হইতে বাহিরে চলিতে থাকি (ইহাকে বলে Evolution, অভিব্যক্তি), নয় আমরা ক্রমশই ভিতর হইতে ভিতর দিকে চলিতে থাকি (ইহাকে বলে Involution, লয়)।

বিজ্ঞানের মতে অভিব্যক্তির আরম্ভ একটি বিন্দু হইতে (প্রটোপ্লাজম্ হইতে)। কিন্তু সে বিন্দু কিরূপ বিন্দু? বিন্দু তো

[illegible]

[illegible] বিন্দু—[illegible] [illegible]

[illegible] প্রাণ [illegible] [illegible]

—[illegible] বিন্দু [illegible] এ বিন্দু [illegible] বিন্দু [illegible]

[illegible] কিছু [illegible]। প্রথমতঃ এই বিন্দুর মধ্যে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] তাহার মধ্যে [illegible] আত্মরক্ষার এবং [illegible]

[illegible] যাহাকে আমরা বলিতে পারি [illegible]। এই

[illegible] জন্মতঃ অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তিতে [illegible]

[illegible] তিনটি মূল উপাদান একত্রে অভিব্যক্ত

হইয়াছে। [illegible] দেখিতে পাই - তিনের মধ্যে একটা [illegible]

[illegible] উচ্চ, সেইটিকে আমরা বলিব জ্ঞান উপাদান, তাহার

[illegible] নিম্নেরটিকে বলিব [illegible] উপাদান, [illegible]

[illegible] উপাদান। [illegible] উপাদানটি অহংবৃত্তি, [illegible]

[illegible] বৃত্তি, [illegible] উপাদানটি গঠন এবং অভিব্যক্তি। [illegible]

[illegible] বিভিন্ন অভিব্যক্তির [illegible] [illegible]

[illegible] প্রাণবৃত্তির অভিব্যক্তি ও গঠন এবং অভিব্যক্তির [illegible]

[illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible]—[illegible] [illegible]

[illegible], অহংবৃত্তি [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]

[illegible] আত্মরক্ষার কোনো [illegible] [illegible]

[illegible] বুঝিতে পারা যায় না। [illegible]

[illegible] "[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(১) প্রথমতঃ বুঝায় পক্ষীর ডানা অভিব্যক্ত হইয়াছে, পদ অভিব্যক্ত হইয়াছে, পুচ্ছ অভিব্যক্ত হইয়াছে ইত্যাদি; তদ্ব্যতীত অস্থি মাংস প্রভৃতির বিশেষত্বের অভিব্যক্তি যাহা ভিতরে হইয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ বুঝায়, পক্ষীর আকাশে উড্ডয়ন, গীতধ্বনি নিঃসারণ এবং আর আর প্রাণের স্ফূর্ত্তি যাহা সর্পজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৩) তৃতীয়তঃ বুঝায় যে, পক্ষীর আত্মরক্ষার ভাব আপনাকে ছাপাইয়া উঠিয়া সন্তান-রক্ষা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তাহার আমিত্ব উথলিয়া উঠিয়া মমত্বে (অর্থাৎ আমার-ত্বে) পরিণত হইয়াছে। সুতরাং পক্ষীর অহম্বৃত্তির পরিধি সর্পের অপেক্ষা বেশী।

অভিব্যক্তির ধারাত্রয় দেখাইয়াই আপাততঃ ক্ষান্ত হইলাম. আর এক সময়ে অভিব্যক্তির ভিত্তিমূলের পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বরলিপি।

দেশ—তাল কাওয়ালি।

বন্ আমার কি হয়েছে, কে তোরে কি কথা বলেছে,
ওরে আমার আদরিণী!
কিসের লাগি অভিমান, মুখখানি কেন ম্লান,
ছিছি সখি, মোছো আঁখি,
সুধামুখে হাস দেখি,
আয় কোলে, আয় মা, তোরে চুমি।

তালসহিত

| সরা মা : পা ধপা । র্সা র্সা : র্সর্রা র্সধা : পধা মপা ।
। [illegible] । মার কি, হা । যে ছে : কে, তো মে কি । [illegible]

। রা [illegible] । পধা ধপধা । পমা গরা : [illegible] ।
। যে ওহে : মা মার : আদ রি ॥ [illegible]

। র্সর্সা র্সা : র্সর্সা সধপা । র্সর্সা র্সা । ধপা [illegible] ।
। [illegible] মার । মুখ পানি । কেন নারে । ছিছি [illegible] ।

। র্সা র্সা । র্সা র্সা : ধপা ধপা : ধপা [illegible] ।
। কি, বোঁছে । [illegible] । [illegible] । হাস [illegible] ।

। রমা রমা । ধপা পা : ধপা পপা ॥ ॥
। [illegible] । আর মা : দেবে তুমি ॥ ॥

বেহাগ—একতালা।

[illegible] জানে [illegible]।
[illegible] যাদে ফিরে [illegible] বারে কিসে,
[illegible]।
[illegible]।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
[illegible]।

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে',
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে'।
পিছু হতে ডাকে মায়ার বাঁধন,
ছিঁড়ে চলে' যাও লোহের বাঁধন,
বাঁধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চকে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
শুনিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

৬৮

।। ন া। র্সা -া -া ॥ । নধা ধা। নর্রা র্সর্রর্সা নধনা।
-- আ গে। চ -- ল্ ॥ -- আ গে। চ ল্ ভা ।
॥
। পা ধধা না। র্সর্রর্সা -া -া। পপধা -প্রা প্রধা।
। ই আ গে। চল্ -- -। পড়ে -- থা ।
। পপপা মঃ পা। পপমা -পা মপমা। পাঃ পঃ মা।
। ল পি ছে। মরে -- ছে। কা কি কে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

। ধনাঃ -ধঃ -পা। পা পা পা। না না নর্সা। র্সা নর্সর্রা র্সা।
। রে — — —। পি ছু হ। তে ডা কে। মা য়া ম।

। র্সনা র্সা -া। র্সর্সা -া র্সা। র্সা নর্সর্রা -র্সা। নধাঃ -ধঃ পা।
। পা দম্ -া। ছিঁড়ে— চ। লে যা ও। মোহে— ন।

। নঃ -ধনর্সঃ না -া। র্সর্গা -া র্রা। র্গা র্গর্মর্গা র্মর্গা।
। পা — ধম্ —। সাধি — তে। হ ই বে।

। র্সর্রাঃ -র্গঃ র্রা। র্সর্সা -া -া। গা মা পা। পনা নধা না।
। প্রোণে — র। সাধম্ — —। মি ছে ম। র লে ন্।

। নর্সর্রা র্সা নধনা। পা নধনা না। র্সা -া -া না সা সা।
। র ন্ তা। ই আ গে। চল — —॥ চি র দি।

। পা পা পা। পা মা পধা। ঞর্সা র্সা ঞপা। পা ধা মপা।
। ন্ ন্যা ছি। ভি খা রী। র্ বে শে। জ গ তে।

। ধঞ্জা ধা পধপা। পনা -া -পমপা। মগা -া -া।
। ন্ প থ। পা — —। শে — —।

। র্সর্রা -া র্রা। র্গর্মা র্গাঃ -র্গঃ। র্সা র্গর্গা র্রা।
। যারা — চ। লে যায় —। কু পা চো।

। র্সা র্সা -া। গা মা পনা। না নধা না। নর্সা -র্সর্রর্সাঃ -নঃ।
। খে লা য়। প থ্। লা উ ড়ে। আ — —।

। নাঃ -ধঃ -পা। পপা -া পা। নাঃ নঃ না।
। সে — —। ধূলি — শ। ম্যা ছে ড়ে।

। নর্সা -নর্সর্রা র্রর্সা। র্সাঃ র্সঃ র্সা। র্সা র্সা র্সা।
। ওঠ — ও। ঠ ন বে। মা ন বে।

। -া র্রা র্সর্নর্সা। নাঃ ধঃ পা। নঃধনঃ র্সনা না।
। ন্ সা থে। বো ন্ দি। চলে — চ ল।

। র্সর্গা -া র্রা। র্রর্মাঃ র্গঃ র্গা। র্সর্রাঃ-র্গঃ র্রা। র্সা র্সা র্সা।
। তায় — দি। না পা র্র। চেয়ে — দে। ধ ত বে।

। গমা -া পা। পনা নধা না। নর্রা র্সর্রর্সা নধনা।
। ঐ — আ। ছে র্র সা। ত ল্ ভা।

। পা নধা না। র্সা -া -া॥
। ই আ গে। চল্— — ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

(১) ।=এক মাত্রা। দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে আকার বসাইলে এইরূপ বুঝায় যে ঐ স্বরগুলি এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে। যথা, সরসনা।

ঃ=অর্দ্ধ মাত্রা। ।ঃ=দেড় মাত্রা।

(২) ল=কোমল র; গ্ল=কোমল গ; ম্ল=কড়ি ম;

দ=কোমল ধ; ঞ=কোমল ন।

(৩) খাদ স্বরের চিহ্ন=হসন্ত; উচ্চ স্বরের চিহ্ন=রেফ্।

(৪) ॥ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া আস্থায়ীর যে স্থান হইতে ধরিতে হইবে তাহার আগে যুগল ছেদ থাকে। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় তাহার শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে।

(৫) এক মাত্রা কালস্থায়ী বিরামের চিহ্ন=হাইফেন-বিরহিত আকার।

(৬) যে স্বরের নীচে গানের কথা নাই—যেখানে পূর্ব্ব কথার টানটি চলিতেছে সেইখানে হাইফেন বসে।

(৭) দ্বিতীয় গানটির উপরে "৩" এই যে তালাঙ্কটি আছে, ইহার অর্থ এইঃ—এই গানটির প্রত্যেক তাল-বিভাগের অন্তর্গত

তিনটি কড়িয়া মাত্রা আছে। তাই, আকারের দক্ষিণপার্শ্বে এই সংখ্যাটি দেওয়া হইয়াছে। এই যে তিনটি কড়িয়া মাত্রা আছে, ইহার প্রত্যেক মাত্রাটি কতক্ষণ স্থায়ী তাহা জ্ঞাপনার্থ আকারের দক্ষিণপার্শ্বে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, এক দুই তিন, এক দুই তিন, এই-রূপ খুব তাড়াতাড়ি এক হইতে তিন পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে যতটা সময় লাগে উহার প্রত্যেক মাত্রাটি তত-কাল স্থায়ী। কতটা দ্রুত, কতটা বিলম্বিত এই চিহ্নের দ্বারা তাহা জানা যায়।

সিংহল-ভ্রমণ।

১৪ই অক্টোবর ২৮শে আশ্বিন।

আজ সকালবেলা উঠিয়া সহরটী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। সহর অপেক্ষা সহরতলী দেখিতে অতি সুন্দর। বাড়ী-গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মাঝে মাঝে বড় বড় নারিকেলের বাগান ও খেজুরের গাছ। এই সকল বাগানের মধ্যে অতি পরিষ্কার এক একটী বাংলা। নারিকেল-বাগানে ছোট ছোট গাছে নানা রঙের নারিকেল ধরিয়াছে—লোকে ইচ্ছা করিলে হাত বাড়াইয়াই নারিকেল পাড়িতে পারে। এখানে নারিকেলের ব্যবহার খুব বেশী; এমন কি পাক করিবার সময় জলের পরি-বর্ত্তে নারিকেলের দুধ ব্যবহার হয়। সর্ব্বপ্রকার নারিকেল আছে তন্মধ্যে কিং কোকোনাট্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার নীচেই বিল্ক কোকোনাট্। কিং কোকোনাট্ ছোট হরিদ্রাবর্ণ, ছোট ছোট গাছে অল্প অল্প ফলে। বিল্ক কোকোনাট্ বড় ও সবুজবর্ণ।

[illegible] ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহলবাসী কোন বন্ধুর সহিত [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মিশর দেশের [illegible] পর তিনি ইংরাজ [illegible] গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক সেখানে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা মাসহারা দেন, উহাতেই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আমাদের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চম বৎসর, মুখ দেখিলেই একজন বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাঁহার সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। ঘর একটি বড় বাংলা। বৈঠকখানা ইংরাজী আসবাবে সুসজ্জিত; ঘরের চারিদিকে কোচ ও চৌকি, মাঝখানে একটি টেবিলের উপর কতকগুলি পুস্তক। আমরা বসিবামাত্র স্বহস্তে আমাদিগকে চুরুট দিয়া আমাদের সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন—আপনারা বিদেশী হইয়া এদেশে এত সুদূর লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এ জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। টেবিলের উপর যে পুস্তকগুলি ছিল সেইগুলি দেখাইয়া তিনি বলিলেন—ইহারাই আমার পরম বন্ধু; দিনরাত্রি ইহাদের সহিত গল্প করিয়া কাল কাটাই। এগুলি কেবল ইতিহাস। পৃথিবীতে যে দেশে যত প্রকার ইতিহাস পাওয়া যায়, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজের মতামতসহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। দিনের বেলা অনুবাদ লিখেন, রাত্রিকালে সেইগুলি পরিষ্কার করেন। এখন [illegible] শেষ হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন—আমার [illegible] করিবার এই উপায়টী [illegible] ইলে একদিন [illegible] পুস্তকগুলি খুলিয়া দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন—

ইহারাই আমার প্রকৃত বন্ধু, ইহার
তেছে। প্রায় ছয় বৎসর হইল ই
সময়ের মধ্যে ইনি শিক্ষকের সাহা
কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর
সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের ব্যবহার
বলিলেন। ইনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের
য়াছেন, সেগুলি দেখিলে ইহাঁকে ও
বোধ হয়। ইনি আরবি পাশার

আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতে
ছোট ছোট পেয়ালায় কাফি লইয়া
ভৃত্যের পরিচ্ছদ বেশী জমকালো
হইলে তবে পাশা নিজে পান ক
পেয়ালা লইবার সময় এবং পা
উঠিবার তাহাকে অভিবাদন করি
নূতন ঠেকিল।

বাসায় আসিয়াই আহার করি
রওনা হইলাম।

গাড়ী চড়িবার চারি পাঁচ মি
এখানে রেলগাড়ীতে কয়লা ব্যব
কয়লার ধুমি নাই। কয়লার
গাড়ীতে যত যাত্রী ছিল সকলে
স্থান হয় সে জন্য চেষ্টা করি
করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ।
লোক খুব সরলপ্রকৃতি ও ভদ্র

কলম্বো হইতে প্রথম ষ্টেশন

কলম্বো পর্য্যন্ত রেলের দুই ধারে বড় বড় নারিকেল ও সুপারির বন। কলম্বো হইতে পামগোহালা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছোট ছোট পাহাড়, তাহার উপর নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির জঙ্গল। চারিদিকে পাহাড় হইতে অজস্র ঝরণার জল পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমতল ভূমিতে ধান্যক্ষেত্র। পামগোহালার পরে একটী বড় নদী; উহাকে মহাবালুকা গঙ্গা বলে। এদেশে নদীর নাম গঙ্গা।

গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতেছে। গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইখানা ইঞ্জিন। পথ অতি দুর্গম; বড় বড় পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া টানেল প্রস্তুত করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক একটী টানেল অতিক্রম করিতে আট দশ মিনিট সময় লাগে; ঘোর অন্ধকার, এমন কি দিবাভাগে নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আশপাশের গহ্বরগুলি এত গভীর যে দেখিলে মাথা শিহরিয়া উঠে। এইরূপ এক স্থান এত উচ্চ ও দুর্গম যে সেই স্থান হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ভয় হয়। ইংরাজদিগের এই স্থানটিকে সেন্সেশনল্ পয়েন্ট বলে। কিন্তু কি সুন্দর দৃশ্য! চারিদিকে পর্ব্বত, মাঝে মাঝে আম, নারিকেল ও সুপারির বন, মধ্যে মধ্যে বিবিধ লতাপাতাসুশোভিত নিকুঞ্জবন। পাহাড়ের পাদদেশে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে। এখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনে হইল মাইকেল যথার্থই বলিয়াছেন—অয়ি চারু লঙ্কে, জগৎ-বাঞ্ছা তুই সুখের সদন।

এখানকার রেলওয়ে-ষ্টেশনে একটী মাত্র আলো থাকে; গাড়ি ছাড়িবার সময় ঘণ্টা দেয় না। ডাকগাড়ীর সহিত একখানা ঘরিয়া গাড়ী থাকে উহাতে খাদ্য বিক্রয় হয়।

কামবুকনা ষ্টেশন হইতে ক্যাণ্ডি পর্য্যন্ত রেল অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে।

আমরা রাত্রি আটটার সময় ক্যাণ্ডিতে পৌঁছিলাম। প্রিয় ভ্রাতা ধর্ম্মপালের কয়েক জন বন্ধু অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বুদ্ধিষ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আর একজন সম্ভ্রান্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি—ঐ স্কুলের সেক্রেটারী, এবং আর একজন ঐ স্কুলের ছাত্র।

আমাদের বাসা বুদ্ধিষ্ট হাইস্কুলের ছাত্রদের বোর্ডিংয়ের দোতলায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। মফস্বল হইতে যে সকল ধনবান লোকের ছেলেরা এস্কুলে পড়িতে আসেন তাঁহারাই এই বোর্ডিংয়ে বাস করেন। এই বোর্ডিং-হাউসে ছেলেদের আহারাদির বেশ সুবন্দোবস্ত। শিক্ষাবিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি আছে।

বৃষ্টি হইতেছিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছাত্র ও শিক্ষকগণের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিতে শয়ন করিয়া সিংহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কমল-কুমারিকাপ্রশ্ন।

(সেয়ামী হইতে অনুবাদিত)

বৌদ্ধ উপাখ্যান।

বৌদ্ধধর্ম্মে একটি উন্নত ও মহৎ কথা আছে। তাহা এই যে, আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মানবের অসোগত তার স্বীয় শক্তিদ্বারা সফলতা লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এরূপ ক্ষমতা যে সকলেরই আছে তাহা নয়। ইতর লোকের ইহাতে কোনই অধিকার নাই, তাহাদের নির্জ্জীব বাসনা স্বপ্ন অপেক্ষা অস্পষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, সংকল্পসাধনে অক্ষম; কেবল-মাত্র মানসিক জীবনের একাগ্র চর্চ্চাই অলৌকিক ফললাভের একটি উপায়।

সিদ্ধিপ্রয়াসী ব্যক্তির মনোনিবেশ কতকাল স্থায়ী হয় তাহার উপর বিশেষ কিছুই নির্ভর করে না। অনেক সাধুপুরুষ ত নির্জ্জন অরণ্যে ও নিস্তব্ধ আশ্রমে সমস্ত জীবন নিরন্ন ধ্যানে যাপন করিয়াছেন, অথচ কখনও কাহারও একটি মাত্র আনন্দোচ্ছ্বাসে কোন তেজস্বী ভক্ত হৃদয়ের অনৈসর্গিক নমস্কার পূর্ণ হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, অন্তর্নিহিত বাসনার আবেগই প্রকৃতপক্ষে ফলদায়ক।

এই বিশ্বাসের সত্যতা অনেক অকাট্য দৈব ঘটনাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে হয়ত নিম্নলিখিত ঘটনাটি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য।

(১)

শতবর্ষীয় সিডার ও প্লেনবৃক্ষসঙ্কুল একটি বনপ্রান্তে তিনটি অল্পবিস্তৃত সরোবর পরস্পরের জলে জল মিশাইতেছে; তাহাদের উপরিভাগস্থিত কমল-পুষ্পাবরণে যে বীর স্রোত লক্ষিত হয় না।

প্রথম সরোবরটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং তীরস্থ তরুর শাখায় প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত; তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন একটি ঝরনা এই তিনটি জলাশয়কে পরিপোষণ করিতেছে। সরোবরগুলির তীরে মন্দির, পাগোডা ও দীর্ঘ সৌধশ্রেণী বিরাজমান।

ইহাই বিখ্যাত কমল-কুমারিকাশ্রম; কেবলমাত্র চীনদেশে

বিখ্যাত নহে—জাপানে, কোরিয়া রাজ্যে, আসিয়ার সীমান্তে যে কোন প্রদেশে বুদ্ধের জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বস্থানেই ইহা প্রসিদ্ধ। দুই শত বৎসর হইল একদল কুমারী এখানে একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, সেই অবধি কত সহস্র রমণী ইহার ভাবমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট, সংসারক্লেশে তাপিত বা পাপে অনুতপ্ত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পরম ধন, অর্থাৎ বিমুক্তি, লাভ করিয়াছিল, বিশ্বসংসার মায়া জানিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছিল, এবং ইন্দ্রিয় সংযম সেই নয়সাধন করিয়াছিল যাহা চরম নির্ব্বাণের প্রথম সোপান।

বহুকাল পূর্ব্বে একটি অলৌকিক ঘটনাদ্বারা এই সরোবর-শোভিত স্থানটি কোন মহৎ ধর্ম্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠাভূমিস্বরূপ সূচিতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একদা নির্ম্মল নিদাঘ-নিশীথে, চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে যখন তারাগুলি অদৃশ্যপ্রায়, তখন আকাশ হইতে সরোবরের স্থির জলে, কমল-বীজ বর্ষিত হইয়াছিল। পরদিবস প্রত্যূষে, সরোবর-বক্ষে শ্যামল পদ্মপত্রজাল বিস্তীর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে পত্রগুলি পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমুদায় জলাশয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপরে সন্ধ্যাগমে, যে মুহূর্ত্তে সূর্য্য আকাশ-সীমান্তে অস্ত গেল, সমস্ত পুষ্প একত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের আরক্ত দলগুলির সুকুমার সুগন্ধ আরতি-ধূপের ন্যায় আকাশ অভিমুখে উত্থান করিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সরোবরটির পূর্ব্ব তীরে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং সম্মুখে একটি দীর্ঘ মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গণ, তাহাতে তাম্রকলসমধ্যে উৎস উঠিতেছে। প্রাঙ্গণের দ্বারদেশ হইতে কেবলমাত্র মন্দিরের ছাদ দৃষ্ট হয়—নীল-ইষ্টকমণ্ডিত ভীষণাকার স্বর্ণজন্তুবিশিষ্ট, মধ্যস্থলে

নিম্ন এবং চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ, যেন একটা বৃহৎ খাঁদিয়া। এই ছাদ ভূমির এত নিকট-পর্য্যন্ত নামিয়াছে এবং এতদূর ছায়া বিস্তার করিয়াছে যে, মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ সিঁড়ারস্তা ও প্রবেশদ্বার প্রথমে চক্ষুগোচর হয় না। কিন্তু নিকটে আসিয়া মন্দিরের বর্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তিতলে দাঁড়াইলে মুক্ত বাতায়ন দিয়া সমস্তই অভ্যন্তরদেশ এক দৃষ্টিক্ষেপেই লক্ষিত হয়। মন্দির শত শত দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায় পূর্ণ; তাহা দেখিয়া মনশ্চক্ষুর সমক্ষে সেই লোকান্তর-দৃশ্য উদয় হয়, যেখানে দেহমুক্ত আত্মা গমন করে, যেখানে জন্মবন্ধনহীন দীপ্যমান প্রাণীসকল বিচরণ করে!

দেবালয়ের রহস্যময় সুদূর অন্তর্দ্দেশে ধূপপাত্র হইতে নিয়তই যে নীলাভ ধূম উত্থিত হইতেছে তাহার অপর প্রান্তে বুদ্ধদেবের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি কমলাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। অন্য সকল দেবতার উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বীয় আত্মাদ্বারা এই পবিত্র নিকেতন পূর্ণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় সরোবরটির নিকট অপেক্ষাকৃত সামান্য গৃহসকল রহিয়াছে; ইহা কুমারীগণের বাসস্থান, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ দীর্ঘ বারান্দার তলে শ্রেণীবদ্ধ; ইহার পরে ঘণ্টার ঘর এবং পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদির ভাণ্ডার।

অবশেষে ক্ষুদ্রতম সরোবরটির ধারে কেবল একটিমাত্র প্রশস্ত পাথোড়া কামেলিয়া আজালিয়া প্রভৃতি পুষ্পকুঞ্জদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

এই ছোট মন্দিরটি কানন দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। তিনি অনন্ত অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় আকাশের মহীয়সী রাণী; অন্য-

বসনা মহাদেবী, চিরপাবনা, চিরমধুরা চিরকরুণাময়ী।" কেবল তাঁহারই প্রতিরূপ এখানে বিরাজ করিতেছে; প্রাচীরে লম্বমান একটি রেশমী কাপড়ের উপর তিনি চিত্রিত রহিয়াছেন। পরিধানে দীর্ঘ শুভ্র বেশ, হস্তে একটি পদ্মপুষ্প, মস্তকের চতুর্দ্দিকে কনকচ্ছটা; যেরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া বহুকালপূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বসাগরের নীল তরঙ্গ-রাশির উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং মানবের দুঃখ-দৈন্য লাঘব করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনের সৌন্দর্য্য, তাঁহার বচনের মাধুর্য্য ও তাঁহার হৃদয়ের অপরিমিত মমতা আনিয়া দিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি।

দেবীর পদতলে ভূমির উপর একটি উইলো-শাখা জলে নিমগ্ন রহিয়াছে; শুষ্ক তৃষিত চিত্তকে কানন দেবী, যে পবিত্র বারিবিন্দু-সিঞ্চনে তৃপ্ত করেন এই আর্দ্র শাখা তাহারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বেদীর উপর প্রজ্বলিত দুটি লাল মোমের বাতি দেবালয়ের মধ্যে একপ্রকার ম্লান আলোক, এক কোমল দীপ্তি বিস্তার করিতেছিল; পুষ্পপাত্রপূর্ণ ম্যাগ্‌নোলিয়া-কুসুমের সুগন্ধ চিররক্ষিত ধূপের সৌরভের সহিত মিশিতেছিল। এই মন্দির এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ কামেলিয়াকুঞ্জ যেন আশ্রমের মধ্যেও একটি নিভৃত নিলয় রচনা করিয়াছিল, এই স্থানটী এমনি শান্তিময়, নিস্তব্ধ, রহস্য-পরিবৃত ও ধ্যানানুকূল।

অপরাহ্নে এই পাগোডা যে ক্ষুদ্র সরোবরে আপন ছায়া ভাসাইত, সেটির মধ্যেও একটি পুণ্য প্রভাব ছিল। কুমারিকাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রীগণ এটিকে একটি পবিত্র মৎস্য-সরোবর করিয়া তুলিয়াছিলেন, কারণ, বুদ্ধদেব ইহারই জলে কমলবীজ নিক্ষেপ করিয়া অবশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার এই অতি প্রিয় উপদেশটি এই স্থানেই বিশেষরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে—"প্রাণ-

সারসংগ্রহ।

নূতন "ফেডারেশন"।

উপনিবেশস্থাপন এবং রাজ্যবিস্তারের সহিত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মনে এক দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে যে, এই সকল শতযোজনব্যবহিত ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড চিরদিন কখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে না—আজই হোক্ কালই হোক্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের শাসনকর্তৃত্ব বন্ধন ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং এইবেলা দিন থাকিতে সেই ভাবী অনিবার্য্য বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, কিম্বা এমন কোনও অমোঘ সদুপায় অবলম্বন করা যাহাতে অনিবার্য্য বিচ্ছেদ ঘটিবার কারণ না উপস্থিত হয়।

অধিকাংশ বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগের মতে এ বিচ্ছেদ নিবারণ করা মানবচেষ্টার সাধ্যাতীত। কিন্তু জর্জ পার্কিন প্রভৃতি একশ্রেণীর লেখকগণের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহাঁদের মত এই যে, বাষ্পযান এবং তাড়িতবার্ত্তাবহের কল্যাণে প্রাকৃতিক ব্যবধান এখনকার দিনে নগণ্যের মধ্যে, সুতরাং ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের সহিত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশসমূহের বৃহৎ একটি যুক্তরাজ্যরূপে অবস্থিতি তাদৃশ অসম্ভব নয়। এবং এরূপ দৃঢ় যোগবন্ধন যখন সকলেরই পক্ষে সুবিধাজনক তখন কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যেখানে বন কাটিয়া বা ঝোক মারিয়া জন্ বুলের বৎস লাভ

পাঁচ শত বৎসর যে সাধ করিয়া লইয়াছে, সেই সেই স্থান লইয়া একটি 'ইম্পিরিয়াল্ ফেডারেশন্' গঠিত হউক।

কিন্তু এক মহা সমস্যা ভারতবর্ষ। তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব—অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া ইংলণ্ডের একদণ্ড চলে না। ইংরাজ প্রজাবীর অন্যের সংস্থান ভারতবর্ষ। বড় সামান্য সংস্থান নহে—বৎসরে প্রায় একশত কোটি টাকার বাণিজ্য। ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিলে লাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কে মাসে পনের দিন উপবাস করিতে হয়, তন্তুব্যবসায়ের তিন-চতুর্থাংশ কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ডাণ্ডীর পাটের ব্যবসায়ীর একমাত্র নির্ভর বাঙ্গলার পাট—রপ্তানি একদিন বন্ধ হইলে পরদিন সেখানে একেবারে সর্ব্বনাশ।

লণ্ডন চেম্বার অফ কমার্সে বক্তৃতাকালে মার্ক ভবারিণ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে সামান্য গোলযোগ উপস্থিত হইলে বিলাতের প্রত্যেক সামান্যতম কুটীরবাসীকে পর্য্যন্ত তাহার মারাত্মক ফলভোগ করিতে হইবে। বিলাতী পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৮৮৮ সালে বিলাত হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭২,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তুলার বস্ত্রাদি রপ্তানি হয়। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে কাট্‌তি ২১,২১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী, কিন্তু চীনে ৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড, জর্ম্মনিতে ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যে ২,০০০,০০০ পাউণ্ডের অধিক নয়। ঐ বৎসরেই বিলাত হইতে সমস্ত দেশে ৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ধাতুনির্ম্মিত সামগ্রী এবং বিবিধ বস্ত্রাদি রপ্তানি হয়—তন্মধ্যে ভারতবর্ষে কাট্‌তি ৫,৭৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য, কিন্তু ফ্রান্সে ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড, আমেরিকায় ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড এবং চীনে ৭৫০,০০০ পাউণ্ড বৈ

বিশিষ্ট সকল সৃষ্টবস্তুর নিমিত্ত যেন তোমার চোখে একটু জল এবং মুখে একটু হাসি থাকে; জলস্থলবাসী তুচ্ছতম জীবকেও কখনও একটু ভালবাসা দিতে ত্রুটি করিও না।" সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার জলজন্তু, মৎস্য, কচ্ছপ, জলসর্প প্রভৃতি এই আশ্রমবাসী-কর্ত্তৃক সযত্নে সরোবরে রক্ষিত হইত, প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা ইহাদের খাদ্যদান করিত ও বৎসরে তিনবার করিয়া একদল বৌদ্ধ পুরোহিত সমারোহসহকারে আসিয়া তাহাদিগকে জলদেবী চান্দ্রর মূর্ত্তি-অঙ্কিত চালের রুটি খাওয়াইত।

(২)

একদিন বসন্তের সন্ধ্যাকালে একটি যুবতী আসিয়া আশ্রম-কর্ত্রীর দর্শন প্রার্থনা করিল; এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং বিনা পরীক্ষায় কুমারীগণের নীললোহিত ও শুভ্রবসন পরিতে চাহিল। তাহার নাম লাইট্‌সি এবং সে তাহার অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া ছ মাত্র। অনেক দুঃখকষ্টের পীড়নে সে এই অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রমে আসিয়াছে। তাহার পিতা অতুল সম্পদ-শিখর হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া নরকদানে ঐশ্বর্য্যদম্ভের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; পিতার অপরাধ-স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় তাহার দুই ভ্রাতার প্রাণদণ্ড হইয়াছে; শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তাহার মাতা মরিয়াছেন, এবং যে তাহার বাগ্দত্ত প্রণয়ী সেও অশেষ মত মাঞ্চুরিয়ার মরুময় সীমান্তপ্রদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

এক্ষণে সহায়হীন, স্বজনহীন, প্রেমহীন সংসারের সহিত সকলপ্রকার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া এই অনাথিনী দুঃখদৈন্যপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক কমল-কুমারিকাশ্রমে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে।

প্রথম প্রথম সবই তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। এত উৎকণ্ঠা, এত ঘোরতর দুর্ঘটনা, আতঙ্ক ও অশ্রুজলের পর অবশেষে সে বিশ্রাম লাভ করিল।

তাহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সরোবরের প্রশান্ত দৃশ্য এবং অরণ্যের সুগম্ভীর মহান্ ভাব লাইট্‌সিন্ন-চিত্তকে ক্রমশঃ সুস্থির করিল; আশ্রমের সর্ব্বত্র-বিরাজমান যে নীরবতা কেবল মাত্র প্রার্থনার গুঞ্জনধ্বনিতে ভঙ্গ হইত, তাহাতে সে আপনার মর্ম্মস্থলমধ্যে মুমূর্ষু জীবনের চেতনা-স্পন্দন শুনিতে পাইত; প্রতিদিন একই সময়ে একই কাজ করিতে করিতে তাহার মনের গতি ও বৃত্তিসকল সুনিয়মিত হইয়া আসিল; এবং যে সকল ব্যবস্থা অন্তরায়ে সে বেষ্টিত থাকিত, সেগুলির অন্তর্নিহিত ভাব তাহার মনের দহিত মিশিয়া স্বীয় শান্তিতে তাহাকে পূর্ণ করিল।

দিনের মধ্যে দুইবার বড় মন্দিরে বৌদ্ধ উপাসনা সম্পন্ন হইত। কুমারীগণ নিঃশব্দে, দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, পার্শ্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিত, ধূপধূমাচ্ছন্ন দেবীর সম্মুখে নম্রভাবে বিভাগে তাহারা আসন গ্রহণ করিত এবং আশ্রমকর্ত্রীর একটি ইঙ্গিতে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। সমস্বরে, অতি মৃদুকণ্ঠে সকলে ধর্ম্মমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিত; "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ—পদ্মমধ্যস্থিত পরম রত্ন, তোমাকে নমস্কার।" এই সকল কণ্ঠের একত্র উত্থানপতনে একটি বৃহৎ পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনের ন্যায় শব্দ হইত।

উপাসনাদিনের ও একান্তে লাইট্‌সি বৌদ্ধধর্ম্মের মত সম্বন্ধে উপদেশ পাইত। সে শিখিল যে, জীবমাত্রকেই মরিতে হইবে এবং জীবন কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস; মৃতেরা যোগ্যতা অনুসারে নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; দুরাচারী ও পাপাত্মারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে; পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ মনুষ্য

যাহারা কোন বিশেষ পাপ বা পুণ্য করে নাই, যাহাদের জীবন সমান নিস্তেজভাবে কাটিয়া গিয়াছে, তাহারা পুনর্ব্বার অন্যান্য দেহ ধারণ করিয়া সংসারভার বহন করে; দুঃখভোগ ও ব্যাল-দ্বারা যাহাদের অনুষনাশ হইয়াছে, তাহারা পুনর্জ্জন্মের কঠোর দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দ্যুলোকের জ্যোতির্মণ্ডলে গিয়া বাস করে; এবং যাহারা পুণ্যাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কাম, যোগবলে আত্মার চরম উৎকর্ষে উপনীত, তাহারাই কেবল নির্ব্বাণলাভ করে ও চিরনির্ব্বাপিত দীপশিখাবৎ অনন্তের ক্রোড়ে লীন হইয়া যায়। সে আরও শুনিল যে, দানশীলতা ও পবিত্রতা সর্ব্বগুণমধ্যে শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মোচ্ছ্বাসের তিন ক্রমবিভাগ, চারি মহান সত্য, অস্তিত্বের পঞ্চ পথ, পরম জ্ঞানের ষষ্ঠ প্রকার, সপ্ত পুণ্য বস্তু এবং মুক্ত আত্মার ক্রমান্বয় অষ্ট অবস্থা, এই সকলের বিভিন্নতা তাহাকে বুঝানো হইল; অবশেষে তাহাকে বলা হইল যে, যাহার সংখ্যা নাই তাহা অপেক্ষাও বুদ্ধে আধ্যাত্মিক গুণ অসংখ্য। এই সকল বিশ্বাস, সঙ্কেত ও গূঢ়মন্ত্র আয়ত্ত করিতে লাইট্‌সিয় অপরিণত বুদ্ধি যতই অক্ষম হইত সেই পরিমাণে সেগুলি প্রবলভাবে তাহার কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করিত।

আবার প্রতিদিন যখন সূর্য্য বনের পশ্চাতে নামিয়া যাইত, সেই সময়ে, আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান গৃহে, কুমারীগণ একত্রে দীর্ঘকাল ধ্যানে নিরত হইত। ভূমিতলস্থ আসনোপরি ভক্তিভরে উপবিষ্ট হইয়া তাহারা একাগ্রচিত্তে "সত্যধর্ম্ম-কমল"-এর কোন শ্লোকের প্রতি মনোনিবেশ করিত, যথা—"মানবের সকল অনুভূতি মরীচিকাবৎ, স্বপ্নবৎ, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ," অথবা—"[illegible] প্রতি জলবিন্দু যে পরিমাণে আকৃষ্ট তুলি বিষয়ে তদ্রূপ

দিক আকার আসিতে হইতেছে, কারণ, সীমা, সুখ, দুঃখ, সংসার সকলই মিথ্যা।"

এই ঘরের প্রাচীর আলেখ্য-ভূষিত স্বর্ণখচিত লাক্ষাদ্বারা আবৃত, তাহার উপর এই ধ্যানমগ্না রমণীগণ তাহাদের আনন্দিত দৃষ্টি প্রেরণ করিত এবং তাহাদের মানসিক কল্পনা বাহিরে পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাইত। এই লাক্ষাপটের উপর বুদ্ধের মহৎ জীবনের ঘটনাসমূহ চিত্রিত রহিয়াছে। বৃহিনীর পুষ্পোদ্যানে তাহার জন্ম, উরুবিল্বের মায়াকাননে তাঁহার দীর্ঘ নির্জনবাস, বোধিবৃক্ষের দাঁড়িম্ববৃক্ষতলে তাঁহার বুদ্ধ অবস্থায় সম্পূর্ণলাভ—তাঁহার অসংখ্য অলৌকিক ক্রিয়া, অবশেষে কুশিনগরে তাঁহার মৃত্যু, এবং দেবতা ও ভক্তগণসহকে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টি। অন্যান্য চিত্রও ছিল, যথা, সেই দুর্গতিমান স্বর্গলোক, যেখানে জীবন-দুঃস্বপ্নোত্থিত মহাত্মারা বাস করেন,—অথবা নির্মিত-দুঃখের অপরূপ রাজ্য, যেখানে প্রকৃতি সুবর্ণ, রজত, প্রবাল, মণিমুক্তা ও চিরনবীন কুসুমে বিভূষিত এবং যেস্থানের প্রতিটি পদার্থসকল সর্ব্বদা বিভক্ত ও জ্যোতির্ম্ময়। ধূপধূমের মধ্য দিয়া দেখিলে মনে হইত যেন লাক্ষার স্বর্ণময় ভিত্তির উপর একপ্রকার রৌদ্রবর্ণ বাষ্প উঠিতেছে, তাহাতে করিয়া ভিত্তিলিখিত দৃশ্য কমনীয় চিত্রাবলী অধিকতর রহস্যপূর্ণ ও অশরীরী হইয়া উঠিত।

অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ধ্যানলীলা চলিত। কোনরূপ শব্দ সেই মনোবিষয় ব্যাঘাত করিত না। কেবল সময়ে সময়ে হয়ত একটি শ্বাস বহিয়া যাইত, কিন্তু এত মৃদু যে বুঝা যায় না তাহা এই মনঃপ্রাণের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কি তাহাদের অন্তরের নিঃস্বন বা মনের শূন্যে বিহারধ্বনি। এইরূপে যে সময় কাটিত তাহা

লাইট্‌সির পক্ষে অনির্ব্বচনীয় সুখকর হইত। সে এমন সুগভীর শান্তি উপভোগ করিত যে তাহার মনে হইত যেন কোন দৈব-সূত্রে সে সেই সমুজ্জ্বল শান্তিলোকের দ্বারে উপনীত হইয়াছে, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইয়া বিশ্রাম লাভ করে।

সন্ধ্যা হইলে পর, লাইট্‌সি একাকী তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে ফিরিয়া আসিত, এবং, যে মহারাত্রি তাহার অন্ধকার অঞ্চলে এই শতবর্ষীয় অরণ্যকে ঢাকিয়া রাখে, নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই রাত্রির শোভা নিরীক্ষণ করিত। নির্ম্মল শীতল বায়ু তাহার মুখে স্নেহহস্ত বুলাইত ও তাহার সর্ব্বশরীরে যেন একটা জীবনের হিল্লোল আসিয়া জাগিত; ঘুমন্ত বিশাল অরণ্যের আর্দ্র গন্ধ তাহাকে মধুর বিহ্বলতায় আপ্লুত করিত; কোন কোন নিশাচর পক্ষীর সকরুণ গান তাহার বিচলিত হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইত; কতই মোহন সূক্ষ্ম দৃশ্য, সৌরভ, অস্ফুট রব ও প্রতিমূর্ত্তি তাহার মনে উদয় হইয়া এক নূতন জগৎ সৃজন করিত। এই হৃদয়ই অনতিপূর্ব্বে শোকে, ভয় ও বিপদের খরতাপে যেন বিশুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহা-রই মধ্যে নূতন প্রাণ পাইয়া পুনঃ প্রস্ফুটোন্মুখ হইয়াছে।

এই শান্তি কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। ইহা কেবল একপ্রকার ক্ষণিক বিরাম, যেন এই দুর্ভাগিনী ভাল করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে পারিবে বলিয়াই বল সঞ্চয় করিয়াছিল। কুমা-রিকাশ্রমে প্রবেশ অবধি লাইট্‌সির মন যে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, একদিন সহসা অকারণে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার জীবনের কষ্ট, তাহার ব্যর্থ যৌবন, তাহার আশাহত ভবিষ্যৎ, সমস্ত একটিমাত্র চিত্রে তাহার মানসপটে আবির্ভূত হইল এবং তাহার হৃদয়ের যাতনা উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল।

যেমন সুখ পাইয়াছিল, এখন সেই ভাবেই তাহাকে নৈরাশ্যে পূর্ণ করিত, কারণ, সে সুখ বহুদূরবর্তী, অতীব দুর্লভ বলিয়া বোধ হইত, অথচ তাহার দুঃখ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ও প্রতিদিন হৃদয়ের গভীরতর স্তরভেদী। এমন কি, যখন সে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আনন্দের কথা বলিত, তাহা মনে করিয়া লাইট্‌সির ভয় হইত, কারণ তাহা লাভ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত বাসনা, সমস্ত কামবৃত্তি ও সকল স্ফূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়। একমাত্র সুখ তাহার মধ্যে মান হইত—সজ্ঞানে তাহার প্রিয়তমের পুনর্দর্শনলাভ; সুদূরের মনোও একবার তাহাকে দেখা; তাহার সহিত একটি অসীম চুম্বনের আদানপ্রদান, ও মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহাদের দুই হৃদয়ের সম্মিলন।

সন্ধ্যাকালে আশ্রমের বৃহৎ গৃহে যখন একত্র স্নান হইত, সেই সময়েই এই কথা লাইট্‌সির মনে বেশী জাগিত। সে তাহার সহচরীদের নিকট আনত দেহে উপবিষ্ট থাকিত, তাহারা যেমন ন্যায় মৌন, তাহাদেরই ন্যায় স্থির, কিন্তু মনের ভাবে তাহাদের সহিত এত পৃথক যে, সে যেন আর এক পৃথিবীর অধিবাসিনী; তাহাদের মন যেমন স্থির এবং সমাহিত, লাইট্‌সির অন্তর ও বাহিরাত্মা তেমনি অস্থির চঞ্চল।

তখন তাহার মানসী মূর্ত্তি সাক্ষাৎরূপে তাহার মানসনেত্রে উদিত হইত; ধূপধূমের পরপারে, লাম্পার স্বর্ণতিমির উপরে সে তাহার প্রথম মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। অমনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, এবং কম্পিত-স্বরে সে তাহার প্রিয়তমের নাম উচ্চারণ করিত।

কিন্তু তাহার মনের একাগ্রতা, শরীরের দীর্ঘ নিশ্চলতা, এবং মুখের প্রসন্নতার পরপারে গাঢ় গরল, অনন্ত বিরহ

অবশেষে তাহাকে সচেতনবোধ করিয়া দেখিত। তাহার কর্ণকুহর শব্দিত হইতে থাকিত, অঙ্গ অসাড় হইয়া আসিত ও একপ্রকার অপূর্ব্ব নির্জ্জীবতাক্রান্ত হইয়া সে অন্তরবাহির-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িত।

পরদিবস হইতে অন্যান্য গুরুতর উপসর্গ আরম্ভ হইত। প্রিয় মূর্ত্তি দেখিবামাত্র লাইট্‌সির অন্তঃকরণ প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন বিহঙ্গের ন্যায় সেই দিকে প্রধাবিত হইত; কিন্তু অকস্মাৎ সে হৃদয়ে এককণ বেদনা অনুভব করিত, এমনি তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী সে, মনে হইত যেন তাহার প্রাণের ভিতরকার কোনও গোপন স্নায়ু ছিন্ন হইয়াছে; তখন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইত, তাহার চক্ষু অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিত, এবং হিমদেহ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া সে ভূতলে পড়িত। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পরও এক প্রকার গভীর মোহে সে আচ্ছন্ন থাকিত, তাহা ক্রমে ধীরে ধীরে অবসাদে মিলাইয়া যাইত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লাইট্‌সির এই অচৈতন্য অবস্থা প্রায় একঘণ্টাকাল স্থায়ী হইল। কিছু দিন পরে সেই একই লক্ষণ আবার প্রকাশ পাইল এবং উত্তরোত্তর দীর্ঘকালস্থায়ী ও ঘন ঘন হইতে লাগিল। এই উপসর্গ শীঘ্রই প্রাত্যহিক হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কুমারী সঙ্গিনীদের মনে করুণার উদ্রেক হইল, তাহারা এই ঘন ঘন মূর্চ্ছা অস্বাস্থ্যনিবন্ধন মনে করিল; লাইট্‌সির আকার শোচনীয় হইয়াছিল; সে প্রায় উপবাসী থাকিত; তাহার মুখ মৃতবৎ বিবর্ণ ও শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তাহার কালিমা-বেষ্টিত নয়নের দৃষ্টি যেন অতি দূর দূরান্তরে স্থাপিত এবং অসাধারণ বিষাদভাবাপন্ন, এমন কি তাহার ওষ্ঠদ্বয়ও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া অধিকতর মৃদু এবং আশ্চর্য্য

পাগোডার প্রবেশ-পথে, উদ্যানে, সরোবরতটে ; কারণ, এদেশীয় প্রথম প্রহরের মৃতদের নিষ্ঠুর নিবাসের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং জীবিতদের প্রেম ও স্মৃতি-তৃষ্ণার্ত্ত মৃতাত্মারা প্রবলবেগে নিষ্কান্ত হইয়া থাকে।

চীনসাম্রাজ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকল প্রদেশেই এই উৎসবটি অবশ্যকর্ত্তব্য এবং বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এমন সামান্য পাগোডা ছিল না যেখানে ইহা সমারোহসহকারে সম্পাদিত না হইত ; এমন দরিদ্র পরিবার ছিল না যাহারা গৃহস্থ দেবীর উপরে মোমবাতি, আহার্য্য সামগ্রী ও পুণ্য গন্ধদ্রব্য না দিত।

কমল-কুমারিকাগ্রামে এই উৎসব উপলক্ষে বৃহৎ অনুষ্ঠান ও মহা সমারোহ হইত। এই সম্প্রদায়ের পূজ্যজন শ্বেতচিহ্ন, পদমর্যাদা মেঘপ্রতিমা, সর্ব্বাধিক মূল্যবান সূত্রার উপকরণ, ধর্ম্মসংক্রান্ত শিল্পবিদ্যার যে কিছু ঐশ্বর্য্য তন্তুকর ও সম্রাটদিগের মেহেরবানিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া রাশীকৃত হইতেছিল—সে সমস্ত হস্তে লইয়া একদল লোক শ্রেণীবদ্ধভাবে ভক্তিভরে পাগোডা ও পদ্মাবন্ধ প্রদক্ষিণ করিত, তাহা দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক সমবেত হইত। নিকটবর্ত্তী নগর ও পঞ্চাশতাধিক ক্রোশ দূর হইতে সেখানে লোক আসিত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মন্দিরে অবিচ্ছিন্ন উপাসনা চলিত, সকলেই তাহাতে যোগদান করিতে পারিত।

কিন্তু কাবন দেবীর মন্দিরে কেবলমাত্র কুমারীগণের প্রবেশাধিকার ছিল। এই দিবস তাঁহাকে সবিশেষ আন্তরিক ভক্তির সহিত পূজা করা হইত, কারণ তাঁহারই অনুকম্পায়, রমণীকুল দেবতার নিকট তাহাদের করুণাময় সন্তানোদ্দেশ্যে মৃতাত্মারা

অনুগ্রহ করিয়া, তৎপরে একবার পাতালরাজ্য আবিপূর্ব্বক অদৃশ্য ও গোপনভাবে মর্ত্ত্যের আলোকে আসিতে পারে।

এই সকল অনুষ্ঠান লাইট্‌নির পক্ষে হিতকর হইলেও তাহার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ করিয়া দিল; বর্ত্তমান স্বপ্নের পরিবর্ত্তে অতীতের শোকাকুল মূর্ত্তি চিত্তপটে দেখা দিল; একে একে তাহার স্মৃতি সকল জাগিয়া লাইট্‌নির মনে বিষাদমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করিল ও তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

লাইট্‌নি তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিমিত্ত যে বেদী রচনা করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে তিন ঘণ্টা প্রণত রহিল। একে একে তাহাদের নিকট সব নিবেদন করিল—পূজার খাদ্যদ্রব্যের উপাদেয় গন্ধ, হেমন্তের ফলের সৌরভ, মায়ের মৃদু পরিমল, পুষ্প-মদিরার বাষ্প, তাম্রকলসপূর্ণ ম্যাগনোলিয়া-কুসুমসুবাস, অবশেষে ধূপপাত্রে প্রজ্বলিত সোনালি ও রূপালি আগরের ধূম। মর্ম্মান্তঃকরণে সে পরম বুদ্ধদেব ও করুণাময়ী কানন দেবীর পূজা করিল; তাহার পূজনীয় পিতৃপুরুষদিগের জন্য প্রার্থনা করিল; তাহার পিতা ও ভ্রাতাদের অন্যায় বিচারে প্রাণদণ্ড হওয়া প্রযুক্ত তাহাদের সমাধি সম্পন্ন হয় নাই, তাহার মাতাকে নিতান্ত হীনভাবে গোপন সৎকারকার্য্য হইয়াছিল। ইহাদের সকলের জন্যই লাইট্‌নি দেবতাকে ডাকিল। তাহার ব্যথিত-তার সহিত একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট অনুতাপের ভাব মিশ্রিত হইল, কারণ সে বুঝিতে পারিল যে এই যে ভক্তিপূর্ণ স্মৃতি এখন তাহার হৃদয় পূর্ণ করিতেছে, ইহা অতি অল্পদিনেই তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া একটিমাত্র স্মৃতিকে স্থান দান করিয়াছিল।

কানন দেবীর পাগোডার নিকট, আজালিয়া ও কামেলিয়া-কুঞ্জের মধ্যে একটি বিশেষ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে মৃতাত্মারা সমাধি লাভ করে নাই, যাহাদের বংশরক্ষা হয় নাই, বা যাহারা অধর্ম সন্তানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, যে হতভাগ্যেরা কখনো বিশ্রাম পাইবে না, যাহারা শান্তিহীন ও আশাহীন হইয়া অদৃশ্য জগতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই উদ্দেশে এই বেদী রচিত। যে দিবস অন্যান্য মৃতদের পক্ষে এখন সুখজনক, সেই একমাত্র দিনে, কমল-কুমারিকাশ্রমের পুণ্য-ফলে, তাহারা আশ্রয় পাইত।

লাইট্‌সির প্রণয়ীর আত্মা হয়ত এই দুর্ভাগ্যদস্যুভুক্ত, হয়ত তাহার সেখানে মৃত্যু হইয়াছে, একাকী, পরিত্যক্ত—নির্ব্বাসনভূমিতে হয়ত তাহার দেহ সৎকারসম্মানবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—এই কথা লাইট্‌সির মনে অকস্মাৎ উদয় হওয়াতে সে এমন প্রবল আবেগাক্রান্ত হইল যে অবশ ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। নিজ কক্ষে তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হইলে পর লাইট্‌সির যখন জ্ঞান হইল, তখন আপনাকে এমনি দুর্ব্বল, সংসার হইতে এমনি বিচ্ছিন্ন বোধ হইতে লাগিল, যে, সে ভাবিল বুঝি মৃত্যু আগতপ্রায়।

সন্ধ্যার দিকে তাহার অত্যন্ত জ্বর হইল। তাহার ইন্দ্রিয়সকল একে একে সচেতন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ শক্তি ধারণ করিল। বাতায়ন দিয়া তাহার দৃষ্টি আকাশের অপরিমেয় দূরত্ব ভেদ করিল, কোটি কোটি তারকা তাহার নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল, তাহার গৃহ যে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইতেছিল তাহার অত্যুজ্জ্বলতা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; এবং এই গভীর রাত্রে কুমারিকাশ্রম যে নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন ছিল, তাহার মধ্যেও লাইট্‌সির

বিস্মিত শ্রবণে অসংখ্য ক্ষীণতম শব্দ প্রবেশ করিল, যাহার কারণ বা দিক সে নিরূপণ করিতে পারিল না।

সহসা লাইট্‌সি বাহিরে অনতিদূরে একটি বাষ্পময় মনুষ্যাকার দেখিতে পাইল, একটি প্রেতমূর্ত্তি তরঙ্গায়িত অনায়াস-গতিতে তাহার দিকে আসিতেছিল, যেন চন্দ্ররশ্মির উপর দিয়া পিছলিয়া চলিতেছে; তাহার অঙ্গুলীমধ্যে স্বর্ণকমলপুষ্প জাজ্জ্বল্যমান।

লাইট্‌সির নিকটবর্ত্তী হইলে পর সে কথা কহিল; তাহার কণ্ঠস্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ এমন ক্ষীণ যে তাহার মুখ দিয়া শ্বাস বাহির হইল না; "আইস" সে বলিল, "আইস। আজিকার রাত্রে শত সহস্র দেহমুক্ত আত্মা নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে; এবং যে সকল মানব শ্রেষ্ঠ ভক্তির প্রভাবে বা কোন গভীর দুঃখ ভোগবশতঃ বাস্তব জগৎ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে তাহাদের আত্মাও সেই সঙ্গে মুক্তভাবে বিহার করিতেছে; আইস; আজিকার রাত্রি রহস্যে পূর্ণ, বুকের প্রেমে পূর্ণ। আজিকার রাত্রে পুণ্য কমলসমূহ তাহাদের বিমলতম সৌরভ বিতরণ করিয়াছে, তাহাতে গগণমার্গ এখনও সুবাসিত—আমার সহিত আইস!" এই কথায় লাইট্‌সি এক অজানিত, মধুর অথচ প্রবল আলোড়ন অনুভব করিল, তাহার নিঃশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইল, তাহার সমস্ত স্নায়ু কাঁপিতে লাগিল, তাহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। একপ্রকার উচ্ছ্বাস তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিল, তারপরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহার আত্মা দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিল। বাষ্পোন্মুখ জলের ন্যায় সে লঘু হইল, দৃষ্টিগোচর বাষ্পের ন্যায় সূক্ষ্ম হইল। দেবযোনির রহস্যপূর্ণ আহ্বানের বশবর্ত্তী হইয়া লাইট্‌সি তাহার দিকে গমন করিল; সে তাহার শিথিল আত্মার নিজবাহুতে তুলিয়া আকাশে লইয়া গেল।

প্রথমে সে লাইট্‌হাউসকে নিশীথ-আকাশের স্বচ্ছ নীলিমার মধ্যে উচ্চে উঠাইল এবং আশ্রমের উপরে মুহূর্ত্তেক উড্ডীন রহিল, যেন সে দিক্‌নির্ণয়ে সক্ষম; তাহার পরে সে সংগর্জ্জিতে উত্তরাভিমুখে লইয়া চলিল।

তাহাদের নিম্নে পর্ব্বত, উপত্যকা, বন, ধান্যক্ষেত্র, নগর, গ্রাম অন্ধকারে অন্তর্ধান হইতে লাগিল।

শীঘ্রই দেখা গেল একটি বৃহৎ নদী সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত; উজ্জ্বল চন্দ্রকরে উদ্ভাসিত, যেন তারারশ্মির সহস্র প্রতিবিম্বে আলোকিত হইয়া যেন প্রকাণ্ড রজতসর্পের ন্যায় তাহার দুই তটের মধ্যে বক্রগতিতে চলিয়াছে। একজন ধীবরের গীত গান যেন রাত্রে দিশাহারা বিহগের ন্যায় আকাশ পানে উড়িতে হইতেছে।

পর্ব্বত বন ও ধান্যক্ষেত্র ক্রমাগত একের পর এক আসিতে লাগিল।

অতি সুদূর পূর্ব্বদিক হইতে এক অস্ফুট অবিরাম ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি শুনা গেল, যেন কোন ভূগর্ভ বিরাট প্রাণীর গুরুগম্ভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসশব্দ, এবং বাতাসে নবপক্ক গমোদ্গন্ধ আসিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে শব্দ আকাশে মিলাইয়া গেল, ও পক্ষিবিহারী জ্যোতিষ্কের নীচে এখন বালুকাময় মরুভূমি প্রসারিত হইল।

তাহারা যখন ভূমিতলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, সহসা একটি বিস্তীর্ণ নগরী দেখা দিল, তাহার চতুর্দ্দিকে তিনটি প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত রাজপথ, এবং গৃহ অপেক্ষা দেবালয় ও প্রাসাদের সংখ্যা অধিক। তাহার মধ্যদেশে কতকগুলি অসাধারণ বৃহদাকার অট্টালিকা যেন একটি স্বচ্ছ [illegible]

রচনা করিয়াছে, সেগুলির স্বর্ণমণ্ডিত ছাদ হইতে জ্যোৎস্নালোকে যেন অলৌকিক জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। মন্দির ও শিবির-শোভিত একটি সুরম্য বিশাল উদ্যান বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আবদ্ধ একটি মুক্তাভ হ্রদে কমলপুষ্প বিরাজ করিতেছে। এই মায়াপুরী হইতে অস্ফুট সঙ্গীত, বাদ্য, সুগন্ধ ও উৎসবের প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল।

লাইট্‌সি তাহার শূন্যপথযাত্রার দ্রুতগতিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে কহিল "ইহাই কি আমাদের গন্তব্যস্থান? আমরা কি এখানে থামিব না? আমাকে তুমি কোথায় লইয়া যাইতেছ?" কিন্তু সে দৈত্যপুরুষ ইহারই মধ্যে এক পক্ষের আস্ফালনে তাহাকে উচ্চতর আকাশে তুলিয়া দিল। "না, এখনো উড়িয়া যাই চল, এই নগরের নাম পিকিন; এই প্রাসাদ স্বর্গসূত্রের রহস্যময় আবাস-স্থান। এই রাজ-অট্টালিকার সীমার মধ্যে যত দুশ্চিন্তা ও দুঃখ আছে এমন পৃথিবীর আর কোনখানে নাই। এদিকে আবার রাত্রি অবসানপ্রায়, শীঘ্রই দিনের আলো প্রকাশিত হইবে, অথচ আমাদের এখনও দীর্ঘ পথ উত্তীর্ণ হইবার আছে, এতক্ষণে কেবলমাত্র বিরাট প্রাচীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।"

তখন লাইট্‌সি দেখিল একটি সুদীর্ঘ প্রস্তরনির্মিত প্রাকার নদী ও গহ্বর অতিক্রম করিয়া সুদূর আকাশসীমান্তবর্ত্তী মরুতে মিশাইয়া গিয়াছে। বালুকাময় সমভূমির পরিবর্ত্তে এখন ঝাউ-বন ও লার্চ বৃক্ষ দেখা গেল। চন্দ্র এখনো একটি পাণ্ডুবর্ণ মলিন-আকারে জ্যোতি বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু তারার আলো সব নিভিয়া গিয়াছিল। আকাশ ক্রমশঃ শীতল হইল, তীব্র ও রুক্ষ বায়ু একটা প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডকে কশাঘাত করিতে লাগিল, বাজপক্ষী দলে দলে দক্ষিণ মুখে উড়িয়া চলিল।

যখন সূর্য্য উদয় প্রথম আলো আকাশকে রেখাঙ্কিত করিল, তখন সেই দেবযোনি তাহার আকাশ-যাত্রা নিবৃত্ত করিয়া ধীরে ধীরে যথাতথ্য অভিমুখে আসিতে লাগিল। সেখানে দুর্গপ্রাচীর ও তুষারমণ্ডিত নদীবেষ্টিত কতকগুলি সামান্য কুটীর লক্ষিত হইল। অপর দিকে সীমাহীন সমতলক্ষেত্র প্রসারিত, তাহার উপর বৃহৎ মৃত্যু-আচ্ছাদনের ন্যায় নীহাররাশি আপন শুভ্রতা বিস্তার করিয়াছে। এই মরুময় প্রদেশ, প্রত্যুষের আধ-আলো আধ ছায়াতে অধিকতর শূন্য ও উচ্ছৃঙ্খল দেখাইতেছিল। ইহাই মাঞ্চুরিয়ার উত্তর সীমানা।

এইখানে একটা দীনহীন কুটীরে, মলিন শয্যায় লাইট্‌সিঙ্গ জ্বরে পড়িয়া ছিল। আশার নিরাশ, প্রেমে বঞ্চিত, ও সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া, তাহার দুঃখ সহিবার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহার আর বাঁচিবার সাধ বা শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। এই নিরানন্দ দেশে আসা অবধি এক অবসাদরোগে তাহার জ্বর হইতেছিল, ও মৃত্যু অল্পে অল্পে তাহার দেহ অধিকার করিতেছিল। পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে তাহার পীড়ার অকস্মাৎ বৃদ্ধি হইল; এখন তাহার শ্বাস অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার ছায়াচ্ছন্ন নয়নে আর আলো প্রবেশ করিতেছে না। কিন্তু চিন্তার শিখা এখনো তাহার প্রাণের ভিতর জ্বলিতেছিল; মৃত্যুযন্ত্রণায়ও সে লাইট্‌সির স্বপ্ন দেখিতেছিল, ও পূর্ব্বপ্রেমের আন্তরিক আকুলতার সহিত তাহাকে ডাকিতেছিল।

সহসা লাইট্‌সি প্রবেশ করিল, তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠ মুমূর্ষুর শীতল অধরের উপর রাখিল, ও একটি চুম্বনে তাহার অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করিয়া লইল।

তাহার মৃত্যু হইলে পর দুই জনের আত্মা অবশেষে মিলিত

হইয়া একত্রে আকাশ অভিমুখে উঠিল, এবং প্রত্যক্ষ জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্ত ঈশ্বরের মনোরাজ্যে গিয়া পৌঁছিল। সেই অবধি তাহাদের নিকট এক অভিনব পৃথিবী প্রকাশিত হইল, এক অশরীরী পৃথিবী, যেখানে দেহমুক্ত আনন্দময় প্রাণী-সকল বাস করে, যাহার ঊর্দ্ধে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ লয়, পরম নির্ব্বাণলোক বিরাজমান। চিরদিনের জন্য তাহারা অশ্রুসাগরের পরপারে উপনীত হইল, মর্ত্ত্যক্লেশের স্মৃতিমাত্রও তাহাদের রহিল না।

৪

কিন্তু কমল-কুমারিকাশ্রমস্থিত লাইট্‌সির দেহ জীবিত রহিল। সে নিঃশ্বাস ফেলিত, উঠিত, বেড়াইত, তাহার নিয়মিত কাজকর্ম্ম করিত—মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, ধ্যানশালায় দীর্ঘ উপবেশন, সরোবরতীরে একাকী ভ্রমণ। কিন্তু তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার শরীরে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তাহার নয়নতারা জ্যোতিহীন হইয়া গিয়াছিল, তাহার শীর্ণ ওষ্ঠাধর হইতে মধ্যে মধ্যে যে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনা যাইত তাহা যেন বাষ্পের ন্যায় নির্গত হইত ও তাহার কথার কোন অর্থ থাকিত না; তাহার হস্তপদচালনায় এক আশ্চর্য্য ধীরতা ও অনিশ্চিততা লক্ষিত হইত—সে যেন এক অজ্ঞেয় বাহ্যিক শক্তির আজ্ঞা পালন করিয়া চলিত।

এই অপূর্ব্ব অবস্থা নয় দিবসকাল রহিল।

তাহার সখীদের মধ্যে একদল বলিত সে নিশ্চিত পাগল হইয়া গিয়াছে; অপরপক্ষ ভীতিগ্রস্ত হইয়া বলিত যে, সে কোন বহুকালমৃত অবতরসমাধিসম্পন্ন কুমারীর প্রেতাত্মা, মন্দিরের নিকট বিচরণ করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে।

অবশেষে দশম দিনের প্রাতঃকালে এই আত্মাশূন্য দেহ চিরকালের জন্য শীতল ও শান্ত হইল।

প্রচলিত প্রথা অনুসারে কুমারীগণ তাহার অন্তিম সজ্জায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা মৃতদেহে শ্বেত পশমের নূতন বস্ত্র পরাইল, সযত্নে কেশগুচ্ছ সাজাইয়া দুটি শৃঙ্গনির্ম্মিত কণ্টকদ্বারা মস্তকের উপরিভাগে স্থাপন করিল, হস্তের অঙ্গুলী রৌপ্যে মণ্ডিত করিল, বিশীর্ণ গণ্ডস্থলে শ্বেতচূর্ণ মাখাইল, ওষ্ঠাধরে অলক্ত, চিবুকের নিম্নভাগে একটি নীলরেখা দিল; তাহার পরে দুটি শবোত্তরীয়ে তাহাকে আবৃত করিয়া একটি সিডারকাষ্ঠের বাক্সে শয়ান করাইল, তাহার ভিতরে পত্র এবং উইলোপত্র স্থাপন করিল।

পরদিবস লাইট্‌সির দেহ আশ্রমের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইল; ক্ষেত্রটি পাজালিয়াশোভিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর স্থিত, সেখান হইতে সরোবর এবং সমস্ত আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

যতক্ষণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলিতেছিল, অভূতপূর্ব্ব ঘটনাসমূহে দর্শকদিগের মন ভয়ে অস্থির করিতেছিল। প্রেতাত্মাদিগের সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত যে সোনালি রূপালি কাগজখণ্ড প্রজ্বলিত করা হইত, সেগুলি বিনাধূমে দগ্ধ হইল; ধূপধূনার বর্ত্তিকা পুড়িবার সময় গন্ধ পাওয়া গেল না এবং মোমবাতি জ্বালাইবামাত্র নিভিয়া গেল, যদিও কোনপ্রকারে বাতাসের লেশমাত্র যুক্ত গেল না।

নয়। লর্ড ডফারিণ বলেন, ভারতের সহিত বিলাতের বাণিজ্য সমগ্র পৃথিবীতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের দশমাংশ।

শুধু আমদানি রপ্তানি নহে, ভারতবর্ষে রেলওয়ে প্রভৃতিতে ইংরাজের ৩৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড নিয়মিত খাটিতেছে। ইহা ভিন্ন ছোটখাট নানান্ ব্যবসায়ে বিস্তর বিলাতী মূলধন খাটে এবং ন্যায্য সুদ পোষাইয়াও ইংরাজ বণিকের যথেষ্ট লাভ থাকে।

ইহার উপর লক্ষাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতন ভারতবর্ষকে যোগাইতে হয়। এবং বাটাবিভ্রাটের কল্যাণে বিলাতে পেনশন যোগাইতেও সামান্য দণ্ড লাগে না।

আরও, পূর্ব্বাঞ্চলে ইংরাজের বাণিজ্যবিস্তারের সম্পূর্ণ নির্ভর ভারতবর্ষের উপর। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে প্রাচ্য ভূভাগে ইংরাজ বাণিজ্যশ্রী একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।

ইংলণ্ড এই কামধেনুকে ছাড়িবে কি দুঃখে?

ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, ইংরাজের উপনিবেশসমূহও ভারতবর্ষকে দোহন করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে।

এডেন ও অন্যান্য গুটিকতক বন্দরে ভারতবর্ষ ইংরাজসৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়ার বিস্তর সুবিধা করিয়া দেয়। এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যসূত্রে অষ্ট্রেলেসিয়ার অবস্থাও অনেক ভাল হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধিকারচ্যুত হইলে এ আশার পথ একেবারে বন্ধ।

দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতির প্রধান কারণই ভারতবর্ষ এক সময়ে ভারতবর্ষে আসিবার পথে এইখানে জাহাজ থামিত। এবং এখনও ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধেই ইহার বিশেষ গৌরব।

ইংরাজ উপনিবেশসমূহের মধ্যে একমাত্র আমেরিকারই ভারতবর্ষের সহিত দূর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে

হংকং অবধি কানাডীয় পোতের রীতিমত গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইংরাজের প্রাচ্য অধিকারসমূহে কানাডার অনেক ভবিষ্যৎ সুবিধার সূচনা দেখা যাইতেছে।

সুতরাং ইংরাজ উপনিবেশসমূহেরও ভারতবর্ষকে ছাড়িবার সাধ নাই।

তবে কি ভারতবর্ষকেও কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির ন্যায় অধিকার দিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? পার্কিন সাহেব ইহাতে নারাজ। ভারতবর্ষকে কোনও নূতন অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি বলেন, অধিকার কিছুই না দিয়া কেবল ভারতবর্ষের প্রভুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে। অর্থাৎ এখন যেমন ভারতবর্ষ একমাত্র ইংলণ্ডেরই অধীন তাহা না রাখিয়া তাহাকে ইংলণ্ড এবং নিউজিলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকা প্রভৃতি যাবতীয় ইংরাজ উপনিবেশের অধীনে স্থাপিত করা হউক। এখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ফেডারেশন তাহাই করিবে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের কথা পার্লামেণ্টে না উঠিয়া ফেডারেশনে আলোচিত হইবে। ভারত গবর্মেণ্ট এখন যেরূপ ভাবে সংগঠিত এইরূপই থাকিবে—কেবল তাহার কার্য্যাকার্য্য সমালোচনার ভার পার্লামেণ্টের পরিবর্ত্তে ফেডারেশনের উপর পড়িবে। এইরূপে ইংলণ্ড এবং উপনিবেশসমূহের সমবেত স্বার্থ দোর্দণ্ডপ্রতাপে সংহত-বলে চিরদিন ভারতবর্ষকে মুঠার ভিতরে চাপিয়া রাখিবে—এবং এই বিপুল রাবণবংশের শাসনশোষণে ভারতবর্ষের পারলৌকিক মুক্তির পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

প্রাচীন শূন্যবাদ।

মাত্রার হস্ত এড়াইবার উদ্দেশে কিরূপ তর্কের মারপাঁচ বিস্তার করিতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের কৌতূহলজনক বোধ হইতে পারে।

গ্রন্থখানির নাম মধ্যমকবৃত্তি। ইহা "বিনয় সূত্র" নামক কোন এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম চন্দ্রকীর্ত্তি আচার্য্য।

ইনি একজন শূন্যবাদী। কিছুই যে নাই ইহা প্রমাণ করাই ইঁহার উদ্দেশ্য। কি করিয়া প্রমাণ করিতেছেন দেখা যাউক।

প্রথমে প্রতিপক্ষ বলিলেন—দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় আমাদের গোচর হইয়া থাকে।

টীকাকার বলিতেছেন, দর্শন যে একটা স্বাভাবিক শক্তি উপরি-উক্ত বচনে এই কথা মানিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দর্শনশক্তি যে আছে এ কথা কে বলিল?

কারণ,

স্বমাত্মানং দর্শনং হি তদ্দর্শনং ন পশ্যতি।
ন পশ্যতি স কথমন্যং কথং পশ্যতি তৎ পরান্।

অর্থাৎ চক্ষু আপনার তত্ত্ব আপনি দেখিতে পায় না, অতএব যে আপনাকে দেখিতে পায় না সে অন্যকে কি করিয়া দেখিবে?

প্রমাণ হইয়া গেল চক্ষু দেখিতে পায় না। "তস্মান্নাস্তি দর্শনং।"

কিন্তু প্রতিবাদী বলিতে পারেন—

"[illegible] ন পশ্যতি, তথাপি [illegible] পশ্যন্ [illegible]

অগ্নিঃ পরং দহতি ন স্বাত্মানং, এবং দর্শনং পরং দৃশ্যতি ন স্বাত্মানং ইতি।

অর্থাৎ অগ্নি যেমন পরকে দহন করে কিন্তু আপনি দগ্ধ হয় না, তেমনি চক্ষু অন্যকে দেখে নিজেকে দেখিতে পায় না—ইহা সমুত্তর নহে।

উদ্ভবদাতা বলেন—এতদপ্যযুক্তং। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ,

> ন পর্য্যাপ্তোঽগ্নিদৃষ্টান্তো দর্শনস্য প্রসিদ্ধয়ে।
> দর্শনং স এতুক্তো গম্যমানগতাগতৈঃ।

অর্থাৎ অগ্নিদৃষ্টান্ত দর্শনপ্রমাণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ, গম্যমানগতাগতের দ্বারা দহনশক্তি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই অপ্রমাণ হইতেছে।

"গম্যমানগতাগত" বলিতে কি বুঝায় সেটা একটু সমোযোগ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

"অগতং ন গম্যতে নাগতং ন গম্যমানং, এবং অগ্নিরপি দগ্ধং ন দহতে নাদগ্ধং দহতে ইত্যাদিনা সমং বাচ্যং। যথা চ ন গতং নাগতং ন গম্যমানং গম্যতে এবং ন দৃষ্টং দৃশ্যতে নাদৃষ্টং নৈব দৃশ্যতে। দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্ম্মুক্তং দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ যাহা গত তাহা যাইতে পারে না, যাহা অগত তাহাও যাইতে পারে না এবং যাহা গতও নহে অগতও নহে কেবলমাত্র গম্যমান, তাহারই বা যাওয়া হইল কৈ? তেমনি, যাহা দগ্ধ তাহার দহন হয় না, যাহা অদগ্ধ তাহারও দহন হয় না, যাহা দহ্যমান তাহারই বা দহন হইল কৈ? পুনশ্চ যাহা দৃষ্ট তাহা আর দেখা হয় না, যাহা অদৃষ্ট তাহাও দেখা হয় না, যাহা দৃষ্টও নাহ অদৃষ্টও নহে কেবল দৃশ্যমান তাহাও দেখা হইতে পারে না। ভাবটা এই, যাহা হইয়া গেছে তাহা ত হইয়াই গেছে

যাহা হয় নাই তাহার কথা ছাড়িয়াই দাও, যাহা হইতেছে যাহা হইবে তাহাকে হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

"এবং কর্ম্মনং পশ্যতে তাবদিত্যাদিনা অধিষ্ঠিতেন নহ গম্যমানগতাগতে-র্ধর্ম্মাণাং মং দূরং অতোঽধিবর্ত্তনাদিনিরিতি ন দূরতে।

তবেই ত এক "গম্যমানগতাগতে"র দ্বারা চক্ষুই বল অগ্নিই বল সমস্ত প্রসিদ্ধ হইয়া গেল।

সিদ্ধ হইল কি?

"তত্তস্য বিলমেতৎ স্বাত্মবর্ত্মনং পরানপি ন পশ্যতীতি।"

অর্থাৎ চক্ষু যেমন আপনাকে দেখিতে পায় না তেমনি পরকেও দেখিতে পায় না।

বুদ্ধচরিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্বজন্ম।

পুনর্জ্জন্মবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। জগৎ সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরে কর্ম্মফল বলিয়া একটি মূলনিয়ম নিহিত হইয়াছে। সেই নিয়মের অধীনস্থ হইয়া সমুদায় জীবলোক জীবনচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। লোকেরা যে সকল কর্ম্ম করে তাহার ফল ভিন্ন ভিন্ন জন্ম। ভাল কর্ম্ম করিলে ভাল জন্ম হয়, মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ জন্ম হয়। এই নিয়মের বশে কেহ মনুষ্যজন্ম হইতে পশুজন্ম, পশুজন্ম হইতে দেবজন্ম এবং দেবজন্ম হইতে পুনরায় পশুজন্ম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জন্ম লাভ করে। এইরূপ চক্রে অসংখ্য বৎসর কাটিয়া যায়। একদিন

না পূর্ব্বজন্মের ফলসকল পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ধৌত হইয়া যায়, ততদিন এইরূপ জন্ম এবং পুনর্জন্ম হইতে থাকে। মনুষ্যের শেষ অবস্থা নির্ব্বাণ। সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লোকে জন্ম হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পায়—আর তাহাকে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এই মতের গূঢ়তত্ত্ব আমরা পরে আলোচনা করিব। আমরা এই স্থানে পুনর্জন্মের কথার উল্লেখ করিতেছি তাহার কারণ আছে। বুদ্ধ মনুষ্য ছিলেন এবং তিনিও সকল জীবের ন্যায় জীবনচক্রে ঘুরিয়াছিলেন। তিনি একবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ হন নাই; বৌদ্ধেরা বলে যে তাঁহাকে সর্ব্বসুদ্ধ ৫০৬ বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নানারূপে তাঁহাকে জন্মভার বহন করিতে হয়। কখন পশু হইয়া, কখন মানুষ হইয়া, কখন বা দেবতা হইয়া তিনি জীবনের সম্ভোগ এবং যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত তালিকাটি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে কতবার কত আকারে বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন :—

সন্ন্যাসী	৮৩ বার
নৃপতি	৫৮ ,,
বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	৪৩ ,,
ধর্ম্মগুরু	২৬ ,,
রাজপারিষদ	২৪ ,,
ব্রাহ্মণ পুরোহিত	২৪ ,,
রাজকুমার	২৪ ,,
সম্ভ্রান্ত লোক	২৩ ,,
পণ্ডিত	২২ ,,

ইংরেজ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
বণিক	[illegible]	[illegible]
[illegible] লোক	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
সিংহ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
অশ্ব	[illegible]	[illegible]
বৃষ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
কুম্ভকার	[illegible]	[illegible]
চণ্ডাল	[illegible]	[illegible]
টিকটিকি	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] ৮০,০০০ [illegible]

শৃগাল	২	বার
বাঁদর	২	,,
অর্ধহোতরা	২	,,
চোর	২	,,
শূকরশাবক	২	,,
কুকুর	১	,,
সাপের ওঝা	১	,,
মৃতক্রীড়ক	১	,,
রাজমজুর	১	,,
কন্দকার	১	,,
ওঝা	১	,,
শিষ্য	১	,,
স্বর্ণকার	১	,,
সূত্রধর	১	,,
জলপক্ষী	১	,,
ভেক	১	,,
ঘরগোশ	১	,,
কুক্কুট	১	,,
টীট্টা	১	,,
বন্যকুক্কুট	১	,,
বিন্দুরা	১	,,

এইরূপ ৫৩৬ বার বিবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া তবে তিনি বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। নামগুলি পাঠ করিয়া আর একটি বিষয় জানিতে পারিতেছি। বুদ্ধ একবারও স্ত্রীরূপে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। কেন তাহা বলিতে পারি না। বুদ্ধ স্ত্রীজাতিকে

অধিক অনুগ্রহ করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করিতে হইলে স্ত্রীজাতিকে এককালে বিসর্জ্জন দিতে হয়। বোধ হয়, সেই জন্য তাঁহাকে কখন স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে হয় নাই। বৌদ্ধদিগের মতে স্ত্রীলোকেরা কখন বুদ্ধ হইতে পারে না; পুরুষই কেবল বুদ্ধ হইবার উপযুক্ত। সুতরাং স্ত্রী হইয়া জন্মিলে বুদ্ধ হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে, এই জন্য বোধ হয় তিনি ঐরূপে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই।

যখন পূর্ব্বজীবনের সঞ্চিত সমুদয় পাপ পুণ্যের দ্বারা ধৌত হইয়া গেল, তখন বুদ্ধ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া কোন একটি স্বর্গে বাস করিতে গেলেন। বৌদ্ধদিগের মতে এই বিশ্বসংসার একত্রিংশ লোকে বিভক্ত। একটি লোক আর একটি লোকের উপর স্থাপিত। তন্মধ্যে চারিটি দণ্ডলোক। সেখানে জীবেরা কুকর্ম্মফলহেতু নানাপ্রকার দণ্ড পায়; তাহাদিগের নাম নরক, আসুরিক, প্রেত, এবং পশুলোক। ইহাদিগের উপর নরলোক; নরলোকের উপর ছয় স্বর্গ। স্বর্গলোকে সম্ভোগকামনা পূর্ণমাত্রায় আছে। স্বর্গের উপর আর ষোড়শটি লোক আছে, তাহাদিগের নাম রূপ। রূপবাসীদিগকে ব্রহ্মলোকবাসী বলে। তাঁহারা নিষ্পাপ, কিন্তু তাঁহাদিগের এখনও জড়ের প্রতি অনুরাগ থাকে। ষোড়শ রূপের উপর চারিটি অরূপ লোক। এখানে সকলেই সিদ্ধ—জড়ের আধিপত্য নাই—আর একপদ অগ্রসর হইলেই নির্ব্বাণে উপস্থিত হওয়া যায়। যে ছয় স্বর্গ কথিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে চতুর্থের নাম তুষিত। বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এই তুষিতস্বর্গে বাস করিতেছিলেন। সেখানে তিনি সকল প্রকার সুভোগ্য মনোরম পদার্থদ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া দেবজীবন যাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ চারিদিকে এক রব উঠিল

যে ভূমিস্বর্গ হইতে একজন নীচ অবনীমণ্ডলে যাইয়া বুদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। আমাদিগের মধ্যে কে এত ভাগ্যবান যে তাঁহার ভাগ্যে এত বড় পদ হইবে—এই কথা পরস্পর সকলে বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে জানিতে পারিলেন যে বুদ্ধের ভাগ্যেই এত বড় গৌরব লিখিত আছে। বুদ্ধকে আসিয়া তাঁহারা বলিলেন—"দেব, ধন্য আপনি যে আপনার কৃপায় জীবলোক জীবন-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। পৃথিবীতে ধর্ম্মের আলোক নিবিয়া গিয়াছে; জীবাত্মা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; মনুষ্যেরা রিপুগণের দাস হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদিগের মধ্যে প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়; সকলেই পরস্পরকে ঘৃণা করে—বিবাদ, বিতণ্ডা, সংগ্রাম ইহাতেই সদা মত্ত; কেহ কাহাকে দয়া করে না। আপনি তাহাদিগকে এই ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। অতএব দেব, শুভকার্য্যে সত্বর প্রবৃত্ত হউন।"

বুদ্ধ ভাবিলেন যে তাঁহার আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। অতএব তিনি সকলকে বলিলেন যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে চারিটি বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত। (১) তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিবেন (২) কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হইবেন (৩) কোন্ জাতির মধ্যে প্রকাশিত হইবেন (৪) কোন্ মাতার গর্ভে তিনি জন্মলাভ করিবেন। অবশেষে প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে এই স্থিরীকৃত হইল যে, যখন মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসরের অধিক কিম্বা কম থাকিবে, তখন বুদ্ধের জন্ম হওয়া উচিত নহে। যেহেতু অধিক থাকিলে মনুষ্যেরা ধর্ম্মের কথা শুনিতে আগ্রহ দেখাইবে না—অনেক দিন বাঁচিবার আছে জানিয়া তাহারা রিপুর হাত হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করিবে না; সুতরাং বুদ্ধ যাহা বলিবেন তাহার কোন ফল হইবে না। একশত বৎসরের কম পরমায়ু

হইলে মনুষ্যেরা অল্পকালের মধ্যে সকল বিলাসসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে—তাহাদিগের রিপুসকল তাহাদিগকে দিনরাত্রি দগ্ধ করিবে; সুতরাং বুদ্ধের বচনসকল অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে। অতএব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই বুদ্ধাগমনের উপযুক্ত সময়, যেহেতু এই সময় মনুষ্যের পরমায়ু ঠিক একশত বৎসর। তাহার পর বুদ্ধ চারিদিকে নেত্রবিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। কারণ, এই দেশ সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুরাকালে বুদ্ধেরা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে জন্মলাভ করিব।

তাহার পর কথা হইল যে, তিনি কোন্ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইবেন? বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির মধ্যে কখন কোন ধর্ম্মসংস্থাপক জন্মগ্রহণ করেন না; যেহেতু নীচজাতির লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সকলে তাঁহার কথা শুনিবে। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না, কারণ, জম্বুদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। ক্ষত্রিয়েরাই মান্যগণ্য, এই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইবেন। তাহার পর কথা হইল, ক্ষত্রিয়কুলের কোন্ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইবে? কেহ বলিলেন—বৈদেহীকুলে আপনার জন্ম হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবাদে আর একজন বলিলেন—না, বৈদেহীকুলে আপনার জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃশুদ্ধ হইলেও অপুত্রক, অতএব অনবস্থিত। এবং এই বিদেহরাজ্যে মনোহর উদ্যান সরোবর কিম্বা তড়াগাদি কিছুই নাই। ইহা ইতরজনের বাসযোগ্য।

কোশলকুলসম্বন্ধে একজন বলিলেন—কোশলকুলেও আপনার

হইলে মনুষ্যেরা অল্পকালের মধ্যে সকল বিলাসসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে—তাহাদিগের রিপুসকল তাহাদিগকে দিনরাত্রি দগ্ধ করিবে; সুতরাং বুদ্ধের বচনসকল অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে। অতএব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই বুদ্ধাগমনের উপযুক্ত সময়, যেহেতু এই সময় মনুষ্যের পরমায়ু ঠিক একশত বৎসর। তাহার পর বুদ্ধ চারিদিকে নেত্রবিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। কারণ, এই দেশ সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুরাকালে বুদ্ধেরা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে জন্মলাভ করিব।

তাহার পর কথা হইল যে, তিনি কোন্ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইবেন? বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির মধ্যে কখন কোন ধর্ম্মসংস্থাপক জন্মগ্রহণ করেন না; যেহেতু নীচজাতির লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সকলে তাঁহার কথা শুনিবে। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না, কারণ, জম্বুদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। ক্ষত্রিয়েরাই মান্যগণ্য, এই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইবেন। তাহার পর কথা হইল, ক্ষত্রিয়কুলের কোন্ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইবে? কেহ বলিলেন—বৈদেহীকুলে আপনার জন্ম হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবাদে আর একজন বলিলেন—না, বৈদেহীকুলে আপনার জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃশুদ্ধ হইলেও অপুত্রক, অতএব অনবস্থিত। এবং এই বিদেহরাজ্যে মনোহর উদ্যান সরোবর কিম্বা তড়াগাদি কিছুই নাই। ইহা ইতরজনের বাসযোগ্য।

কোশলকুলসম্বন্ধে একজন বলিলেন—কোশলকুলেও আপনার

হইলে মনুষ্যেরা অল্পকালের মধ্যে সকল বিলাসসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে—তাহাদিগের রিপুসকল তাহাদিগকে দিনরাত্রি দগ্ধ করিবে; সুতরাং বুদ্ধের বচনসকল অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে। অতএব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই বুদ্ধাগমনের উপযুক্ত সময়, যেহেতু এই সময় মনুষ্যের পরমায়ু ঠিক একশত বৎসর। তাহার পর বুদ্ধ চারিদিকে নেত্রবিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। কারণ, এই দেশ সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুরাকালে বুদ্ধেরা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে জন্মলাভ করিব।

তাহার পর কথা হইল যে, তিনি কোন্ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইবেন? বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির মধ্যে কখন কোন বুদ্ধ-সংস্থাপক জন্মগ্রহণ করেন না; যেহেতু নীচজাতির লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সকলে তাঁহার কথা শুনিবে। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না, কারণ, জম্বুদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। ক্ষত্রিয়েরাই মান্যগণ্য, এই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইবেন। তাহার পর কথা হইল, ক্ষত্রিয়-কুলের কোন্ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইবে? কেহ বলিলেন—বৈদেহীকুলে আপনার জন্ম হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবাদে আর একজন বলিলেন—না, বৈদেহীকুলে আপনার জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃভক্ত হইলেও অপুত্রক, অতএব অনন্বয়াহিত। এবং এই বিদেহরাজ্যে মনোরম উদ্যান সরোবর কিম্বা ভজনালয়াদি কিছুই নাই। ইহা ইতরজনের বাস-যোগ্য।

প্রকাশ্যকুলসম্বন্ধে একজন বলিলেন—যোগনগরের শাক্যবংশ

হইলে মনুষ্যেরা অল্পকালের মধ্যে সকল বিলাসসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে—তাহাদিগের রিপুসকল তাহাদিগকে দিনরাত্রি দগ্ধ করিবে; সুতরাং বুদ্ধের বচনসকল অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে। অতএব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই বুদ্ধাগমনের উপযুক্ত সময়, যেহেতু এই সময় মনুষ্যের পরমায়ু ঠিক একশত বৎসর। তাহার পর বুদ্ধ চারিদিকে নেত্রবিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। কারণ, এই দেশ সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুরাকালে বুদ্ধেরা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে জন্মলাভ করিব।

তাহার পর কথা হইল যে, তিনি কোন্ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইবেন? বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির মধ্যে কখন কেহ ধর্ম-সংস্থাপক জন্মগ্রহণ করেন না; যেহেতু নীচজাতির লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সকলে তাঁহার কথা শুনিবে। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না, কারণ, জম্বুদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। ক্ষত্রিয়েরাই মান্যগণ্য, এই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইবেন। তাহার পর কথা হইল, ক্ষত্রিয়-কুলের কোন্ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইবে? কেহ বলিলেন—বৈদেহীকুলে আপনার জন্ম হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবাদে আর একজন বলিলেন—না, বৈদেহীকুলে আপনার জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃভক্ত হইলেও অপুত্রক, অতএব অনন্বাহিত। এবং এই বিদেহরাজ্যে মনোহর উদ্যান সরোবর কিম্বা জলাশয় কিছুই নাই। ইহা ইতরলোকের বাস-যোগ্য।

কোশলকুলসম্বন্ধে একজন বলিলেন—কোশলকুলেও আপনার

হইলে মনুষ্যের অল্পকালের মধ্যে সম্যক্ বিজ্ঞানসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদিগের রিপুসকল তাহাদিগকে দিনরাত্রি পঙ্গু করিবে; সুতরাং বুদ্ধের বচনসকল অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে। অতএব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই বুদ্ধাগমনের উপযুক্ত সময়, যেহেতু এই সময় মনুষ্যের পরমায়ু ঠিক একশত বৎসর। তাহার পর বুদ্ধ চারিদিকে নেত্রবিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। কারণ, এই দেশ সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুরাকালে বুদ্ধেরা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে জন্মলাভ করিব।

তাহার পর কথা হইল যে, তিনি কোন্ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইবেন? বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির মধ্যে কখন কোন ধর্ম-সংস্থাপক জন্মগ্রহণ করেন না; যেহেতু নীচজাতির লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সকলে তাঁহার কথা শুনিবে। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না, কারণ, জম্বুদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। ক্ষত্রিয়েরাই মান্যগণ্য, এই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইবেন। তাহার পর কথা হইল, ক্ষত্রিয়-কুলের কোন্ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইবে? কেহ বলিলেন—বৈদেহীকুলে আপনার জন্ম হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবাদে আর একজন বলিলেন—না, বৈদেহীকুলে আপনার জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃভক্ত হইলেও অপুত্রক, অতএব অনন্বিত। এবং এই বিদেহরাজ্যে মনোহর উদ্যান সরোবর কিম্বা তড়াগাদি কিছুই নাই। ইহা ইন্দ্রজনের অযোগ্য।

কোশলকুলসম্বন্ধে কেহ বলিলেন—কোশলকুলেও আপনার

বুদ্ধ বলিলেন—আমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিব, কারণ, সে বংশে কোনপ্রকার দোষ নাই এবং তাহাতে বিদ্যা, যশ, ধর্ম্ম সকলই বর্ত্তমান।

চতুর্থ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন—আমি মায়াদেবীর গর্ভে জন্মলাভ করিব।

এইরূপে সকল কথা স্থির হইলে তিনি তুষিতস্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যশোধরা নাম্নী এক কন্যা সিংহহনুর দুহিতা অমৃতার গর্ভে প্রবেশ করেন।

যখন এই ব্যাপারটি সম্পাদিত হইল তখন পৃথিবীতে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল; হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দীপ্তি বিশ্বকে আলোকিত করিল। অন্ধ দেখিতে পাইল, বধির শুনিতে পাইল, খুঞ্জ উত্থিত হইল, পঙ্গু হাঁটিতে লাগিল, কারাগারের বন্দীদিগের লৌহশৃঙ্খল সকল আপনাপনি খুলিয়া গেল; নরকটি নিবিয়া গেল, নারীদিগের সকল রোগ দূর হইল, গোচরেরা কলহ [illegible] পরিত্যাগ করিয়া শান্তিবচনে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল, সকলে পরস্পরের আহ্লাদচিত্ত প্রকাশ করিতে লাগিল। [illegible] তাহাদিগের সুখের পরিচয় দিল, জীবিত [illegible] আপনাপনি [illegible] ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল; [illegible] ও [illegible] লাগিল; আকাশ প্রথম জ্যোতিতে আবৃত হইল, [illegible] পরিতে লাগিল; [illegible] প্রবাহিত হইল, [illegible] বৃষ্টি পড়িতে লাগিল [illegible] হইল, [illegible] হইল, [illegible] বন্ধ হইল, [illegible] মিষ্ট হইল, [illegible] প্রস্ফুটিত হইল, নানাবিধ [illegible]

[illegible] বিন্দু আকর্ষণ করিতে থাকিল, আকাশে [illegible] উদ্ভিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ প্রেরণ করিল, দেবলোক হইতে সঙ্গীতধ্বনি মর্ত্যলোকে প্রতিধ্বনিত হইল। পুষ্প সকল পুষ্পকেই পুষ্পিত। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রহিল না।

সমালোচনা।

সংগ্রহ। শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত। গ্রন্থখানি ছোট ছোট গল্পের সংগ্রহ। ইহার অধিকাংশ গল্পই সুপাঠ্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই লেখকের পক্ষে যথেষ্ট অপকারের বিষয় হইবে। যদি "ধারার কাহিনী" লিখিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র কৌতূহল অথবা বিস্ময়জনক গল্প আমরা প্রত্যাশা করি না। "ধারার কাহিনী" গল্পটি সর্ব্বোপরি উন্নত এবং সুবিধাজনক, ইহার কোথাও বিচ্ছেদ নাই। আর সেজন্যই লেখকের কৌশল নৈপুণ্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই গল্পেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

দীক্ষা। শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত। লেখক এই গ্রন্থখানিকে "ঐতিহাসিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম বিরোধ। ইহাতে ইতিহাসের সুসংগতির বড় এবং অনেক অংশ অতি যৎসামান্য ও অসম্পূর্ণ। স্থানে স্থানে লেখক অনাবশ্যক পরিচ্ছেদ সংযোগ করিয়াছেন, এবং লেখকের মন্তব্যগুলিও স্থানে স্থানে কৃত্রিম এবং অপ্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে এই বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভাষার পারিপাট্য চিত্র [illegible] উচ্চ [illegible] হইয়াছে। [illegible] মধ্যে [illegible]

"লীলা" কিন্তু কিরণ ও সুরেশচন্দ্রই ইহার প্রধান আলেখ্য। তাহাদের বাল্যদাম্পত্যের সুকুমার প্রেমাঙ্কুর-উদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে ঈষৎ মনোবিচ্ছেদের উপক্রম পর্য্যন্ত আমরা আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়াছি—অন্যান্য আর সমস্ত কথাই যেন ইহার মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। যাহা হউক, বইখানি পড়িতে পড়িতে দুই একটি গৃহস্থ ঘর আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। কিরণ, কিরণের মা, দিদিমা, বিন্দুবাসিনী, দাসী, ব্রাহ্মণী, প্রফুল্ল ইহারা সকলেই বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই চেনা লোক, ইহারা বঙ্গগৃহের আত্মীয় কুটুম্ব। কেবল সুরেশচন্দ্রকে স্থানে স্থানে ভাল বুঝিতে পারি নাই এবং লীলা ও আনন্দময়ী তেমন জীবন্তবৎ জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। মনোমোহিনী অল্পই দেখা দিয়াছেন কিন্তু কি আবশ্যক উপলক্ষে যে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্য লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না; কেবল, পিতৃধন-গর্ব্বিতা রমণীর চিত্রাঙ্কনে প্রলুব্ধ হইয়া লেখক ইহাঁর অনাবশ্যক অবতারণা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়।—যদিও গল্পের প্রত্যাশা উদ্রেক করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন তথাপি বঙ্গগৃহের উজ্জ্বল চিত্রদর্শনসুখলাভ করিয়া তাঁহাকে আনন্দান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিলাম।

রায় মহাশয়। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন এই গল্পটি খণ্ডশঃ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইতেছিল তখনি আমরা "সাধনা"র ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম। লেখকের ভাষা এবং রচনানৈপুণ্যে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার লেখার বেশ একটি বাঁধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই; লেখক যেন সমস্ত বিষয়টিকে সমস্ত ব্যাপারটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে পারিয়াছেন; যে একটি মিঠুর কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিছুই যেন তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জ্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে। এরূপ বাস্তব চিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

প্রবাসের পত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন। প্রকাশক বঙ্গি-

স্নেহের "নারায়ণের গল্প" গুলি লিখিতে হয় নাই। নবীন বাবু আজকাল যেখানে যাইতেন সেখান হইতে সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলি তাড়াতাড়ি লেখা। হয়ত রেল-ওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিয়া ফেলিলেন।"—এই গ্রন্থখানির সমালোচনা অনাবশ্যক করিয়া দেয়। কারণ, ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখিব, না পত্র হিসাবে দেখিব ভাবিয়া পাই না। পড়িয়া মনে হয় যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে। এ সকল পত্র পরের জীবনচরিতের উপাদানস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বাহির হইতে পারে ইহাতে এমন কোন বিশেষত্ব নাই। যখন একান্তই গ্রন্থ-আকারে বাহির হইল তখন স্থানে স্থানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের যে সকল বিষয় কথা আছে সেগুলি বাদ দিলেই ভাল হইত। লেখক পত্রেই উমেশ বাবু ও মধু বাবুর স্ত্রীর তুলনা আমাদের নিকট সন্তোষজনক বোধ হইয়াছে—এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখাগুলিতে স্থানে স্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" এবং "বুঝি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে—প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গীটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করা যায়—কিন্তু পরে পরে আজকাল অনেক লেখকই এই সকল স্বগত উক্তি-শক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীন বাবুও যে এই সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট কিছু পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অপরিচিতের পত্র। জগতের কাছে [illegible] হইতে হরি নামক [illegible] কোন ব্যক্তি এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। [illegible] করা করিবে কি না জানি না কিন্তু আমরা এ [illegible] মার্জ্জনা করিতে পারি না। ইহাতে নির্লজ্জ এবং [illegible] [illegible] দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে আমা-

স্বয় পূর্ব্বক জগতের নিকট জ্ঞানাভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য।

প্রকৃতির শিক্ষা। গদ্যে অবিশ্রাম হৃদয়োচ্ছ্বাস বড় অসঙ্গত শুনিতে হয়। গদ্যে যেমন ছন্দের সংযম নাই তেমনি ভাবের সংযম অত্যাবশ্যক—নতুবা তাহার কোন বন্ধন থাকে না, সমস্ত অগোছালভাবে আলুথালিত হইয়া যায়। গদ্যে যদি হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতেই হয় তবে তাহা পরিমিত, সংযত এবং দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সমালোচ্য গ্রন্থের আরম্ভ দেখিয়াই ভয় হয়।

"আর পারি না! সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে শান্তির পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আর ঘুরিতে পারি না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে; গুরুভার উষ্ণ নিশ্বাসে হৃদয়ের বস্ত্রাবগুণ শুকাইয়া যাইতেছে, চারিদিকে কঠোরতা, কেবল কঠোরতাই দেখিতেছি। কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। জীবনটা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছে। যেন কি হৃদয়হীন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, যেন ভাল করিয়া, বুক ভরিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না। কি যে ভার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। ... ... আর ভাল লাগে না ছাই সংসার!"

যদি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে না পারা যায় তবে সাহিত্যে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের কোন অর্থ নাই। কারণ, হৃদয়ভাব চিরপুরাতন, তাহা নূতন সংবাদও নহে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিতোষকও নহে। তাহা সহস্রবার শুনিয়া কাহারো কোন লাভ নাই। তবে যদি ভাবটিকে অপরূপ নূতন সৌন্দর্য্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় তবেই তাহা মানবের চিরসম্পত্তিস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পায়। এই জন্য ছন্দোময় পদ্য হৃদয়ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী। ভাবের সহিত একটি সঙ্গীত যোগ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনূতন সৌন্দর্য্যটি বাহির করিয়া আনে। কিন্তু সাধারণ গদ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই নিতান্ত মূল্যহীন প্রগল্‌ভতা হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে যদি না কোন চিন্তাসাধ্য জ্ঞানের কথা থাকে তবে তাহাও উচ্ছ্বাসের ফেনরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

এ গ্রন্থখানি লিখিবার ভার যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। গ্রন্থকার যদি নিজের বক্তৃতা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত রাখিয়া কেবলমাত্র দ্বারকানাথের জীবনীর প্রতি মনোযোগ করিতেন তবে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিব এই আশায়ে গ্রন্থখানি পড়িতে বসি, কিন্তু মাঝের হইতে সমাজ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বাবুর মতামত শুনিবার জন্য আমাদের কি এমন মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তিনি যেন পাঠক সাধারণের একটি জ্যেষ্ঠতাত অভিভাবক—একটি ভাল ছেলেকে দাঁড় করাইয়া ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "দেখ্ দেখি এ ছেলেটি কেমন! আর তোরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হলি কেন!" আমরা দ্বারকানাথ মিত্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করি এই জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুর মতামত ও সুমহৎ উপদেশ বাক্যাবলি হইতে পৃথক করিয়া আমরা স্বরূপতঃ তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা বড়লোকের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত আপনাকে অন্তরালে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যত্র তাঁহাদের মতের মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু যেখানে বড়লোকের কথা হইতেছে সেখানে থাকিয়া থাকিয়া নিজের কথার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে বিরক্তিভাজন হইতে হয়।

সাধনা।

শিক্ষার ফের-ফের।*

আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই; দর্শন বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যার বিষয় এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; এবং সেই কারণে নীতিযুক্ত শিক্ষা-লাভ করিতে হইলে বিদেশীয় আকার সাহায্যে গ্রন্থ করা, এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় যে জন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাততঃ শিশুদের পাঠ্য পুস্তক দুই চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ধর্ম্মবোধ, শিল্পশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, এবং তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পুরাবৃত্ত, ভূগোল, সাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক প্রধানতঃ এবং দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বৈকুণ্ঠ কমিটি হইতে যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।

কেহ না মনে করেন আমি কেবলমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটিদ্বারা দেশের অনেক ভাল হইতে পারে; ভেনের কল, স্ক্রুর কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারি পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ দেশে সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোন কমিটির দ্বারা সুফল হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী

* সমালোচনার জন্য নিবেদন পত্রিকা

যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাহার সঙ্গতি হয় না। অতএব কমিটি নির্ব্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যরস-বঞ্চিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব? আখ-মাড়া কলের মধ্য দিয়া যে সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাকে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; "সুকুমারমতি" হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট-বিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আমরা কোন প্রকার উত্থাপন না করিলেও সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল-বিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন ব্যবহারের জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে, কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে খোকাই থাকিয়া যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোন সখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

সখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাঙ্গলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এত রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাঙ্গলা শেখান হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোন বাঙ্গলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আমার দুর্ভাগ্যে ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাঙ্গলাগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষতঃ শিশুপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এরূপ খাস্ ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে বড় বড় বি-এ এম্-এদের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙ্গালীর ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ, অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙ্গালীর ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছে বাঙ্গালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুষ্কমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মসলা মিশাল নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই

হইতে পারে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে শরীরটা যেমন একপুষ্ট খাড়িয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি-এ এম-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ সজিব এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন চিন্তা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আত্মোপাত্ত কিছু পড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত, কথাবার্ত্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মত নহে। সেই জন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই সম্পন্ন করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া পাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটা রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সতেজ এবং স্বাভাবিক নিয়মে বলশালী করে।

কিন্তু এই সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার পাত্র আমাদিগকে ধরিয়া ঝেড়াইলে কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক ত, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পর্য্যন্ত সকলে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন-

একার ঠিক নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-বস্তুও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং বালক অমিবার পূর্ব্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না বুঝাইয়া দিলে বাইবার কথা হয়। হয় ত কোন একটা শিশুপাঠ্য poem—a lay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইস্কুল বোর্ড নিকটে যে ঘাসপাতাটা অত্যন্ত পরিচিত, এই ধন, টিপের আমলপাতা; অথবা snowball খেলায় Charlie এবং Eustace মধ্যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজের পক্ষে নিতান্ত অতিশয় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বাঙ্গলা ভাষায় নেংটা পাড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনরূপ মূর্ত্তির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত ফুটিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে সকল মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স পাস কেহ বা এণ্ট্রেন্স ফেল, ইংরাজি ভাষা, চাল, চলন, ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে। কাজেই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করিয়া থাকে। তাহারা না জানে ভাল বাঙ্গলা, না জানে ভাল ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিখিয়াছে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করে।

ছেলেদের দোষ দেওয়া যায় না। House is a noble animal বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করিতে গেলে বাঙ্গলায় ঠিক থাকে না ইংরাজিও বোঝাইয়া যায়। তথাচ, কেবল ভরিয়া রাখিবার জন্য মুখস্থ। ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া জাতি অতি উপকারী [illegible] ঘোড়া জন্তুটা খুব [illegible]—কথাটা [illegible]

মনঃপূত হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলতঃ অল্পবয়সে আমরা যে ইংরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না—মাষ্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোন মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা তরিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকুরি জোটে। শঙ্করাচার্য্য যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের এই বচনটি খাটে

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।"

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিও, তাহাতে সুখলেশ নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কি? যদি কেবল বাঙ্গলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া ফলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতি-জননীর উপর সহস্র মৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল লেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন,

বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্ব্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিবার তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসাদ, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামী করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর এক বয়স পর্য্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠে এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভর-

[illegible] এবং [illegible] আবশ্যকীয় বিবিধ হস্তপদের মত আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোন প্রকার [illegible] মত নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আমার [illegible] হইতে ছিঁড়িয়া পাওয়া যাইবে।

[illegible] এবং [illegible] জীবনযাপন নির্ব্বাহের পক্ষে দুইটি আবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি [illegible] মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করিলে [illegible] সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় যে পথ এতপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজি একই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ এত অশিক্ষিত যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়, এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোন খাদ্য না পাইয়া নিতান্ত নিকৃষ্টভাবে থাকে। এণ্ট্রেন্স্ এবং ফার্ষ্ট আর্টস্ পর্য্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি-এ ক্লাসে বড় বড় পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রবন্ধ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়—তখন দেওয়া ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার অবকাশ নাই শক্তিও নাই—মরগুলা গিলাইয়া [illegible] বড় বড় তাল পাকাইয়া [illegible] গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণ করিতেছি না। ইঁট্, সুরকি, কড়ি বরগা বালি চূণ যখন পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত কর। অমনি আমরা সেই উপকরণস্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মত দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোন পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোন আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোন একটা শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মালমসলা যাহা জড় হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট-পাটকেল পূর্ব্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয় সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্ম্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনি কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ সংগ্রহযোগ্য জিনিষটা যখনি হাতে আসে তখনি তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ একদিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর একদিকে জমা হই-

তেছে, খাদ্য একদিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর একদিকে আপনার জারক-রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলি বাকল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলাভাঙ্গা, কেবলি ঠেঙ্গা, লাথি, মুখস্থ এবং এক্‌জামিন আমাদের এই "মানব-জনম"-আবাদের পক্ষে আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক গুলির সঙ্গে, এই অবিশ্রান্ত কর্ষণ পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভাল হয়। তাহার উপর আবার এক একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে, যাহার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব একপশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ!" নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের

করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক বিশ্লেষ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া মোড়া থাকে কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রং মাখিয়া উলি পরিয়া পরম গর্ব্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক বাহ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতী বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা শস্তা বিলাতী কাচখণ্ড পুঁথি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতী সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা শস্তা চক্‌চকে বিলিতী কথা লইয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতী বড় বড় ভাবগুলি লইয়া হয়ত সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসঙ্গত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কি একটা অপূর্ব্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড় বড় নজীর প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা

যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতামাতা, আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতাভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকীয় অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখানে হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরের দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বড়-

আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষার আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের বিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া আমাদের সংসার-যাত্রা দুই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাল যে শিক্ষার সাধনা করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসম্বদ্ধ হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব?

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখন আমার নিকট সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মত আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের এত শিক্ষিত অশিক্ষিত কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি শুনাইয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া এই প্রথম প্রাতিভ আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের

অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল। এ বাণীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবময় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরার কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার মুখের সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন সৌজন্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেঝেতে সূর্য্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙ্গালী পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমাপ্রভা নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়াছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্ত্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা কিছু তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালী কখনই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয়, তথাপি বাঙ্গালীর

[illegible] ইংরাজের ভাষায় তেমন [illegible] প্রকাশিত হয় না। যে সকল বিশেষ মাধুর্য্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে [illegible] উদ্বেলিত করে, যে সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সকল মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা অথনই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ ভক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনি ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনি বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায়, অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্ত্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী সর্ব্বোন্নত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্য্যাদা জান? ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রেম, যে অভিমান, যে স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি ক্ষরিত হয় তাহার মর্ম্ম কি কখনো বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, আমি যখন শিশু, স্কুলের পড়িয়াছি, সব কটা পাশ করিয়াছি, আমি সকল এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, এখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধাসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের মতের তুচ্ছ ভাষা, তার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার পদতলে হইয়া কৃতার্থ হওয়া! আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা, ভাবের বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য কি হইতে পারে? আমি যখন ইংরাজি [illegible] অনায়াসে প্রাপ্য [illegible]

আমার পক্ষে বড় বড় ভাব এই দরিদ্র দেশে বেলায় বিসর্জন দিতেছি, তাহা, জীর্ণবস্ত্র দীন পাণ্ডুর রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখ আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্য্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতী সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কি কথা বলেন তাহাও বাঙ্গালীর অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাঙ্গলায় লিখিব না, আমি ওকালতি করিব, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইব, ইংরাজী খবরের কাগজে পীড়াব লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী সঙ্গিনী বঙ্গভাষা অগ্রগামিনী হইয়া এমন সকল ভাল ভাল ছেলের সমাদর করে না এবং ভাল ছেলেরাও রাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। এমন কি, বাঙ্গলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাঙ্গলা হইতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাঙ্গলা গ্রন্থ

[illegible] বিসর্জিত করিয়া দেয়। ইহাকে [illegible] পাপে [illegible]।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষার [illegible] আমার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স [illegible] বিপরীত বটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। একথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই মুসলমানীয় ভাবের যথার্থ নিকট-সংসর্গ আমরা লাভ করিয়া [illegible] সেই জন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে [illegible] ভাবসম্পদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষার দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান-নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাঙ্গলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন "বাঙ্গলায় কি কোন ভাব প্রকাশ করা যায়! এ ভাষা আমাদের মত শিক্ষিত লোকের উপযোগী নহে!" প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মাতৃভাষা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি [illegible] লাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। এক আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অন্ন [illegible]

করিত। যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সমর্থ হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন গরমবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি—দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল—আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হের-ফের ঘুচাইয়া দাও; আমি যে বনস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি, এইটে যদি একটি সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হের-ফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলি। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীয়ে মীন পিপাসী
শুনত অমৃত নাশে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

ঐ শক্তির মাত্রার ঐ মংশটি অধিক পরিপুষ্ট। এইজন্যে জন্মে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন মস্তকের ঐ অংশটি বাৎসল্য-বৃত্তির স্থান।

যাহাদের বাৎসল্য বৃত্তি বলবতী, শিশুরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই কোলে চিনিতে পারে—তাহাদেরই প্রতি তাহারা অধিক অনুরক্ত হয়। কেহ কেহ শিশুর পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে শিশুকে আদর করে—কিন্তু তাহার কৃত্রিমতা সহজেই উপলব্ধি হয়। বাস্তবিক যাহার বাৎসল্য আছে তাহার চোখে মুখে কথাবার্তায় তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। দয়াবৃত্তি-সংযোগে যাহার বাৎসল্য প্রবল, সে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ডাক্তারও করিতে পারে। যাহার বাৎসল্য প্রবল এইরূপ লোক দেখিয়াই শিশুদিগের শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত। যাহাদের এই বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী অথচ বুদ্ধি বিবেচনা কম, তাহারা নিজের ছেলেদিগকে বেশী মাত্রায় আদর দিয়া খারাপ করে, তাহাদের জন্য অকারণ নানাপ্রকার উদ্বেগ মনে স্থান দেয় এবং তাহাদের বিবিধ কাল্পনিক গুণের জন্য তাহাদের মনে অপরিসীম গর্ব্ব উৎপন্ন হয়। আবার, যাহাদের এই বৃত্তি নিতান্ত কম, তাহারা আপনার ছেলেদের বড় দেখে শোনে না—অন্যের হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। এই সঙ্গে যাহাদের দয়া ও ন্যায়ান্যায় বুদ্ধিবৃত্তি কম এবং জিঘাংসা প্রভৃতি পাশববৃত্তি প্রবল তাহারা নিজ সন্তানের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ডাক্তার গল্ ও স্পুর্জ্জেম ইনক্রিয়া জন্য শিশুহত্যাকারীর মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে পঁচিশ জনের বাৎসল্যবৃত্তি অত্যন্ত কম। ডাক্তার গল্ বলেন যে এই বৃত্তির অভাব হইতেই যে শিশুহত্যার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় তাহা নহে—

কিন্তু এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, যাহার এই বৃত্তি শীর্ণভাবাপন্ন সে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে না; যে জননীর এই বৃত্তি বলবতী, হাজার প্রতিকূল অবস্থায় পড়ুন—হাজার প্রলোভনে পড়িলেও—তাহার অপরাজিত স্নেহ অবশেষে জয়ী হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের মাথা অপেক্ষাকৃত চওড়া ও গোল দেখায়, স্ত্রীলোকের মাথার গঠন একটু সরু ও লম্বাটে; কতকটা তার কারণ, বাৎসল্য-বৃত্তি-স্থান স্ত্রীলোকের বেশী বাহির-করা বলিয়া মস্তক ঈষৎ দীর্ঘ মনে হয়। স্ত্রীপুরুষের ভাবাবস্থাতেও এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বালকবালিকাদের স্বভাবেও এই বৈষম্য উপলব্ধি হয়। অতি শিশুকাল হইতেই বালিকাদের পুতুল ও শিশু সন্তানের উপর টান এবং বালকদিগের দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতি ক্রীড়ার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। ইহার ব্যতিক্রমস্থলও আছে। কোন কোন পুরুষের বাৎসল্য স্ত্রীজাতির ন্যায় প্রবল এবং কোন কোন স্ত্রীলোকের বাৎসল্য অত্যন্ত ক্ষীণভাবাপন্ন। যে সকল পুরুষের বাৎসল্য এইরূপ প্রবল, তাহাদিগের সন্তানাদি না হইলে তাহারা অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয় এবং নিজ বন্ধ্যা স্ত্রীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কোন কোন জাতির মধ্যে বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল—যেমন, কাফ্রি-জাতি। তাহাদের মধ্যে শিশুহত্যা অতি বিরল; এই বৃত্তিটি তাহাদের পুরুষদের মধ্যেও প্রবল। প্রায় দেখা যায়, কাফ্রি পুরুষেরা শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ভার সহর্ষে গ্রহণ করে। ডাক্তার প্যাটর্সন্ বলেন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, হিন্দুদিগের মধ্যেও এই ভাবটি খুব বলবৎ। বারোটি হিন্দুর মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল, উহার মধ্যে এক ব্যক্তির বাৎসল্য-

[illegible] উন্মাদ-রোগ নিবারণের এই পন্থা অবলম্বন করিলে [illegible] বিষয়ক অবিশ্বাস [illegible] দূর হয়। [illegible] একজন উন্মাদগ্রস্তা স্ত্রীলোক [illegible] বাহির হইয়াছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে নিজ [illegible] কথা বলিত—তাহার মনে হইত যে তাহার সন্তান-[illegible] হত্যা করা হইয়াছে, তাহাদের মৎপলোলাস্থি কই [illegible] ইত্যাদি। যখন সে আরোগ্যলাভ করিল, তখন সে [illegible] ভুলিয়া গিয়াছিল, কেবল মস্তকের [illegible] যে [illegible] বেদনা উপস্থিত হইত তাহা অনুভব করিতে [illegible]। [illegible] দেখিলেন, সেই স্থানে বাৎসল্য-বৃত্তির স্থান। [illegible] একজন উন্মাদগ্রস্তা রোগীর কথা উল্লেখ করিয়া [illegible] বলিত, তাহার দুটি সন্তান [illegible] একস্থানে [illegible]। [illegible] মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, [illegible] স্থানটি তাহার অত্যন্ত বৃহৎ। আর এক [illegible] উন্মাদগ্রস্ত পুরুষ দেখিয়াছিলেন, যে [illegible] মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে আছে। তাহার মস্তকেও বাৎসল্য-বৃত্তির স্থানটি অত্যন্ত পরিপুষ্ট-ছিল।

[illegible] বাৎসল্য এখন, যে পিতামাতার সঙ্গে থাকিয়া [illegible], তাহাদের [illegible] দেখিয়া [illegible]—[illegible] পিতা-[illegible] কর্ত্তব্য করে। [illegible] যদি কেহ সঙ্গে [illegible] শিখা [illegible] হয় তবে নিজ সন্তানবিয়োগে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] পারে না। [illegible] কম হয় তবে [illegible] কিছু [illegible] পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আত্মশ্লাঘা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ বলবতী নয়, তবে সে ব্যক্তি সন্তানের মঙ্গলার্থেই তাহাদিগকে শাসন করিবে—দয়ালু অথচ কড়াকড়; মৃদুতা ও স্নেহ-সহযোগে দৃঢ়তার সহিত নিজ সন্তানগণকে সে শাসন করিয়া থাকে। আত্ম-মর্য্যাদা প্রবল হইলে সে প্রভুত্বসহকারে এমন করিয়া তাহাদিগের সহিত কথা কহে যে, সন্তানেরা তাহার কথা পালন না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার এই আত্মমর্য্যাদা কম, সে আপনার প্রভুত্ব সন্তানদিগের নিকট বজায় রাখিতে পারে না। যাহার বাৎসল্যের সঙ্গে প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসাও প্রবল, সে পর্য্যায়ক্রমে কখন সন্তানদিগকে বেশী মাত্রায় আদর দিয়া থাকে এবং কখনও বা অতিমাত্রায় কঠোর ভাব ধারণ করে। যাহাদিগের প্রশংসা-লালসা ও ভাবুকতা অত্যন্ত প্রবল, তাহারা সন্তানদিগকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেয় যাহাতে লোকের কাছে চটক্ লাগিতে পারে। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, দৃঢ়তা প্রভৃতি সমধিক তাহারা সারবান ও কেজো শিক্ষার পক্ষপাতী।

ছুটি।

বালকদিগের সর্দ্দার ফটিক চক্রবর্ত্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাঠ নাড়ুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল, স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। কোমল, দীঘিকা সকলেই

পথে নৌকাযোগের সাহিত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কটকের কর্ত্তা মাধবলাল গম্ভীরভাবে সেই গাড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল। একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব বালকপ্রকৃতি ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। কটক আসিয়া আহ্বান করিয়া কহিল "দেখ্, আর যাবি! এই বেলা ওঠ্!" সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া বাকসটি বেশ আরামের সহিত দখল করিয়া লইল। এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভৃত্যের গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কসাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আমি একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু দেরী করা আছে। প্রস্তাব করিল, মাধবকে শুদ্ধ ঐ কাঠ গজাইতে বাকি করা যাক্। মাধব মনে করিল, ইহাতে আমার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের মাঝে ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিম্বা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—সারা ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! গাড়ি একপাশে ঝুলিতে না ঝুলিতেই মাধব তাহার গাম্ভীর্য্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞানসমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল। খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা

বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল—মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্দ্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপ্‌চাপ্ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল। এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্দ্ধ-বয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "চক্রবর্ত্তীদের বাড়ি কোথায়?" বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল "ওই হোথা!" কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দ্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না। ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা?" সে বলিল "জানিনে।" বলিয়া পূর্ব্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্ত্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্‌দি আসিয়া কহিল "ফটিক দাদা, মা ডাক্‌চে।" ফটিক কহিল "যাব না।" বাঘা তাহাকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন "আবার তুই মাখনকে মেরেচিস্!" ফটিক কহিল "না মারিনি!" "কের মিথ্যে কথা বল্‌চিস্!" "কখ্‌খনো মারিনি! মাখনকে জিজ্ঞাসা কর।" মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল "হাঁ মেরেচে।" তখন আর

ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় বসাইয়া দিয়া কহিল "ফের মিথ্যে কথা!" মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল। মা চীৎকার করিয়া কহিলেন "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্!" এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "কি হ'চ্ছে তোমাদের!"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন "ওমা, এ যে দাদা! তুমি কবে এলে!" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন। বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। যাহা হোক্, বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগ্নীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগ্নীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন। তাঁহার ভগ্নী কহিলেন "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।" শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?" ফটিক সাকা-

ইয়া উঠিল, বলিল "যাব।" যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই কাটায়, কি, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়; তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। "কবে যাবে" "কখন্ যাবে" করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য্যবশতঃ তাহার ছিপ ঘুড়ি লাঠাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়! বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল কিন্তু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে!

বিশেষতঃ তেরো চোদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না; স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধ-আধ কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি, এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা

তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সে জন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের একটা স্বাভাবিক অনিবার্য্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়। সেও সর্ব্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ, সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারীজাতিকে কোন এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়। মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুগ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছে এইটে তাহাকে সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিত, তাহা হইলে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন

তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন "ঢের হয়েচে, ঢের হয়েচে! ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না! এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে! একটু পড়গে যাও!" তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মাসীর এতটা যত্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া কেবলি তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকাণ্ড একটা খাউস্ ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, "তাইরে নাইরে নাইরে না" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। জন্তুর মত একপ্রকার অবুঝ ভালবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসরের মত কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত। স্কুলে এত বড় নির্ব্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দ্দভের মত নীরবে সহ্য করিত, ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোন একটা ছাদে দুটি একটি

ছেলে মেয়ে কি-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত। একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মামা, মার কাছে কবে যাব?" মামা বলিয়াছিলেন "স্কুলের ছুটি হোক্।" কার্ত্তিক মাসে পূজার ছুটি সে এখনো ঢের দেরী।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একেত সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাষ্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত বারম্বার অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোন অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্ব্বক বেশী করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত। অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া কহিল "বই হারিয়ে ফেলেচি," মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেচ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে' বই কিনে দিতে পারিনে!" ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেইরাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী

এই ব্যাপারটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্ম্মণ্য অদ্ভুত নির্ব্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবু পুলিষে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দুইজন পুলিষের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাসী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্ম্মভোগ! দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও!" বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিতও না-হক অনেক খিট্‌খিট্ করিয়াছেন। ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেচে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?" বিশ্বম্ভর বাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন, ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল—বলিল "মা, আমাকে মারিস্‌নে মা। সত্যি বল্‌চি আমি কোন দোষ করিনি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বিশ্বম্ভর বাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "ফটিক, তোর মাকে আন্‌তে পাঠিয়েচি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন অবস্থা বড়ই খারাপ। "আজ রাতটা যদি কেটে যায় ত কালকের দিনটা আবার একটু ভাল হতে পারে" বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর বাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাষীদের মত সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ-এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় খানিকটা রাস্তা ষ্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাষীরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া করিয়া জল মাপিত;

ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিস্তর বহু-কষ্টে তাঁহার শোকাচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "ফটিক, সোনার মাণিক আমার!" ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল "অ্যাঁ।" মা আবার ডাকিলেন "ওরে ফটিক্, বাপধনরে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্চি।"

বুদ্ধচরিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বুদ্ধের অলৌকিক জন্ম।

পাঠকদের স্মরণ থাকিবে যে জয়সেনের এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম সিংহহনু এবং কন্যার নাম যশোধরা। সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন এবং যশোধরার দুই কন্যা মায়াদেবী এবং মহাপ্রজাপতি। এই দুই কন্যার সহিত শুদ্ধোদনের বিবাহ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শাক্যবংশের বিবাহ কোলি

বা ব্যাঘ্রপুর-বংশের সহিত হইত। সুতরাং শুদ্ধোদন আপনার পিসির দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইলে অবশেষে যখন প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইল তখন মায়াদেবী আপনার স্বামীকে বলিলেন—আমি পিত্রালয়ে যাইব; সেখানে জননী ও বন্ধুবান্ধবদিগের মুখ দেখিয়া ভাল থাকিব। শুদ্ধোদন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ব্যাঘ্রপুরে পাঠাইবার সমুদায় আয়োজন করিলেন। ব্যাঘ্রপুর কপিলবস্তু হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। মধ্যবর্ত্তী পথসকল পরিষ্কার করিয়া সমতল করিয়া দেওয়া হইল; পথের দুই পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল; নির্ম্মল জলপূর্ণ কলসসকল মধ্যে মধ্যে স্থাপিত হইল। মায়াদেবী এক স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া পিত্রালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সহস্র ভদ্রবংশোদ্ভূত কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন।

ব্যাঘ্রপুর এবং কপিলবস্তুর মধ্যে এক প্রকাণ্ড শালবন ছিল তাহাকে লম্বিনীর উদ্যান বলিত। কার্লাইল সাহেব এই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এখনও অসংখ্য শালবৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মায়াদেবী বৃক্ষদিগের সৌন্দর্য্য দেখিয়া রথ থামাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন—আমাকে একটি বৃক্ষের নিকটে লইয়া যাও, আমি উহার একটি শাখা লইব। তৎপরে রথ হইতে নামিয়া নিজ ভগ্নী প্রজাপতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি একটি পাল্কীর উপর বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর তিনি ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষ হইতে একটি শাখা ভাঙ্গিয়া লইলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের চতুর্দ্দিক আবরণ করিয়া দিল এবং কথিত আছে যে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দক্ষিণ দিক

কড়িকাঠ বসাইয়া দিই, তাহাতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির নিবৃত্তি হয়। ভগবান সেইরূপ শক্তিসমূহকে পরস্পর পরস্পরের বিরোধী করিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করাইয়া লন। যদি তাঁহার এমন ইচ্ছা হয় যে অগ্নির দাহিকা-শক্তি থাকিবে না, একজন লোককে অগ্নিতে ফেলিয়া দিলেও সে অগ্নিতে পুড়িবে না, ভগবান এমন একটি বিপরীত শক্তি সেই লোকের ভিতর আনিয়া দিতে পারেন যাহার বলে অগ্নির দাহিকা-শক্তির নিবৃত্তি হইবে। এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অনৈসর্গিক হইল না। স্বাভাবিক শক্তিসমূহ দিয়া ভগবান নিজ অভিপ্রায়সকল সিদ্ধ করিয়া লন। আমরা সেই জন্য বলি যে অনৈসর্গিক ঘটনা পৃথিবীতে কখনও হইতে পারে না। কেননা অনৈসর্গিক কথার অর্থ স্বভাবের নিয়মভঙ্গ। ভগবান যেমন পাপ করিতে পারেন না, তেমনি তিনি নিজের নিয়মভঙ্গ করিতেও পারেন না। তিনি সূর্য্যকে বলিতে পারেন না তোমার গতি স্থগিত কর। তেমনি তিনি স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া ইহা বলিতে পারেন না যে, একজন শিশু জননীর দক্ষিণ দিক হইতে নির্গত হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। ভগবানের যদি কোন বিশেষ অভিপ্রায় থাকে তিনি তাঁহার নিজ নিয়ম-দ্বারা, প্রাকৃতিক শক্তির পরস্পর নিবৃত্তিদ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবেন। কিন্তু যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, যে নিয়ম প্রকৃতিতে সন্নিহিত আছে, তাহার ব্যতিক্রম কখন হয় নাই, এখন হইতেছে না এবং কখন হইবে না। বুদ্ধের জন্মকাহিনী সেই জন্য মিথ্যা—ইহা স্থির হইল। অথচ সকল বৌদ্ধেরাই মিথ্যা হইলেও ইহা মানিয়া লইয়াছেন ইহার অর্থ কি?

মায়াদেবীর প্রসব সঞ্চার হইবার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে তখন নানাপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার

মধ্যে একটি ব্যাপার এই যে আকাশে পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। এখন পাঠকেরা বলুন দেখি যে বাস্তবিক পদ্মফুল ফুটিয়াছিল কি না? আমরা বলি ফুটিয়াছিল। কোথায়? আমরা বলিব ভক্তের হৃদয়-আকাশে। প্রতি পদার্থকে আমরা দুই ভাবে ভাবিতে পারি। একটি সেই পদার্থের দিক হইতে, আর একটি ভাবের দিক হইতে। একজন লোক প্রফুল্লভাবে সদা বিচরণ করে, সে তাহার বন্ধুর মুখকেও প্রফুল্ল দেখে। অন্য একজন লোক সদা বিমর্ষ থাকে, সে সেই বন্ধুকেই বিমর্ষ দেখে। বলুন দেখি, সেই প্রফুল্ল ভাব এবং সেই বিমর্ষ ভাব কি সেই বন্ধুতে আছে? একই সময়ে বন্ধু বিমর্ষ এবং প্রফুল্ল কিরূপে হইতে পারেন? আমরা বলিব যে প্রফুল্ল ভাব সেই প্রফুল্ল-হৃদয় ব্যক্তির মনে, আর বিমর্ষ ভাব বিমর্ষ ব্যক্তির মনে। তেমনি একটি গোলাপ ফুলেরও দুই দিক আছে। যখন গোলাপের দিক হইতে দেখি, তখন গোলাপটির ভিতর পাপড়ি আছে, তাহাতে রঙ আছে, তাহার আয়তন আছে এই দেখিব। কিন্তু দর্শকের দিক হইতে দেখিলে বলিব যে গোলাপ হাসিতেছে। এখন এই হাসিটি গোলাপে, না দর্শকে? দর্শকের হৃদয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপে সকল পদার্থকে দুই দিক হইতে দেখা যায়। বস্তুর দিক হইতে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সৃষ্টি, ভাবের দিক হইতে কবিতা, ভক্তি এবং ধর্ম্মের সৃষ্টি। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন, তাহার পর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন ইত্যাদি ব্যাপার বুদ্ধের দিক হইতে দেখি এবং সেই সকল ব্যাপার লইয়া বুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়। আবার বুদ্ধ জন্ম-গ্রহণ করিলে সমুদায় জগৎ উৎফুল্ল ভাব—দেখাইয়াছিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার সিদ্ধি হইবার সময় পাপপুরু-

যেরা বিকটাকার ধরিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইত্যাদি ব্যাপার ভাবের দিক হইতে দেখিতে হইবে এবং এই সকল লইয়া বৌদ্ধ ভক্তিশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ কবিতা। কোন মহাপুরুষের ইতিহাস ধরিলে দুইয়েরই সামঞ্জস্য আবশ্যক। কেবল ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট থাকিলে ইতিহাসের মাধুর্য্য থাকে না, এবং কেবলমাত্র ভাব লইলে তাহার ইতিহাসত্ব চলিয়া যায়। প্রকৃত ইতিহাসে দুইটি থাকাই আবশ্যক। এই জন্য আমরা কোনটিকে পরিত্যাগ করিলাম না। অনেক সময় ভক্তের উচ্ছ্বাস এত অধিক দূর গড়াইয়া যায় যে তাহা উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। সেগুলির উল্লেখ না করাই ভাল। কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন কবিতার নিয়মকে অতিক্রম না করে, ভাব যখন অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহা আমাদিগকে লইতে হইবে—ছাড়িলে চলিবে না। পাঠকেরা এই ভাবে যদি বুদ্ধ এবং অন্যান্য মহাপুরুষের জীবনীসকল পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা নহে, তাঁহারা ভাবসাগরে সন্তরণ দিয়া জীবনের কবিত্ব, মাধুর্য্য এবং নিগূঢ় তাৎপর্য্যসকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

তবে বুদ্ধ মাতার দক্ষিণ দিক হইতে উৎপন্ন হইলেন একথার অর্থ কি? তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন এইটি ঐতিহাসিক ব্যাপার, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বের কথাটি ভাবুকের ভাব। আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, যেখানে কোন মহাপুরুষ, দেব কিম্বা দেবী পবিত্রতার আধার হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে সকলপ্রকার জড়পদার্থের ভাব হইতে পৃথক রাখিতে যত্নবান হয়। তাহারা তাঁহাদিগের আত্মা এবং শরীরকে পৃথক করিয়া দেখে। আত্মা দেবপদার্থ। ইহা বিশুদ্ধ চিন্তার আকাশে উড্ডীয়-

স্থান থাকে—পৃথিবীর অতীত। কামনা ইহাকে কলঙ্কিত করেনা; মাংসপিণ্ড ইহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না। বিশুদ্ধ চিন্তা কেবল ভাব লইয়া থাকে—ইহাতে জড়ের সংস্পর্শ থাকে না। ইহা নিষ্পাপ, নির্ম্মল এবং নিষ্কলঙ্ক। আমরা যখন সংসার ছাড়িয়া বিশুদ্ধ চিন্তার রাজ্যে ভ্রমণ করি, তখন আমরা ততটা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। আত্মার নিবাস সত্য, শিব সুন্দরে। এখানে পৃথিবীর দুর্গন্ধ পৌঁছে না, ইন্দ্রিয়েরা অধিকার পায় না। মহাপুরুষেরা সাধারণ লোক হইতে ভিন্ন জীব। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা কেবল বিশুদ্ধ চিন্তা লইয়া থাকেন। পৃথিবী তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করুক, তাঁহারা এখানকার সম্ভোগ এবং কষ্টের অতীত। তাঁহাদিগের নাম করিলে তাঁহাদিগের শরীরের কথা মনে উদয় হয় না; যে ভাব লইয়া তাঁহারা বিখ্যাত সেই ভাবটি কেবল মনে হয়। যখন ঈশার কথা বলি, তখন কি আমরা তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বা রূপ মনে করি, না তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার ক্ষমা, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার ক্রুশে মৃত্যু এই সকল কথা মনে পড়ে? শরীরী ঈশা—আমাদের কাছে একথার কোন অর্থ নাই। তিনি কিরূপ দেখিতে ছিলেন তাহা জানি না। যখন তাঁহার নাম করি তখন ভাবময় ঈশাই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হন। প্রসিদ্ধ দার্শনিকেরা বলেন যে, এই ভাব কখন পৃথিবীর হইতে পারে না—ইহা ঈশ্বর হইতে আগমন করে, ইহার জন্ম স্বর্গে। ইহা কামসম্ভূত বা শরীরসম্ভূত নহে। ইহার জন্ম শরীরের জন্মের মত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ চিন্তা ঈশ্বরের সন্তান; মনুষ্যের, নরনারীর সন্তান নহে। সুতরাং খ্রীষ্টানেরা যখন ঈশার জন্ম ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁহারা ভাবময় ঈশাকে ভাবেন, শরীরী ঈশাকে তাঁহারা কোন-

প্রকারে লক্ষ্য করেন না। সেই জন্য ভাবময় ঈশাকে তাঁহারা ঈশ্বরসন্তান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার জন্ম কখন মনুষ্য-শরীরে হইয়াছে ইহা তাঁহারা বলেন না। তিনি কামসম্ভূত নহেন এবং যখন তাঁহার জননীর গর্ভসঞ্চার হয় সে গর্ভসঞ্চার নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ বলিয়া বর্ণিত হয়।

গ্রীস দেশে প্যালাস (মিনার্ভা) বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং তিনি জ্ঞানদেবী হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে দেখা দিতেন। বিখ্যাত আথেন্স নগরের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। তিনি যেমন পরমা সুন্দরী ছিলেন তেমনি আবার তিনি জ্ঞানে সম্পূর্ণা। গ্রীক দার্শনিক-দিগের মতে জ্ঞান পবিত্র পদার্থ, বিশুদ্ধ চিন্তারাজ্যের পদার্থ। ইহা নিষ্পাপ, সুতরাং ইহার জন্ম মানুষিক নহে। গ্রীকেরা বলে যে, ইহাঁর পিতা পরম দেব জি.উস্ অর্থাৎ জুপিটার ছিলেন এবং ইনি মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন হন নাই।—পিতার মস্তক হইতে ইহাঁর জন্ম। যে চিন্তা বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ তাহার জন্ম শরীরে হইতে পারে না। অতএব প্যালাস দেবীর জন্ম পিতার মস্তক হইতে হইয়াছিল। বোধ হয় আমাদের সীতার জন্মবিবরণ এইপ্রকার বুঝিলে ক্ষতি হয় না।

বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত এই ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ-রূপে পরিষ্কার হইয়া যায়। তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। একেবারে কামনার নির্ব্বাণ না হইলে মানুষ মুক্তির অধিকারী হয় না। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম পুণ্যের ধর্ম্ম। তিনি নিজে ষড়-রিপুর দাসত্ব হইতে মুক্তশৃঙ্খল হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সংসারের কোন যোগ ছিল না। পিতা, ভার্য্যা, পরিবার, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বল, প্রভুত্ব সকলই জলাঞ্জলি দিয়া তিনি

সর্ব্বভূতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্য প্রচার করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসকের সেই জন্য তাঁহাকে জড়জগৎ হইতে একেবারে পৃথক রাখিতে যত্ন করিতেন। তিনি জীবনে ও মরণে জড়ের উপর আধিপত্য দেখাইয়া গিয়াছিলেন। কেবল জন্মবিষয়ে এক সন্দেহ রহিল। কিন্তু এইখানে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জন্মতত্ত্ব আনিয়া সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন। যিনি শরীর নহেন, জড় নহেন, সুতরাং শরীর ও জড়ের কামনাসকলের অতীত, যিনি আত্মা, একটি পরম ভাব, তিনি বিশুদ্ধ চিন্তারাজ্যের লোক। তিনি ভগবানের চিন্তা হইতে উদ্ভূত। তাঁহার শরীরী জন্ম হইতে পারে না, তিনি কামোদ্ভূত নহেন। অন্যান্য লোকের জন্মের ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি তাঁহার জননীর দক্ষিণ দিক হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি কামনার বাহিরে জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং কামনার অতীত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ শরীরী মনুষ্য ছিলেন না। তিনি একটি ভাব; ভাব দেবসম্ভূত এবং ইহার জন্ম পবিত্র, নির্দ্দোষ এবং আধ্যাত্মিক।

আমরা যেরূপ অর্থ করিতে চেষ্টা করিলাম ইহা ইতিহাসের—আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসের কথা। ঈশা সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা খাটে, গ্রীক প্যালাস সম্বন্ধেও এই ব্যাখ্যা খাটে। তুলনার পদ্ধতি অনুসারে এই ব্যাখ্যা আমরা বুদ্ধের সম্বন্ধেও স্থির করিলাম। মনের কতকগুলি অবস্থা হইলে কতকগুলি ঘটনা হইবেই হইবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। যেখানে কোন মহাপুরুষ পুণ্যপ্রচারের জন্য জীবন দিয়াছেন, তাঁহার জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু শরীরী নিয়মের অতীত বলিয়া স্থিরীকৃত হইবেই হইবে। যতদিন ভারতজগৎ

থাকিবে ততদিন সেই মহাপুরুষ অশরীরী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহার জন্মও ভাবের জন্ম, অশরীরী জন্ম বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা অনেক স্থলে ঈশার জন্ম লইয়া এবং বুদ্ধের জন্ম লইয়া উপহাসের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা ভাবুক তাঁহারা এই উপহাসিকে তুচ্ছ করেন। ইতিহাসের খাতিরে যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিশ্বাস করি তেমনি এই ভাবের ঘটনাকেও বিশ্বাস করিতে হইবে। যেমন জড়জগতের নিয়ম-প্রণালী আছে, এবং সেই সকল নিয়মের অর্থ করিবার প্রণালী আছে; তেমনি অন্তর্জগতের, আধ্যাত্মিক জগতেরও নিয়ম-প্রণালী আছে এবং তাহার অর্থ করিবার পৃথক প্রণালীও আছে। বুদ্ধের অশরীরী অকামসম্ভূত জন্ম প্রাকৃতিক ঘটনা নহে। ইহা ভাবের কথা, ভক্তির কথা এবং শাস্ত্রের কথা।

তোমরা এবং আমরা।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিতরঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি!
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও!
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া ল'য়ে
হেসে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে',
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে'?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

গুরুঠাকুর।

গোস্বামী নিত্যানন্দ ঠাকুর সবেমাত্র ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার গৃহশূন্য হন। পনর বৎসর পূর্ব্বে আর একবার তিনি পত্নীবিয়োগ-বিধুর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন ত শোকটা এত লাগে নাই, তখনও গৃহশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু

গৃহ ত এত শূন্যময় হয় নাই। হায়! তবে কি এ শোক মাধ্যাকর্ষণের মত প্রতিপদে বাড়িয়াই চলিবে? গোস্বামী এখন পূজা করিবার সময় দেখিতে পান, পূজার উপকরণ তেমন সুশৃঙ্খলায় নাই, আহার করিতে করিতে বুঝেন, রন্ধনে তেমন পারিপাট্য নাই, শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, শয্যারচনায় সে নিপুণতা নাই; শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। এইরূপে দিনে দিনে গোস্বামী ঠাকুর, ইন্দুমতী-বিরহে অজের মত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের গুরুগিরি ব্যবসায়। শিষ্য সেবকও বিস্তর। এক ঘর রাজাও তাঁর শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত। শীঘ্রই গুরুদেবের এই বিপদের কথা শিষ্যমহলে প্রচার হইল, সেই ভক্ত রাজ-হৃদয়ে কিছু অধিক মাত্রায় ব্যথা লাগিল। গুরুর এ অঙ্গহীনতা রাজার অসহ্য বোধ হইয়াছিল, তাই তিনি ভগার্দ্ধাঙ্গ ঠাকুরের অঙ্গ সংস্কারে ব্যস্ত হইলেন। পাত্রীর অনুসন্ধানে দেশবিদেশে লোক ছুটিল। রাজা যে বিবাহের সহায়, সে বিবাহে পাত্রীর অভাব কোথায়? অচিরে একটী রূপ-গুণ-সম্পন্না ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা গোস্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। লোকে বলিত ঠাকুরের গলে এ রত্ন মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পাইবে।

এতদিনে নিত্যানন্দের নিরানন্দ হৃদয় আনন্দে পুরিয়া উঠিল, শূন্যগৃহ আবার পূর্ণ হইল। তখন গোস্বামী ঠাকুর নূতন উৎসাহে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে গুরুদেবের প্রবাসযাত্রার সময় আসিল, তিনি প্রবাসে বাহির হইলেন। কিন্তু এবার আর তত দীর্ঘকাল প্রবাস-বাস ঘটিল না। বাটীতে প্রবীণ অভিভাবক কেহ নাই, শুধু যুবতী বিধবা ভগ্নী ও বিধবা কন্যা আর একটী শিশু-ভাগিনেয়। বিশেষ ভগ্নী ও কন্যা উভ-

সেই সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক। অন্য সময়ের কথা দূরে থাক্, এ-হেন আনন্দময় বিবাহ-উৎসবেও, গোস্বামী তাহাদের একটিবার হাসি দেখেন নাই। এমন হৃদয়হীনাদের কাছে বালিকা সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়া বেশী দিন দূরদেশে থাকা, ঠাকুর বিধেয় জ্ঞান করিলেন না। কাজেই এবার তাঁহাকে প্রবাসের পালা সংক্ষেপেই শেষ করিতে হইল। বিশেষ শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না, তাই তিনি তিন মাসের পরিবর্ত্তে তিন সপ্তাহ মধ্যে গৃহে ফিরিলেন।

গ্রামে অনেকেই সম্বন্ধে গোস্বামীর নাতি, তাহার মধ্যে এক-জন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদাদা, এবার যে এত তাড়াতাড়ি এসে পল্লেন?" ঠাকুরদাদা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাতি-সম্প্রদায় হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বুঝিস্‌নে ত—চুম্বকের টান কত?" কথাটা বুঝি গোঁসাইজীর মনোমত হইয়াছিল, তাই তিনি দীর্ঘ শিখা দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে ভায়া!"

নিত্যানন্দের সমবয়স্ক-মহলেও তাঁহাকে লইয়া খুব একটা আমোদ পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন, "কি হে নিত্য ভায়া, দিন্‌কের দিন যে শ্রী ফিরে যাচ্ছে, পাকা হরিতকী খেলে নাকি?" সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ভায়াকে আর কিছু খেতে হবে কেন? জাননা—বালা স্ত্রী ক্ষীর-ভোজনম্।"

বিবাহের তিন বৎসর পর দৈবপ্রসাদাৎ গুরুদেবের একটী পুত্র জন্মিল। গৃহে আর আনন্দ ধরে না! দেখিতে দেখিতে ছেলেটী নির্ব্বিঘ্নে আট মাস অতিক্রম করিল; মহাধুমধামে অন্ন-প্রাশন সমাধা হইয়া গেল। কেবল নামকরণ লইয়া একটু গোল বাধিয়াছিল। গোস্বামী ঠাকুরের ইচ্ছা, ছেলেটীর নাম

হয় সচ্চিদানন্দ, কিন্তু নাম শুনিয়াই [illegible]হিণী জ্বলিয়া উঠিলেন, নামটার সঙ্গে সঙ্গে যেন শিখা[illegible] খড়্গধারী এক বিভীষিকা-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, আমার সোনার বাছার এমন বুড়োটে নাম হতে গেল কেন? তখন তিনি বাছিয়া বাছিয়া নাম রাখিলেন—হেমচন্দ্র। বুঝি গোঁসাই-গৃহিণীর মৃণালিনীখানা পড়া ছিল। যাই হোক, শেষ হেমচন্দ্র নামই বলবৎ রহিল। গোস্বামী মহাশয় যদি কখনও ভ্রমক্রমে আদর করিয়া ছেলেকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ফেলিতেন, তবে তখনই মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া আশপাশ চাহিয়া, মনে মনে বারকত বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্র পঞ্চ বর্ষ অতিক্রম করিল। এখন তার লেখা-পড়ার পালা। সে অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বার বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে ছয় খানা বাঙ্গালা বই শেষ করিয়া ফেলিল। তখন গোস্বামী ঠিক করিলেন, ছেলেকে "মুগ্ধবোধ" পড়িতে দিবেন; ভরসা সে ভবিষ্যতে সাহিত্য ও স্মৃতিচর্চ্চা করিয়া একটা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিবে। কিন্তু হেমের গর্ভধারিণী তায় রাজি নন। তিনি চান, ছেলেকে ইংরাজীও শিখাইতে হইবে। শেষ নিত্যানন্দের সেই প্রিয় শিষ্য রাজা বাহাদুরের সাহায্যে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে হেমচন্দ্রের পড়া ঠিক হইল। রাজার দুই পুত্র কলিকাতায় পড়িতেন, গুরুপুত্রও এখন হইতে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার-দ্বয় গুরুপুত্রকে লইয়া প্রথম প্রথম কিছু সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। বৎসরকত কলিকাতায় থাকিয়া কুমারযুগলের পান-আহারটা পিতার অগোচরে কিঞ্চিৎ ম্লেচ্ছ-সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, পাছে এ সকল ব্যাপার গুরুপুত্রের নয়নগোচর হইয়া, গুরুসূত্রে পিতার

শ্রুতিগোচর হয়, এ[illegible] তাঁহাদের মনে প্রায়ই হইত, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা বু[illegible] ভয় নিতান্তই অমূলক। অচিরাৎ এমন দিন আসিল, যখন গুরুপুত্র বলিতেন, "এ সব ছাড়তে হয় তোমরা ছাড়, আমি কিন্তু আর ছাড়চি না।"

এইরূপ হেমচন্দ্র একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কলিকাতায় কাটাইল। সে এই কয় বৎসরে সংস্কৃত কলেজে দুইবার "প্রমোশন" পাইয়াছে। এখন আর সে ইংরাজী বুক্‌নি ভিন্ন কথা বলিতে পারে না। হেম যখন বাড়ীতে আহার করিতে বসিয়া বলে তরকারীগুলা অতি nasty, বাটীটা বড় dirty, তখন তার মা ও পিসি অবাক্ হইয়া মহানন্দে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হেমের বিদ্যা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। এই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গুরুগিরি ধরিতে হইল। তবে ব্যবসাটা তার মনোমত নয়। টেরি মুছিয়া টিকি রাখিতে, সার্ট ছাড়িয়া নামাবলী ধরিতে সত্যই তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু কি করে, এমন সুবিধা ত আর কিছুতে হয় না, কাজেই সে ব্যবসাটাকে ত্যাগ করিতেও পারিল না। তবু সে উহার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম কাটিল, ঠিক করিল টেরিটা ত থাকিবেই সঙ্গে সঙ্গে টিকিও রাখিবে, কিন্তু "হোমিওপ্যাথিক ডোজে" তিলকও কাটিতে হইবে—তবে সেটা রসকলির রূপান্তর মাত্র। আবার দায়ের উপর দায়, শিষ্যবাড়ীতে কাঠের মালা না পরিয়া গেলেও চলে না, অগত্যা, সে এক হুক-লাগান মালা সংগ্রহ করিল। মালাটা পকেটেই থাকিত আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ পকেটের মালা গলায় উঠিত। কিন্তু ইহাতেও ত নিষ্কৃতি নাই, দুষ্ট লোকে আবার তাঁর সাধের গোঁফ দাড়ির উপরেও কুদৃষ্টি দেয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ইহারও একটা

কিনারা করিয়া ফেলিল। যদি কেহ বলিত, "গোঁসাই ঠাকুরের গোঁফ দাড়ি কেন?" তবে সে তখনই হাস্যমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টে হাত দুটী জোড় করিয়া, মস্তক স্পর্শ করিয়া একটা ভাব ধারণ করিত, অর্থ—এ সব বাবা তারকেশ্বরের মানত। হেমচন্দ্র আর এক সমস্যায় পড়িল। সে দেখিল, গায়ত্রী না জপিলে, জপ আহ্নিক না করিলে এ ব্যবসায়ে মান থাকে না। কলিকাতায় থাকিতে, প্রথম প্রথম যাবনিক খাদ্যগুলা শোধন করিবার নিমিত্ত গায়ত্রী জপার প্রয়োজন হইত বটে, কিন্তু সে যে অনেক কালের কথা! এখন ত তার কিছুই মনে নাই! তবু সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল। শিষ্যবাড়ী গিয়া সে স্নানান্তে সুর করিয়া আওড়াইত!

"অত্রার্চ্চয়াং স্বতী নাতি ক্রমেহতিঃপর্য্যধী গতো।
অপি পদার্থসংভাব্য গর্হানুজ্ঞা সমুচ্চয়ে।
মুরারিঃ লক্ষ্মীশঃ বিষ্ণুৎসবঃ, হৃষীকেশঃ দামোদরঃ।
মাধবর্দ্ধিঃ শিবঙ্কারঃ কৃষ্ণৈকত্বং মুকুন্দোকঃ কৃষ্ণৈক্যং ভবৌষধং।"

সাধারণ শিষ্যবর্গ ভাবিত, ঠাকুরপুত্র ঠাকুর অপেক্ষাও পণ্ডিত। কই ঠাকুর ত এমন করিয়া আহ্নিক করিতে পারিতেন না।

হেমচন্দ্র স্থানবিশেষে গীতামহিমা ও বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখা করিয়া শিষ্যা ও শিষ্যবর্গের প্রেম ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেন। সুবিধা পাইলেই বিবর্ত্তবিলাসের অর্থ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মও যথাস্থানে প্রচার করিতেন। একদিন মেদিনীপুর অঞ্চলে কোন শিষ্যের অন্তঃপুরে, তিনি রাসলীলা লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন, এই উপলক্ষে সে বাটীর জনৈক ইংরাজী-পড়া নব্য যুবা নিতান্ত অহিন্দুর মত ব্যবহার করিয়াছিল। সে কিনা ঠাকুরপুত্রকে বাহিরের এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুর কাল রাসলীলার অভিনয়

দেখিয়াছেন, আজ গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হবে।" সেই ভক্তিহীন যুবকের পীড়নে ঠাকুরপুত্র নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষ প্রবীণ ভক্তের দল জুটিয়া ঠাকুরপুত্রকে এই দানবের হাত হইতে উদ্ধার করেন। শুনিতে পাই, সেই হইতে হেমচন্দ্র শিষ্যগৃহে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়াছে।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

সুন্দরি রাধে আওএ বনি।
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি।
কুঞ্চিতকেশিনী, নিরুপমবেশিনী,
রস-আবেশিনী, ভঙ্গিনী রে।
অধর-সুরঙ্গিনী, অঙ্গতরঙ্গিনী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে।
কুঞ্জরগামিনী, মোতিমদশনী,
দামিনীচমক-নেহারিণী রে।
আভরণধারিণী, নব অভিসারিণী,
শ্যামর হৃদয়বিহারিণী রে।
নব-অনুরাগিণী, অখিল-সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী, হাসবিকাশিনী,
গোবিন্দদাস-চিত-শোহিনী রে।

০ ২
।

।০।১।২।৩।

১ ২
॥ র্সা -া র্গা মা। র্গা - র্মজ্ঞা সা -া। সা -ঋ। সা র্গা।
॥ সু — ন্দ রী। রা — ধে —। আ — ওএ ব।

৩ ॥
। সা -া -া -া । সা পা পা পা । পা -া পা পা ।
। ণি — — — । ব্র জ র ম । নী — গ ণ ।

। পা পদা মা পা । দা -া -া -া ॥ সা -রা ঋা মা ।
। মু কু ট, ম । ণি — — — ॥ কু — ঞ্চি ত ।

। পা -া পা পা । মা পা দা ঞা । র্সা -া র্সা র্সা ।
। কে — শি নী । নি রু প ম । বে — শি নী ।

। পা দা ঞা -র্সা । র্লা -া র্সা র্সর্লা । ঞা -া র্জ্ঞা র্লা ।
। র স আ — । বে — শি নী । ভ — ঙ্গি নী ।

। র্সা -া -া -া । ঞা র্সা র্লা র্সা । ঞা -া দা পা ।
। রে — — — । অ ধ র, সু । র — ঙ্গি নী ।

। পা -া ঞা দা । পা -া ঞা দা । পা -া দা ঞা ।
। অ — ঙ্গ, ত । র — ঙ্গি নী । স — ঙ্গি নী ।

। পা দা ঞা র্সা । ঞা -া র্জ্ঞা র্লা । র্সা -ঞা -দা -পা ॥
। ন ব ন ব । র — ঙ্গি নী । রে — — — ॥

। সা -া পা দা । ঞা -া সা সা । ঞা -া ঋা লা ।
। কু — ঞ্জ র । গা — মি নী । গো — তি ম ।

। সা ঞা সা -া । সা -া র্সা ঞা । দা পা মা ঋা ।
। দ শ নী — । দা — মি নী । চ ম ক, নে ।

। রা -া মা ঋা । লা -া -সা -া । রা ঋা ঋা রা ।
। হা — রি ণী । রে — — — । আ ভ র ণ ।

। ঋা -রা ঋা ঋা। রা মা ঋা ঋা। রা -া ঋা ঋা।
। ধা — রি ণী। ন ব অ ভি। সা — রি ণী।

। সা -লা মা ঋা। লা সা ঞা দা। পা -দা ঞা সা।
। শ্যা — ম য়। হৃ দ য়, বি। হা — রি ণী।

। লা -া -া -া। সা রা ঋা মা। পা -া পা পা।
। রে — — —। ন ব অ নু। রা — গি ণী।

। মা পা দা ঞা। র্সা -া র্সা র্সা। পা -া দা ঞা।
। অ খি ল, সো। হা — গি ণী। পূ — র্ণ ম।

। র্ঋা -া র্লা র্সা। ঞা -া র্ঋা র্লা। র্সা -া -া -া।
। রা — গি ণী। মো — হি নী। রে — — —।

। র্সা -া ঞা র্সা। র্লা -া র্সা ঞা। দা -া পা দা।
। রা — স, বি। লা — সি নী। হা — স, বি।

। ঞা -া দা পা। মা র্সা -া ঞা। দা পা মা ঋা।
। কা — শি নী। গো বি — ন্দ। দা স চি ত।

। মা -া ঞা দা। পা -া -া -া॥ ॥
। শো — হি নী। রে — — —॥ ॥

কেদারা—ঢিমা তেতালা।

আহা কি রূপ হেরিনু, মন মোহিল।
স্বপনে দেখা দিয়ে কোথা লুকাল।
কেন রে জাগিলি, কি ধন হারালি হায়
স্বপন-মুরতি আমার কোথা মিলাল।

০ ২
।

।১।২।৩।০।

১ ২ ॥ ৩
॥ ধা । পা মগা মা -া । পা -া র্সা -া । -নর্রা সা নধপা -া ।
॥ আ । হা কি রূ — । প — হে — । — রি স্থ — ।

০
। -া -া -া মগা । -া মা -া -গমপধা । পমগা মা -া -া ।
। — — — ম । — ন — — । মো — — — ।

। রা -া সা -া । -া সা সা সা । মগা পহ্মা ধহ্মা পা ।
। হি — ল — । — স্ব প নে । দে খা দি য়ে ।

০
। গমপা -ধনর্সা -র্রা র্রর্রা । র্সনধা -পহ্মপা -া -া । -া । । ॥
। কোথা — — লুকা । ল — — — । — ॥

৩
। পা পা পা -র্সা । -া র্রা র্সা র্সা । র্সা -র্মা র্রা র্সা ।
। কে ন রে — । — জা গি লি । কি — ধ ন ।

। র্সা র্সা নর্সা -া । -ধা -া পা -া । মা পা -হ্মা পা ।
। হা রা লি — । — — হা য় । স্ব প — ন ।

। ধা পমা গমা -পা । গমা -রা সা -া । সা মা -গা -পা ।
। মূ র তি — । আ — মা র । কো থা — — ।

। -হ্মা -পা -া -া । গা মা -পা -ধা । -না -র্সা -র্রা -া ।
। — — — — । মি লা — — । — — — —

০
। র্সা -নধা -পহ্মা -া । -পা -া -া ॥ ॥
ল — — — । — — — ॥ ॥

অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জগতে অভিব্যক্তি তিন ধারায় প্রবাহিত হয়; তাহার মধ্যে একটি ধারা অহংবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বা মনোবৃত্তি—যাহাই বলো; আর একটি ধারা—

দার্শনিক পণ্ডিত। থামো! অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ আছে; উহারা এক বৃত্তি নহে—তিন বৃত্তি (সাংখ্যদর্শনের অমুক পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রত্যুত্তরে সবিনয় নিবেদন। আপনার কথা শিরোধার্য্য! কিন্তু তিনটিই কিছু আর মূল পদার্থ নহে—মূল পদার্থ একটি। সংখ্যা হইতে তো সাংখ্যের উৎপত্তি? সংখ্যার প্রবাহ ধর—১,২,৩,৪,৫ ইত্যাদি। সকলেই কিছু আর মূল সংখ্যা নহে—মূল সংখ্যা ১। যেমন সংখ্যার প্রবাহ তেমনি অভিব্যক্তির প্রবাহ;—

বাল্য	উদ্ভিদ	অহংবৃত্তি
যৌবন	জীবজন্তু	মনোবৃত্তি
জরা	মনুষ্য	বুদ্ধিবৃত্তি

এখানেও মূল এক বই দুই নয়।

দার্শনিক পণ্ডিত। মূল—অহংবৃত্তি নহে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি। "মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারান্মনঃ" (সাংখ্যদর্শনের অমুক পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রত্যুত্তরে সবিনয় নিবেদন। ইহা সকলেরই দেখা কথা, আপনিও বোধ করি দেখিয়া থাকিবেন যে, শিশুর বুদ্ধি অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মন অভিব্যক্ত হয়; এবং তাহারও পূর্ব্বে তাহার অহং অভিব্যক্ত হয়। আপনার শাস্ত্রেও তো বলে যে, "অয়ং ঘটঃ" "এটা ঘট" এইরূপ নিশ্চয় করার নাম বুদ্ধি। একটি ছয় মাসের কচি বালকের চক্ষের সমক্ষে একটা ঘটি ধরিলে

সে কি করে? "এটা ঘটি" এরূপ যে নিশ্চয় করিবে—সে সামর্থ্য এখনও তাহার জন্মে নাই। "এটা না জানি কি" এইরূপ একটা সংশয় তাহাকে আক্রমণ করে। বেদান্ত-শাস্ত্রে বলে "মন সংশয়াত্মিকা বৃত্তি"। অতএব ঐ বালকের অভ্যন্তরে মন কতকটা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার বুদ্ধি-উন্মেষের এখনও বিলম্ব আছে। এইরূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আগে মন, পরে বুদ্ধি ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্ত হয়। আরও এই দেখা যায় যে, একটি সদ্যোজাত বালক ওরূপ অবস্থায় ঘটির দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে মাত্র—"এটা না জানি কি" এরূপ সংশয়ও তাহার মনে উদয় হয় না; অথচ তাহার ভিতরে অহংবৃত্তি জাগিতেছে। তাহার প্রমাণ—ক্ষুধার সময়ে দুধ না পাইলে সে রাগিয়া কাঁদিতে থাকে। "আমার দুধ চাইই চাই"—আপনার প্রতি এইরূপ একটা টান ইহারই মধ্যে তাহার জন্মিয়াছে। এই জন্য বলিতেছি যে, মন অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অহংবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যদর্শনের কথা একরূপ, আমাদের কথা আর একরূপ; কিন্তু কথার অনৈক্যেই কিছু আর মতের অনৈক্য হয় না—স্থলবিশেষে হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থলে নহে। এমনও অনেক স্থল সময়ে সময়ে উপস্থিত হয় যেখানে কথার বৈপরীত্যে ভাবের ঐক্য এবং কথার ঐক্যে ভাবের বৈপরীত্য সপ্রমাণ হয়। একজন বাঙ্গালীর মুখে "আমি ইংরাজ" অথবা "আমি মিষ্টার অমুক", আর, একজন ইংরাজের মুখে "আমি মিষ্টার অমুক", কথা দুইই সমান—কিন্তু দুই কথার দুই ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। তেম্‌নি আমি যদি লণ্ডনে দাঁড়াইয়া বলি "আমি স্বদেশে আছি" আর কলিকাতায় দাঁড়াইয়া বলি "আমি স্বদেশে আছি" তবে কথা দুইই অবিকল সমান, অথচ

দুই কথার দুই ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যদর্শন উপর হইতে নীচে নামিতেছেন, আমরা নীচে হইতে উপরে উঠিতেছি; এরূপ অবস্থায় সাংখ্যদর্শন যাহাকে প্রথম ধাপ বলিতেছেন আমরা তাহাকে শেষ ধাপ বলিলেই কথাটা সঙ্গত হয়। নচেৎ সাংখ্যদর্শন উপর হইতে নীচে নামিবার সময় যাহাকে প্রথম ধাপ বলিয়াছেন, নীচে হইতে উপরে উঠিবার সময় আমরাও যদি তাহাকে বলি প্রথম ধাপ, তবে সাংখ্যদর্শনের সহিত আমাদের কথার ঐক্যে মতের অনৈক্যই বুঝাইবে, ঐক্য বুঝাইবে না। সাংখ্যদর্শনের সহিত আমাদের যে, মতভেদ একেবারেই নাই তাহা বলিতেছি না—বর্ত্তমান স্থলে বিশেষ কোনও মতভেদ নাই, ইহাই কেবল আমাদের মন্তব্য। পরে আমরা দেখাইব যে, সাংখ্যদর্শনের মহত্তত্ত্ব যদিচ মোটামুটি বলিতে গেলে—বুদ্ধি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার অর্থের দৌড় বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশী; বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কিছুতেই তাহার স্থান সঙ্কুলন হয় না।

আজকাল মাঠে হাটে ঘাটে শাস্ত্রচর্চ্চার যেরূপ প্রবল আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আগে শাস্ত্রে কি বলে না বলে তাহার একটা গৌরচন্দ্রিকা না করিলে যাহা বলিব কোনো কথাই কাহারও মনঃপুত হইবে না, এই বিবেচনায় এখানে অতগুলো বাদানুবাদের উপর প্রবন্ধের গোড়াপত্তন করিতে হইল, নহিলে এতক্ষণে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারিত।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে অভিব্যক্তির ধারা তিনটি;

অহংবৃত্তির অভিব্যক্তি।

প্রাণের অথবা ক্রিয়াব্যূহের অভিব্যক্তি।

আকৃতি এবং গঠনের অভিব্যক্তি।

অতঃপর দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অহংবৃত্তির ভিত্তিভূমি

মূলজ্ঞান, ক্রিয়াব্যূহের ভিত্তিভূমি মূলশক্তি এবং আকৃতি ও গঠনের ভিত্তিভূমি মূলবস্তু।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, যদিও বস্তুসকলের নানাপ্রকার আকৃতি এবং গঠন অভিব্যক্তি হইতে লয়ে এবং লয় হইতে অভিব্যক্তিতে পদনিক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু Matter is indestructible—মূলদ্রব্য অবিনশ্বর। আমরা তাই বলিতেছি যে, মূলবস্তু হয়ও না যায়ও না—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং অভিব্যক্তি হইতে কেবল তাহার নাম, রূপ, গঠন প্রভৃতিই অভিব্যক্ত হয়—মূলবস্তু যাহা আছে তাহাই আছে—তাহাই ছিল এবং তাহাই থাকিবে। আংশিক বস্তুই, পরিচ্ছিন্ন বস্তুই, ভাঙন-গড়নের অধিকারমধ্যে অবস্থিতি করে; যেহেতু মূলবস্তুর একাংশের ভাঙনের নামই অপরাংশের গড়ন। কিন্তু জগতের সমগ্র অংশ ভাঙিয়া জগতের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে না। শরীরের পরমাণুসকল শরীরকে ছাড়িয়া শরীরের বহিস্থিত আর আর বস্তুতে বিলীন হইতেছে; কিন্তু সমগ্র জগতের একটি ধূলিকণাও জগতের বাহিরে যাইতে পারে না। সমগ্র মূলবস্তুর সম্বন্ধে ভাঙন, গড়ন, অভিব্যক্তি পরিবর্ত্তন প্রভৃতির কোন সুদূর প্রসঙ্গও উঠিতে পারে না। অতএব ক্রমাভিব্যক্তি প্রভৃতি যতকিছু পরিবর্ত্তনের ব্যাপার তাহা পরিচ্ছিন্ন বস্তুসকলের মধ্যেই আরব্ধ—মূলবস্তুকে তাহা কোনক্রমেই নাগাল পায় না। এক্ষণে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আকৃতি এবং গঠনের যেখানে যতকিছু অভিব্যক্তি, সেই এক অপরিচ্ছিন্ন মূলবস্তুই তত্তাবতের ভিত্তিমূল। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যেমন Indestructibility of matter মানেন তেমনি Conservation of energy মানেন। তাঁহারা বলেন যে, জগতে নানা শক্তির নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অভি-

ব্যক্তি এবং জয় দুয়েরই সহায়তাকার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমাগতই রূপান্তরিত হইতেছে; কিন্তু সমগ্র ক্রিয়াশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। এ কথা খুবই সত্য। এক শক্তি অন্য শক্তির উপরে প্রযুক্ত হইলে, সেই গতিকে উভয়েরই রূপান্তর-ঘটনা অনিবার্য্য। পর্ব্বত হইতে যদি একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের চাপ ভূতলে খসিয়া পড়ে, তবে তাহার গতিক্রিয়া রূপান্তরিত হইয়া ভূমিতে তাপ উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্গে তাহার আধারবস্তু প্রস্তর-খণ্ডও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রস্তর-খণ্ডের গতিবেগ তাহার বাহিরের অন্য এক বস্তুর শক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতেই এরূপ ক্রিয়া-পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল। কিন্তু জগতের সমগ্র মূলশক্তির বাহিরে এমন কোন শক্তি নাই যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-গতিকে মূলশক্তির ক্রিয়া রূপান্তরিত হইবে। অতএব জগতের পরিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহ ভিন্ন সমগ্র মূলশক্তি অভিব্যক্তি বা অনভিব্যক্তির অধিকারমধ্যে মস্তক অবনত করিতে পারে না। এই মূলশক্তিই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়াশক্তির ভিত্তিমূল। অতএব ইহা স্থির যে, পরিচ্ছিন্ন সাকার বস্তুসকলের ভিত্তিভূমি অপরিবর্ত্তনীয় মূলবস্তু; এবং পরিচ্ছিন্ন শক্তি ক্রিয়াসকলের ভিত্তিভূমি অপরিবর্ত্তনীয় মূলশক্তি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, অহংবৃত্তির ভিত্তিভূমি কি? ইহার উত্তর স্পষ্টই পড়িয়া আছে—অহংবৃত্তির ভিত্তিভূমি মূলজ্ঞান।

মূলজ্ঞান বলিতে প্রথমতঃ বুঝায় বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা বুদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ বুঝায় সামান্য জ্ঞান;—সামান্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—দুয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নাই, কেননা দুইই জ্ঞান; তা ছাড়া, যেমন পিতা আপন পুত্রের সম্বন্ধে পিতা কিন্তু আপন পিতার সম্বন্ধে পুত্র; তেমনি, উচ্চ সোপানের জ্ঞানের

সম্বন্ধে যাহা সামান্য জ্ঞান, নিম্ন সোপানের জ্ঞানের সম্বন্ধে তাহা বিশেষ জ্ঞান। প্রথম ধাপের সামান্য জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান হইতে সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের গোড়াপত্তন আরম্ভ হয়, কি কৃষক কি পণ্ডিত আপামরসাধারণ সকল মনুষ্যেরই যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহাতে কাহারও বুদ্ধিশক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আপামরসাধারণ সামান্য জ্ঞানকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে বিশেষ জ্ঞানে পরিণত করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে আপনার ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করে। দেবদত্তকে আমিও জানি, তুমিও জান। একদিন দেবদত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদের উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত। তুমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিলে "ইনি দেবদত্ত"—আমি ভাবিতেছি যে "এঁকে যেন কোথায় কবে দেখিয়াছি" ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে দেবদত্ত-ঘটিত সামান্য জ্ঞান তোমার আমার দুই জনেরই সমান; কিন্তু দেবদত্ত-ঘটিত বিশেষ জ্ঞান আমা অপেক্ষা তোমার অধিক। ভাল হীরা কাহাকে বলে তাহা আমিও জানি, জহরীও জানে। কিন্তু একখণ্ড হীরা দেখিবামাত্র জহরী বলিবে যে, এটা অমুক শ্রেণীর হীরা; আমি হয় তো অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিব যে, এটা হয় প্রথম শ্রেণীর, নয় দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় তৃতীয় শ্রেণীর, নয় চতুর্থ শ্রেণীর ইত্যাদি। কোন্ শ্রেণীর হীরা কিরূপ তাহা যেমন জানা চাই—তেমনি তাহা দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারা চাই—তবেই বলিব যে তুমি একজন রত্নজ্ঞ পণ্ডিত। যে জ্ঞান যত বিশেষ, তাহার উপার্জ্জনে তত বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজন; এবং যে জ্ঞান যত সামান্য তাহা তত অনায়াসলভ্য। "এটা ঘোড়া" এ কথা বলা সহজ; কিন্তু "এটা আরব-ঘোড়া" এ কথা

বলিতে হইলে ভাবনা চিন্তা আবশ্যক; বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক। আবার "এটা অমুক বয়স্ক আরব-অশ্ব" এ কথা বলিতে হইলে, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক। অতএব যে জ্ঞান যত সামান্য সেই জ্ঞান তত মূল-ঘেঁষা—আর যে জ্ঞান যত বিশেষ সেই জ্ঞান তত ফল-ঘেঁষা। এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত—এরূপ যেন মনে করা না হয় যে, বিশেষ বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান। দেয়াল একটা বিশেষ বস্তু—তা বলিয়া "এটা দেয়াল" এরূপ জ্ঞান বড় যে একটা বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নহে। এখানে বিশেষ বস্তুর কথা হইতেছে না—বিশেষ জ্ঞানের কথা হইতেছে। দেয়াল বিশেষ বস্তু বটে;—কিন্তু বস্তু কথাটাই সামান্যের পরিচায়ক—বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। কেননা, দেয়াল যেন একটা বিশেষ বস্তু হইল—কিন্তু তাহা কিরূপ বস্তু?—প্রস্তর বা ইষ্টক বা কাষ্ঠ? অতএব দেয়াল একটা বিশেষ বস্তু এরূপ জানিলে বুঝায় যে, দেয়াল সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইতে এখনও অনেক পথ অবশিষ্ট আছে।

অতএব বস্তু, বিশেষই হউক্ (যেমন স্বর্ণ, হীরক) আর সামান্যই হউক্ (যেমন মৃত্তিকা ইত্যাদি) তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; জ্ঞান সামান্য কি বিশেষ তাহাই এখানকার মন্তব্য কথা। হীরক বিশেষ-বস্তু বটে কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতীব যৎসামান্য হইতে পারে—এমন হইতে পারে যে আমি শুধু জানি হীরা বেলোয়ারির মত একটা চক্‌চকে সামগ্রী ইহার অধিক আর কিছুই নহে। তেমনি মৃত্তিকা অতীব সামান্য বস্তু হইলেও তৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে; আমি হয় তো জানি—মৃত্তিকা আদিম যুগে কি ছিল—ক্রমে

কিরূপে তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে—তাহাতে কি কি প্রকার পরমাণু আছে—ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত এবং তাহার সঙ্গে সেই সকল বৃত্তান্তের কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, যে জ্ঞান যত সামান্য সেই জ্ঞান তত মূল-ঘেঁষা এবং যে জ্ঞান যত বিশেষ সেই জ্ঞান তত ফল-ঘেঁষা। অতএব গোড়ায় সামান্য জ্ঞান না থাকিলে পরিণামে বিশেষ জ্ঞান ফলিত হইতে পারে না। ইউক্লিডের জ্যামিতি ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। দুই হাড়গিলার চঞ্চুর মাপ যদি সমান হয় আর উভয়ের চঞ্চুব্যাদানের মাত্রা যদি সমান হয়, তবে উভয়েরই উপর-চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে নিম্ন-চঞ্চুর অগ্রভাগ সমদূরবর্ত্তী (ইউক্লিডের চতুর্থ সিদ্ধান্ত); এই সামান্য জ্ঞানের উপরে ইউক্লিড ক্ষেত্রতত্ত্বের গোড়াপত্তন করিয়া ক্রমশই বিশেষ হইতে বিশেষে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। সকল বস্তু ছাড়া পাইলে ভূতলে পতিত হয় এটা কত না সামান্য জ্ঞান; কিন্তু এই জ্ঞান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া মহামহা পণ্ডিতেরা ক্রমে ক্রমে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব সামান্য জ্ঞান সামান্য নহে, তাহাই সমস্ত বিশেষ-জ্ঞানের পত্তন-ভূমি। জ্ঞানের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা নিউটনের জ্ঞান হইতে চাষার জ্ঞানে—চাষার জ্ঞান হইতে জীবজন্তুর মনোরাজ্যে—জীবজন্তুর মনোরাজ্য হইতে জীব এবং উদ্ভিদ্ উভয়-সাধারণ প্রাণমূল-পঙ্কের অহংমাত্র সামান্য বোধে, এবং তাহারও নীচে দল-বদ্ধ পরমাণুপুঞ্জের পৃথক্ সত্তার মূলে জ্ঞানের অতীব অস্ফুট বীজভাবে উপনীত হই। সেখানে বীজ-ভাব শুধু যে কেবল জ্ঞানের তাহা নহে,—শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং ভৌতিক আকার গঠনাদিও সেখানে বীজভাবের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। মনে

কর, পৃথিবী সমুদ্রে বাতাসার মত গলিয়া গিয়াছে, এবং অগ্নির উত্তাপে সমুদ্র বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে; সেই আকাশাবশিষ্ট বস্তুতে আকার গঠনাদি যেমন—শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তেমনি—এবং অহংবৃত্তি তেমনি—তিনই বীজ-ভূত। বীজভূত হইলেও তাহা অভিব্যক্তি-রাজ্যের অন্তঃপাতী; কেননা অঙ্কুরিত হইতে পারাতেই বীজের বীজত্ব। যাহা অঙ্কুরিত হইবার জন্য হয় নাই তাহাকে বীজ বলা সঙ্গত হয় না। যেমন সমস্ত অভিব্যক্তিশীল আকারাদির মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় মূলবস্তুর সত্তা অস্বীকার করা যাইতে পারে না; সমস্ত অভিব্যক্তিশীল ক্রিয়াশক্তির মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় সমগ্র মূলশক্তির সত্তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, তেমনি সমস্ত অভিব্যক্তিশীল অহংবৃত্তির মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানের সত্তা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার পরে মূল জ্ঞান, বুদ্ধি, মন এবং অহংকার এই চারিতত্ত্বের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ এবং সেই প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সহিত আমাদের মতের কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহা সবিস্তরে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

কড়ায়-কড়া কাহন-কানা।

"ইংরাজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে। ... ...

ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয়; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না। ... ...

হিন্দু বলেন যে ধর্ম্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তি-

ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।" সাহিত্য। ৩য় ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

সকল দিক সমান ভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্য মানুষকে কোন-না-কোন বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি থিওরি লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতি সূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা ত এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্ম হিসাবী, দন্তি কাক পর্য্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিসাবী বলিতে পারেন কাকে গিয়াই বা থামিব কেন! বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের দিকে টানিতে হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না—তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার যো নাই—কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, যোড়হস্তে, বিনীতস্বরে আমরা বলি—"প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ; ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি

দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ। এবং এই সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি, দন্তি কাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে ত হিন্দুকে সংসারের কোন প্রকৃত কাজে, মানবের কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে ত তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কসিতে হয়। তুমি যে শোভা-সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে পৃথিবী ত পর্য্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, সে ত অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে, ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানব-প্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গণিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি, নক্ষত্র, দিন, ক্ষণ, লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্ম্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, কাহনকে কড়া কড়িতে ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবল মাত্র, "হিঁদু" হইব, মানুষ হইব না?"

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"পেনি ওয়াইজ্, পাউণ্ড

ফুলিশ্”—বাঙ্গলায় তাহার তর্জ্জমা করা যাইতে পারে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিলা দেওয়া হয়। তাহার ফল হয়, “বজ্র আঁটিন ফস্কা গিরো”—প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা, আচার বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এক জন লোক গরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের বোধ করি অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এই জন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে? আমাদের সুসূক্ষ্ম হিসাবী হিন্দুসমাজ এমন কি অনেক সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত লোককে জানেন না যাহারা কুলরমণীকে কুলচ্যুত করিয়াও সমাজে উচ্চশিরে বিরাজ করে? ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে? আমি যদি অস্পৃশ্য নীচ

জাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দস্তি-হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচ জাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন? প্রতিদিন রাগদ্বেষ, লোভ, মোহ, মিথ্যাচরণে ধর্ম্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি অথচ স্নান, তপ, বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না?

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া ওঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নর-হত্যা পর্য্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনি শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনি যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধূলা এবং ছোট বড় সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ সড়ক হইলে প্রত্যেক মৃত দেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকীর পর্য্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপ অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়—আমাদের দেশে তেমনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে এত পাপ যে প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না, তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোট বড়

সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফস্কা গিরো।

এইরূপে, পাপ পুণ্য যে মনের ধর্ম্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে, পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ, মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভ লোক্‌সান ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়—যদি ওঠা, বসা, মেলামেশা, ছোঁওয়া খাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপ পুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম্ম মনে করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতি সূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর করা যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ, মানুষ ঠেকিয়া শেখে—কিন্তু তিল-মাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানই যুক্তিসঙ্গত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়া-বয়স পর্য্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানই ভাল। তাহা হইলে, তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। কি রাখিলাম আর কি হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবিকঙ্কণে বাণিজ্যবিনিময়ে আছে—

"শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।"

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোন অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য, উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সেই আমাদের যথার্থ লাভ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলি কর্দ্দমের উপর দিয়া, আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়া, পতন পরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী। মাটিতে পদার্পণ মাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র পুণ্যশয্যায় শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতি নিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়—কিন্তু সে হিসাব কি? একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়া ক্রান্তি কাক দন্তির গোল হয় এই জন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁৎ সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতি সম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানব-শিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগ-শিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয় তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্য্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে?

জন্তুদের জীবনের পরিসর সঙ্কীর্ণ, তাহারা অল্প দূর গিয়াই উন্নতি শেষ করে—এই জন্য আরম্ভ কাল হইতেই তাহারা শক্ত সমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এই জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত সে অপরিণত দুর্ব্বল।

জন্তুরা যে স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরাজিতে তাহাকে বলে ইন্‌ষ্টিংক্ট, বাঙ্গলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ সংস্কার। সহজ সংস্কার, অশিক্ষিত পটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্ততঃ করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবশ্যকের আকর্ষণ, চতুষ্পার্শ বাঁচাইয়া, পথ ঘাট দেখিয়া, ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়া, সুবিধার পথ দিয়া আমাদিগকে স্বার্থপরতার সীমা পর্য্যন্ত লইয়া যায়; প্রেমের আকর্ষণ, আমাদিগকে সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া, আত্মবিসর্জ্জন করাইয়া, কখনো ভূতলশায়ী কখনো অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে। আবশ্যকের সীমা আপনার মধ্যে, প্রেমের সীমা কোথায় কেহ জানে না। তেমনি, পূর্ব্ব হইতে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া সমস্ত পতন সমস্ত গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া একটি নিরতিশয় সমতল

সমাজের মধ্যে নিরাপদে জীবন চালনা করিলে, সে জীবনের পরিসর নিতান্ত সামান্য হয়।

আমরা মানবসন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতা; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি; বহুকাল আমাদিগকে শিক্ষা করিতে যায়;—আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ, কষ্ট, পতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য, সেই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে এখনও আমাদের বুদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের মত অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না, অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয় তবে আমরা একান্ত দুর্ব্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্ত্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়া, ক্রান্তি, কাক দন্তি চোখ-বাঁধা ঘানির বলদের জন্য; সে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোল চক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈল নিষ্পেষণ নামক একটি বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়—কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস্ এবং কচ্ছপ

মানক একটি ন্যায়ের কুতর্ক আছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ হয়। একিলিস্ যতই দ্রুতগামী হউক মন্দগতি কচ্ছপ যদি একটে পলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে তবে একিলিস্ তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন—কড়াক্রান্তি, দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ধরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্ত্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্ম্মভূমিতে একিলিস্ এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি, দন্তিকাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। তেমনি আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন, যে, কড়াক্রান্তি, দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে—কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুল চেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমত চলিতে আরম্ভ করা যাক্। আর তা যদি না চাই, তবে কেবল আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অমন সময়যাপনের একটা উপায় বটে। তাহাতে আমাদের পুণ্য প্রমাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু নৈপুণ্য প্রমাণ হয়।

জন্মদিন।

উমারাণি—

সেই যে পুরাণো সুরে, বর্ষ চক্র ঘুরে ঘুরে
জন্মদিনে তব উপনীত।
তুমিও তো সেই মেয়ে, আমি তোর পানে চেয়ে
কেন যদি হয় বিগলিত?

[illegible] —[illegible] —
[illegible]—[illegible]—[illegible] ।
[illegible] বৈচ [illegible],
[illegible] পারে ।
[illegible] কবি [illegible] হও তুমি [illegible],
[illegible] করি আশীর্ব্বাদ ।
[illegible] গাহিবে [illegible]
এই শিক্ষা হোক্—বড় সাধ ।

[illegible]সংবাদ ।

উপন্যাসলেখা ।

[illegible] ফুরাইয়া গিয়াছে, [illegible] তাঁহাদের [illegible] তাঁহারা [illegible] ইত্যাদি [illegible] প্রবৃত্তিতে [illegible] করিতেছে [illegible] হইয়া উঠিয়া [illegible]

[illegible]

প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সংসারে এতদিন কটাই বা খুন হয়, আর ক'জন লোকই বা তাহার প্রতিবাসীর ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়? ভালবাসার মত বিশ্বব্যাপী জিনিস আর কি আছে? এ বিষয়ে লেখকদের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলে তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করা হয়। মিসেস্ মিটিন এক জন উগ্রশিক্ষিতা স্ত্রীলোক—তিনি সমাজের উপর বড়ই নাখোশ। আজকাল বিলাতে এই ধরণের স্ত্রীলোকের একটা দল হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুদিন হইল, লণ্ডনের স্ত্রীস্বাধীনতা সমিতির অধিবেশনে মিস্ কসেন্স্ এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "পুরুষজাতি আমাদের পরম শত্রু, চিরকাল আমাদের প্রতি অত্যাচরণ করিয়াছে ও করিবে। আমাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বক্তৃতার কাল গিয়াছে—এস সকলে আমরা এবার আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হই। বিনা রক্তপাতে কখনও কোন সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্ত্রীলোকেরা ডাইনামাইটের ব্যবহার বেশ জানে—তবে আর ভয় কি? বন্দুকের ব্যাপারটা ভালরকম শিখিলে পুরুষেরা আর আমাদের এত তাচ্ছিল্য করিতে পারিবে না। আপাততঃ পুরুষজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, পরে পুত্রসন্তান বিনাশের জন্য এক আইন জারী করিতে হইবে।"

মিস্ কসেন্সের সখীরাও এইসকল কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলেন। শেষে যখন বড় বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল, তখন একজন পুরুষজাতীয় প্রতিবাসী কৌটার করিয়া একটা ইঁদুর আনিয়া বক্তৃত্রীর গায়ে ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলে সুন্দরী তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ করিলেন।

কিন্তু উপন্যাস লেখার নিয়ম মিসেস্ লিন্টনের সহিত অনেক পুরুষজাতীয় উপন্যাস-লেখকেরও ঐক্যমত দেখা যায়। মিসেস্ লিন্টনের মতে আদিরসাত্মক উপন্যাসগুলি আলমারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেই চলিবে, যাহাতে সাবালকবয়স্ক যুবক যুবতীদের হাতে না পড়ে।

টমাস্ হার্ডি সাহেবও ঐরূপ মতাবলম্বী, কিন্তু তিনি বলেন যে, ঐ সকল উপন্যাস মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া শেষে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া মূল্য একটু অধিক ধার্য্য করিলে আর কোন দোষ হইবে না। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই সকল উপায় স্রোতের মুখে বালির বাঁধ দেওয়ার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। উহা একটা খাতিরের কথা মাত্র।

ওয়াল্টর বেসাণ্ট্ সাহেব ইহাঁদের ন্যায় সমাজদ্রোহী নহেন। তিনি সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও কপট প্রেমকে স্থান দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এই সকলের দ্বারা যে সমাজের মূলে আঘাত লাগে, উপন্যাস-লেখক তাহা দেখাইয়া দিলে বিশেষ উপকার আছে সত্য, কিন্তু আদিরস সম্বন্ধে ফ্রান্সের অনুকরণ করিতে গেলে বিপরীত ফল দাঁড়াইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেসাণ্ট্ বলেন, লিখিবার বিষয় সম্বন্ধে তিনি বয়কাট করিতে চাহেন না, কিন্তু লিখিবার প্রণালীটা ভাল হওয়া আবশ্যক। ইংরাজী সাহিত্যে কপট প্রেমের অভাবই বা কোথায়? হার্ট অব মিড্‌লোথিয়ান, অ্যাডাম বীড, ভিকার অব ওয়েকফিল্ড, দে ন আমার, ইট ইজ ন্ট ভৃতি গ্রন্থে শুধপ্রেম যথেষ্ট আছে। এবং সাধারণবৃদ্ধিবিশিষ্ট লোকেই ইচ্ছা করিলেই এই সকল উপন্যাস পাঠ করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই। কথাপ মিসেস্ লিন্টনের [illegible] আমার

ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারিতা ইংলণ্ডে স্থাপন করিতে চাহেন। প্রস্তাবটা আমাদের মতে অত্যন্ত গর্হিত। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে ইংলণ্ডের যে একমাত্র শ্রেষ্ঠতা আছে তাহা লোপ হইবার সম্ভাবনা। মানবশরীরে পাশব প্রবৃত্তির প্রাবল্য অস্বীকার করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই প্রবৃত্তির দমন করিয়া রাখাই সমাজ ও ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। মিসেস্ গ্রণ্ডীকে এতদিন পরে পদচ্যুত করিয়া দেশে স্বেচ্ছাচারিতা প্রচার করিলে ফ্রান্সের মত অবস্থা দাঁড়াইবে। ফ্রান্সে যে পরিমাণে অশ্লীলতা ও কদর্য্যতা দেখা যায়, ইংরাজ সমাজে মিসেস্ গ্রণ্ডীর শাসনগুণে ততদূর এখনও হয় নাই। তবে যদি ইংরাজ উপন্যাস-লেখকগণ জোলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা অবস্থান্তর ঘটিবে।

বেসাণ্ট্ সাহেব সমাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নীচ প্রবৃত্তির আলোচনা সাধারণ ইংরাজসমাজে আদৌ প্রচলিত নাই। তিনি বলেন—প্রায় প্রত্যেক পুরুষের জীবনে এমন একটি পরিচ্ছেদ আছে যাহা সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সাধারণ্যে প্রকাশ করে না। এই পরিচ্ছেদটি বিবাহের পর একেবারে মুড়িয়া রাখা হয় এবং আর কখনও খোলা হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের—বিশেষতঃ একটু উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের জীবনে এরূপ কোনও গোপন পরিচ্ছেদ নাই। ইংলণ্ডের শিক্ষিত স্ত্রীসম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়—এবং এই সম্প্রদায় এখন যথেষ্ট প্রবল ও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর ইংরাজ পুরুষ কখনই প্রায় স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে না এবং বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নীকে সন্দেহ করা ত তাহাদের কল্পনারও অতীত।

শেষের কথাগুলিতে বেসাণ্ট্ সাহেব শিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষ রক্ষা রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু মোটের উপর এ বিষয়ে উপন্যাস-লেখকেরা যাহাতে বাড়াবাড়ি না করেন তাঁহার এইরূপ আবেদন। ধর্ম্মের সহায় হইয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তাহার বিপরীত হয়, যদি তাহার দ্বারা নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে থাকে, যদি উপন্যাসে সভ্য মানব আফ্রিকার অসভ্য অরণ্যবাসীদের তুল্যরূপে অঙ্কিত হয়েন তাহা হইলে সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কি উপকার সাধন হইবে?

দারিদ্র্য ও অপরাধ।

বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা ও অপরাধের সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে, দারিদ্র্যের সহিত অপরাধের কি যোগ তাহা জানা যাইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যদি জানা যায় যে, যেখানে দারিদ্র্যের কষ্ট সেইখানেই অপরাধের বাহুল্য, তাহা হইলেই প্রমাণ হয় যে, দারিদ্র্য ও অপরাধের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

য়ুরোপের চৌর্য্য অপরাধের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:

ইটালি,	১৮৮০—৮৪	প্রতি লক্ষ নিবাসীর হার-অনুসারে চৌর্য্য অপরাধের বাৎসরিক বিচার	১২১
ফ্রান্স,	১৮৭৯—৮৩	ঐ	১২১
বেলজিয়ম,	১৮৭৬—৮০	ঐ	১৪৩
জর্ম্মানি,	১৮৮২—৮৩	ঐ	২৬১
ইংলণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	২২৮
স্কটলণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	৫৮১

আয়রলণ্ড,	১৮৮০—৮৫	ঐ	১০৭
ইটালি,	১৮৭৬—৮০	ঐ	৮২
স্পেন,	১৮৮৩—৮৫	ঐ	৭৩

এক্ষণে দেখা যাউক, এই তালিকা হইতে কি প্রমাণ হয়। ইহা জানা কথা যে, য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশ সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ইংলণ্ডের ধন-সংস্থান ইটালি অপেক্ষা প্রায় ছয় গুণ অধিক; তথাপি, ইটালি অপেক্ষা ইংলণ্ডের চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা অধিক। আয়রলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের ধন-ঐশ্বর্য্য অসংখ্যগুণে অধিক, তথাপি, আয়রলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা অধিক। স্পেন্ য়ুরোপের মধ্যে অত্যন্ত দরিদ্র ও স্কট্‌লণ্ড একটি বেশ ধনশালী দেশ—কিন্তু উহাদের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, স্পেন অপেক্ষা স্কট্‌লণ্ডে চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা প্রায় চারি গুণ অধিক।

ইংলণ্ডের সহিত আয়রলণ্ডের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারণ, প্রায় একই নিয়মানুসারে ঐ উভয় দেশের অপরাধ-তালিকা প্রস্তুত হয়—উভয় দেশের রাজ-নিয়ম সাধারণতঃ প্রায় একই—উভয় দেশেই আইন বলবৎরূপে কার্য্যে পরিণত—উভয় দেশের বিচার কার্য্য প্রায় একরূপে নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং এই উভয় দেশের অপরাধ-তালিকা যেরূপ তুলনার যোগ্য এরূপ আর কোথাও সম্ভব নহে। এক্ষণে উল্লিখিত তালিকাটি মিলাইয়া দেখ, দেখিবে, আয়রলণ্ড যদিও এত গরিব তবু তথাকার চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও কম। আবার ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডের অপরাধ সংখ্যা পাঁচ ছয় গুণ

অধিক। দারিদ্র্য হইতেই অপরাধের উৎপত্তি একথা যদি মানা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অপরাধ বিষয়ে অগ্রণী হইবার কথা; যেহেতু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশ অতি অল্পই আছে। কিন্তু আসলে কি দেখা যায়?—ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় আইন-ভীরু জাতি আর একটি আছে কি না সন্দেহ। যদি বল, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে তুলনাই হইতে পারে না, কারণ তাহাদের মধ্যে আচার ব্যবহার ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ—আমাদের বক্তব্য তো তাহাই—অর্থাৎ, শুধু দারিদ্র্যের উপর অপরাধের ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে না।

ইহার আর একটি বলবৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের কয়েদী-তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, শীতকালে, যখন গরিবদের কষ্টের আর সীমা থাকে না, সেই সময়েই অপরাধ-সংখ্যা কম, আর, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যখন কাজকর্ম্মের খুব সুবিধা সেই সময়েই অপরাধের আধিক্য। অতএব দেখা যাইতেছে, দেশের ভৌতিক সম্পদে অপরাধ-প্রবণতা তিরোহিত হয় না—ভৌতিক উন্নতি হইতে যেমন কতকগুলি সুফল, তেমনি কতকগুলি কুফলও উৎপন্ন হয়। ভৌতিক উন্নতি হইতে অনেক সময়ে নৈতিক অবনতি উৎপন্ন হয়—লাম্পট্য, পান-দোষ, আলস্য, বিলাসিতা ইহার অপরিহার্য্য সহচর। নৈতিক উন্নতি না হইলে শুধু ভৌতিক উন্নতিতে কোনও জাতির প্রকৃত মঙ্গল নাই। মসিয়ো ডে লাভ্‌সে বলেন, "মনুষ্যের শরীর মন হৃদয়ের সমগ্র উন্নতিতেই মনুষ্যের পূর্ণতা—পারিবারিক স্নেহ-মমতা, মানব-প্রেম, এবং সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য ও রচনা-সৌন্দর্য্য সম্ভোগে অনুরাগ ইহাই হৃদয়ের উন্নতির বিষয়" এই মহান আদর্শের দিকে মানব যে পরিমাণে

[illegible]

[illegible] ইহাই আমার [illegible] হইতে [illegible]। প্রোতিত [illegible]-ঐশ্বর্য্য যদি এই উদ্দেশ্য [illegible] তবেই [illegible] হইতে [illegible] [illegible] ইহাই [illegible] মূল হইয়া উঠে।

প্রেমের কথা।

[illegible] কোন ইংরাজি লেখক বলিয়াছেন যে, আরবদের [illegible] কোন প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, আর সেই [illegible] তাহাদের নিকটবর্ত্তী এদেশে 'প্রাটিট্যুড্' জিনিষটাই নাই, তাহারা বোধ হয় বঙ্গভাষায় [illegible] শব্দ [illegible] নাই। যা হোক্ যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, যে দেশে যে [illegible] সে জিনিষও নাই। যুক্তিটা সব সময়ে [illegible] ভাষায় প্যারাডক্স্ শব্দের প্রতিশব্দ না পাওয়া [illegible] জিনিষটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। [illegible] করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা কথার মারপেঁচে বিষয়টা উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

[illegible] সাহেবের সাহিত্যগ্রন্থে প্রাচীন [illegible] যে [illegible] দেখান হইয়াছিল, তাহাতে [illegible] [illegible] ইত্যাদি [illegible] [illegible] হইল যে [illegible] নাই; সুতরাং [illegible] [illegible] নাই। [illegible]

তর্কের বাহাদুরী আছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে যে, কিল্‌কেনির বিড়ালে এমন যুদ্ধ করে যে, দুই বিড়ালের লেজগুলির যে, তাহাদের লাঙ্গুল ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের শূন্যবাদীর কথাগুলি আপনা-আপনির মধ্যে কাটা-কাটি করিয়া কিছুই বাকী রাখে না। কিলকেনির বিড়ালদের তবু লাঙ্গুলগুলো উদ্বৃত্ত থাকে।

এইপ্রকার কথার ভেল্কি যে খালি আমাদেরই এক বিশেষত্ব তা" নয়। প্রাচীন হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট পূর্ব্বোক্ত তর্কটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কি গ্রীকরা হিন্দুদের নিকট এ বিষয়ে ঋণী, ইহা নির্ণয় করা কঠিন। গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে শূন্যবাদীর গমনাগমনাগমন যুক্তিটি অন্য আকারে পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক জেনো তর্ক করিতেন যে গতি অসম্ভব; কেন না, কোন বস্তু, হয়, যে স্থানে আছে সেই স্থানেই আছে, নয়, যে স্থানে নাই সেই স্থানে আছে। যে স্থানে আছে সে স্থানে থাকিলে গতি হইল না। আর যে স্থানে নাই সে স্থানে ত থাকিতেই পারে না। অতএব গতি অসম্ভব।

গতি সম্বন্ধে জেনোর আর একটি তর্ক ছিল। মনে কর, কোন লোক ঘণ্টায় এক মাইল চলিতে পারে, এবং আর এক ব্যক্তি ঘণ্টায় দশ মাইল চলে। মনে কর যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা দশ মাইল অগ্রসর হইয়া আছে। দুই জনেই এক সময়ে চলিতে আরম্ভ করিল। দ্রুতগামী দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণে দশ মাইল গেল, মন্দগামী অগ্রবর্ত্তী প্রথম ব্যক্তি ততক্ষণে এক মাইল গিয়াছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা সে এক মাইল অগ্রে রহিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণে এই এক

মাইল গেল, প্রথম ব্যক্তি ততক্ষণে আরও এক মাইলের দশমাংশে উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণে এই এক মাইলের দশমাংশে পৌঁছিল, প্রথম ব্যক্তি ততক্ষণে আরও এক মাইলের শতাংশ গিয়াছে। ইত্যাদিক্রমে দ্বিতীয় ব্যক্তি যতই অগ্রসর হয়, প্রথম ব্যক্তি আরও অগ্রবর্ত্তী থাকে। উভয়ের ব্যবধান অনন্তকাল দশমাংশ করিয়া হ্রাস হইতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ লোপ হয় না। অতএব এ যুক্তিমতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কখনও প্রথম ব্যক্তিকে ধরিতে পারে না অথবা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। অথচ প্রকৃত পক্ষে দুই ঘণ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন কুড়ি মাইল উত্তীর্ণ হইয়াছে, প্রথম ব্যক্তি তখন দুই মাইল মাত্র চলিয়াছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে আট মাইল ছাড়াইয়া গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টনের নিকট জেনোর এই তর্ক অকাট্য মনে হইত। তবে তাঁহার মতে সত্যের ধারণা মাত্রেরই মধ্যে একটি আত্মখণ্ডন আছে। তিনি এই আত্মখণ্ডনের অনেকগুলি উদাহরণ দিতেন। যথা—

(১) সসীমের মধ্যে অসীম থাকিতে পারে না। অথচ বস্তু মাত্রেরই বিভাগের সীমা নাই। অতএব অসীম সসীমের অন্তর্গত রহিয়াছে—ইহা একটি আত্মখণ্ডন।

(২) অসীমের আদি অন্ত নাই। অথচ সমগ্র অতীতকাল অসীম হইলেও এই মুহূর্ত্তে তাহার অন্ত। এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ অসীম হইলেও এই মুহূর্ত্তে তাহার আরম্ভ। অতএব অসীমের সীমা দেখা যায়, ইহাও একটি আত্মখণ্ডন।

প্রাচীন হিন্দুদের কিন্তু একটি বড় গুণ ছিল। একটা তর্ক

একবার সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে, তাহার দৌড় যতদূরই হোক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত যাইতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। গমনাগমনাগতাগত এক তর্ক আরম্ভ করিয়া দাঁড়াইল যে কিছুই নাই। তাহাই সই। কিছুই যে নাই তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কি করিব? তর্কে দাঁড়াইল যে কিছুই নাই, এখন কিছুই নাই না বলিলে চলিবে কেন? প্রাচীন হিন্দুরা সত্য সত্যই "লজিকাল" ছিলেন।

এই লজিকাল প্রবৃত্তির ফল আমরা হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে পদে পদে দেখিতে পাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এই যে, পৃথিবীর সমস্তই মায়া, আমাদের সুখ দুঃখ সমস্তই মায়া, সামাজিক পারিবারিক সম্বন্ধ সবই মায়া; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদির সহিত ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতিবন্ধন সমস্তই মায়াবন্ধন মাত্র। যতদিন আমরা মায়াপাশে আবদ্ধ, ততদিন আমাদের মুক্তি নাই। এই সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করাই মুক্তির একমাত্র উপায়। অতএব, হে ধর্ম্মপথাবলম্বি, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও।

কথাগুলি শুনিতে খুব জাঁকালো বটে। পৃথিবীর সমস্তই মায়া, মায়া-সংস্কার ত্যাগ না করিলে মুক্তি নাই, মায়া কাটাইতে পারিলেই আমরা ব্রহ্মে লীন হইব, কথাগুলো বড়রকমের শোনায় বটে। একদল আধুনিক হিন্দু এই 'বিরাট' কল্পনা লইয়া নিতান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এই মায়াতত্ত্বের লজিকাল ফল কি তা' বোধ হয় আধুনিক হিন্দু ভাবিয়া দেখেন না।

প্রাচীন হিন্দু, কিন্তু, কথাগুলি বেশ ভালরকম করিয়াই বুঝিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কারগুলি ত্যাগ করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। কতকগুলি সংস্কার এত বদ্ধমূল যে, সেগুলি ত্যাগ করা একান্তই দুষ্কর। পারিবারিক পবিত্র সম্বন্ধসকল দার্শনিক মায়া-সংস্কার বলিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে সকল সম্বন্ধের পবিত্র ভাব মন হইতে দূর করা প্রায় অসম্ভব; সে সকল সম্বন্ধের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ কল্পনা করিতেও বীভৎস মনে হয়। পারিবারিক পবিত্র সম্বন্ধ দূরে থাক্, এমন কি খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল যে, যে সকল দ্রব্য আমরা অখাদ্য বলিয়া জ্ঞান করি, সে সকল দ্রব্য আহার করিবার কল্পনাতেও আমাদের একান্ত ঘৃণা উপস্থিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুদের লজিকাল বুদ্ধি সহজেই বুঝিতে পারিল যে, এপ্রকার বদ্ধমূল দৃঢ় সংস্কার দূর করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বন্ধনগুলি এত দৃঢ় যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ইহা একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া না ফেলিলে উপায় নাই। খাদ্য অখাদ্য ইত্যাদি সংস্কার দূর করিতে হইলে খাদ্য অখাদ্য সমভাবে আহার অভ্যাস করিতে হয়; এমন কি, বরং অখাদ্য সম্বন্ধে ঘৃণা একেবারে দূর করিতে হইলে অখাদ্যটাই নিত্য সেবন করা একমাত্র উপায় হইয়া উঠে। পারিবারিক সম্বন্ধের পবিত্র ভাবকে সংস্কার জ্ঞান করিয়া সেই সংস্কার একেবারে দূর করিতে হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পবিত্রতাকে কলুষিত করা, ও কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত করিয়া পদ-তলে দলন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এ সকল সংস্কার কি সহজে দূর করা যায়? পবিত্র অপবিত্রে ভেদ নাই, অতএব

পবিত্রকে অপবিত্র করিয়া পবিত্র অপবিত্র সংস্কার হইতে মুক্তি পাও, ইহা তন্ত্রের একটি শিক্ষা।

বৌদ্ধদেরও ঠিক হিন্দুদের ন্যায় তন্ত্র আছে। তাহাদেরও এই একই শিক্ষা। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, মূল কথাটা যদি সত্য হয়, সবই যদি যথার্থই মায়া হয়, আর এই মায়াবন্ধন ছিন্ন করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তান্ত্রিক শিক্ষাটা যৌক্তিক বটে। মানুষের মন হইতে সংস্কার দূর করা সহজ ব্যাপার নয়। যদি সংস্কার ছাড়ানই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তন্ত্রের বীভৎস অনুষ্ঠানগুলিই একমাত্র উপায়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আবশ্যক। সংস্কার যে পরিমাণে বদ্ধমূল, তার উপর অত্যাচারও সেই পরিমাণে আবশ্যক, নহিলে সংস্কার নির্ম্মূল করা যায় না। তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলিতে যদি সংস্কার নির্ম্মূল না হয়, তাহা হইলে আর কিছুতে হইবার যো নাই, আর তার চেয়ে কমে হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অল্প দিন হইল আমি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কোন পুস্তকে কতকগুলি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ পড়িতেছিলাম। এ তন্ত্র বৌদ্ধদের। সে অনুষ্ঠানগুলা যে কি ভয়ানক বীভৎস তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া জানি—আমাদের পবিত্রতম পারিবারিক সম্বন্ধসকলের উপর একান্ত ব্যভিচার হচ্ছে সেই তন্ত্রের অনুষ্ঠান। এবিষয়ে ইঙ্গিতেও উল্লেখ করিতে যার পর নাই ঘৃণার উদ্রেক হয়।

তবে যুক্তি অনুসারে আপত্তি করিবার যো নাই। কুৎসিৎ

অথবা ঘৃণাজনক বলিলে, তান্ত্রিক উত্তর করিবে "যদি মায়াই হয়, যদি এ সকল কেবল সংস্কারমাত্রই হয়, আর যদি সংস্কার দূর করা ও মায়াবন্ধন উন্মোচন করাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হয়, তবে এ সকল অনুষ্ঠানে আপত্তিই বা কি? আর ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ই বা কি? অন্য উপায় থাকিলেও এই 'বীভৎস' উপায় অবলম্বনে দোষ কি? তুমি যদি কোন বিশেষ কার্য্যকে 'বীভৎস' বল, তাহা হইলে তোমার এখনও সংস্কার যায় নাই, তুমি এখনও মায়াবদ্ধ; তোমার পক্ষেই বরং এই সকল 'বীভৎস' অনুষ্ঠান আরও বেশী আবশ্যক।" আমরা যদি মূল কথাটা মানিয়া লই, তাহা হইলে এ যুক্তির উত্তরে আমাদের কথা কহিবার যো নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা "বিরাট লয়তত্ত্ব" হিন্দুমাত্রেরই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পৈশাচিক অনুষ্ঠানগুলা কিরূপ মনে হয়? তাঁহারা বোধ হয় এই লজিকাল পরিণাম ভাবিয়া দেখেন নাই। যদি ভাবিয়া দেখা সত্ত্বেও লয়তত্ত্ব আশ্রয় করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তবে বলিতে হয়—যিনি ইচ্ছা মুক্তি লাভ করুন, আমরা মায়াপাশেই বদ্ধ হইয়া থাকি। লয়প্রাপ্তির জন্য আমাদের তিলমাত্র তাড়া নাই।

সমালোচনা।

অশোকচরিত। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।

এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোন বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে

যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে, অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি "ফাউ"স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। "ফাউ"টিও ফেলার সামগ্রী নহে—উহাতেও একটু বেশ রস আছে।

পঞ্চামৃত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।

এই গ্রন্থে আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের যে সকল কল্যাণপ্রদ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বাছা বাছা রত্ন। এই গ্রন্থখানি কবিরত্ন মহাশয় অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি ত সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেনই; কিন্তু জনসমাজে এক জন যদি শারীরিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হয়, তবে তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত। শেষোক্ত ব্যাধির ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা শুভানুধ্যায়ী দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু ব্যক্তিদিগের অমৃতময় আশ্বাসবাণী এবং উপদেশ। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শেষোক্তরূপ মহৌষধ স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। এই জন্য কবিরত্ন মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ জয়যুক্ত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাধনা।

বাঙ্গলা লেখক।

লেখকদিগের মনে যতই অভিমান থাক্, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, আমাদের দেশে পাঠক-সংখ্যা অতি যৎ-সামান্য। এবং তাহার মধ্যে এমন পাঠক "কোটিকে গুটিক" মেলে কি না সন্দেহ, যাঁহারা কোন প্রবন্ধ পড়িয়া, কোন সুযুক্তি শুনিয়া আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্ত্তন সাধন করেন। নির্জ্জীব নিঃস্বত্ব লোকের পক্ষে সুবিধাই একমাত্র কর্ণধার, সে কর্ণের প্রতি আর কাহারো কোন অধিকার নাই।

পাঠকের এই অচল অসাড়তা লেখকের লেখার উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করে। লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালবাসেন। সুবিজ্ঞ গুরু, হিতৈষী বন্ধু, অথবা জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেল্কী খেলাইতে থাকেন।

এখন দাঁড়াইয়াছে এই—যে যার আপন আপন সুবিধার সুখ-শয্যায় শয়ান, লেখকদিগের কার্য্য, স্ব স্ব দলের বৈতালিক বৃত্তি করিয়া সুমিষ্ট স্তবগানে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া দেওয়া।

মাঝে মাঝে দুই দলের লেখক রঙ্গভূমিতে নামিয়া লড়াই করিয়া

থাকেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের যত কৌশল দেখাইতে পারেন ততই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট বাহবা লাভ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যান।

লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনবৃত্তি আর কিছু হইতে পারে না। এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং যাদুকরের কাজ করিয়া আমরা সমস্ত সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়া দিই।

মানুষ যেমন চরিত্রবলে অনেক দুরূহ কাজ করে, অনেক অসাধ্য সাধন করে, যাহাকে কোন যুক্তি, কোন শক্তির দ্বারা বশ করা যায় না তাহাকেও চরিত্রের দ্বারা চালিত করে, এবং দীপ-স্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় সংসারের অনির্দ্দিষ্ট পথের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুব নির্দ্দেশ প্রদর্শন করে—সাহিত্যেরও সেইরূপ একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র, কৌশল নহে, তার্কিকতা নহে, আস্ফালন নহে, দলাদলির জয়গান নহে, তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক, নিশ্চল জ্যোতির্ম্ময় সত্যের দীপ্তি।

আমাদের দেশে পাঠক নাই, ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে, কোন-কিছুতে কাহারো বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই; এরূপ স্থলে লেখক-দের অনেক কথাই অরণ্যে ক্রন্দন হইবে এবং অনেক সময়েই আদরের অপেক্ষা অপমান বেশী মিলিবে।

এক হিসাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখ-কের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোন যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা

বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালীর নিকটে বাঙ্গলা লেখার, এমন কি, লেখামাত্রেরই এমন কোন কার্য্যকারিতা নাই, যে জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে, বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেই জন্য যে-সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্য্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবলমাত্র সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বহস্তে জীবন গঠিত করে, সুন্দর কাব্যে, প্রবল বাগ্মিতায়, সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এই জন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্ব্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোন আলস্য নাই। লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জ্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা, যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে, তবে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। ভাবে, নবর

নষ্ট করিয়া এত বড় একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কি এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া! তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ, সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্ত্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোন লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে, সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে, সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহুদর্শন থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা, সযত্নে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও যা, অযত্নে রোখের মাথায় কথা বলিলেও তা—এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়, সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়। চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন দেখিতে হইবে, বহু যত্ন, বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে; গুণ এবং দোষ, নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে; যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল, সে আশ্বাস প্রতিপদে ক্ষীণ হইতেছে অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

আমি বঙ্গদেশের হতভাগ্য লেখক-সম্প্রদায়ের হইয়া ক্রন্দন-

গীত গাহিতে বসি নাই। বিলাতের লেখকদের মত আমাদের বহি বিক্রয় হয় না, আমাদের লেখা লোকে আদর করিয়া পড়ে না বলিয়া অভিমান করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, অভিমানের অশ্রুধারায় কঠিন পাঠকজাতির হৃদয় বিগলিত হয় না। আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

আমরা অনেকসময় অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞানতঃ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই। যখন দেখি সত্য বলিয়া আশু কোন ফল পাই না এবং প্রায়ই অনেকের অপ্রিয় হইতে হয়, তখন, অলক্ষিতে আমাদের অন্তঃকরণ সেই দুরূহ কর্ত্তব্যভার স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া নটের বেশ ধারণ করে। পাঠকদিগকে সত্যে বিশ্বাস করাইবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাতুরীতে চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিলাষ জন্মে। ইহাতে কেবল অন্যকে চমৎকৃত করা হয় না, নিজেকেও চমৎকৃত করা হয়; নিজেও চাতুরীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

একটা কথাকে যতক্ষণ না কাজে খাটানো হয়, ততক্ষণ তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ততক্ষণ তাহাকে ঘরে বসিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জনা করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তোলা যায়—ততক্ষণ এ পক্ষেও বিস্তর কথা বলা যায়, ও পক্ষেও কথার অভাব হয় না। আমাদের দেশে সেই কারণে অতিসূক্ষ্ম কথার এত প্রাদুর্ভাব। কারণ, কথা কথাতেই থাকিয়া যায়, তর্ক ক্রমে তর্কের সংঘর্ষণে উত্তরোত্তর শাণিতই হইতে থাকে, এবং সমস্ত কথাই বাষ্পাকারে এমন একটা লোকাতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানকার কোন মীমাংসাই ইহলোক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থসকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন। পাঠকেরা কেবল নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে আসিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহকার্য্য করিবেন না, তাহাকে রীতিমত আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করাও দুঃসাধ্য, সুতরাং সে যে প্রতিদিন মেঘের মত নব নব বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অলস লোকের অবসরযাপনের সহায় তা করিতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বাষ্প-গঠিত মেঘে কি মাঝে মাঝে সত্যকে ম্লান করিতেছে না? উদাহরণস্বরূপে কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "কড়াক্রান্তি" প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিৎ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন, সে কি কেবলমাত্র কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসঙ্কোচ স্পর্দ্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই? অন্য কোন দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ ঔদার্য্য তর্ক-চাতুরী সহ্য করিত?

আমরা সহ্য করি কেন? কারণ, আমাদের দেশে যে যেমন ইচ্ছা চিন্তা করুক, যে যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যে যেমন ইচ্ছা রচনা করুক, আমাদের কাজের সহিত তাহার যোগ নাই। অতএব আমরা অবিচলিতভাবে সকল কথাই শুনিয়া যাইতে পারি—তুমিও যেমন, উহাতে কাহার কি যায় আসে!

কিন্তু কেন কাহারও কিছু যায় আসে না! আমাদের সাহি-

ত্যের মধ্যে চরিত্রবল নাই বলিয়া। যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই, তাহা কখনো অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

একদিকে যেমন আমাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না, অন্য দিকে তেমনি আমাদের নিজের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষপাত হইলে গায়ে অত্যন্ত বাজে। ঘরের আদর অত্যন্ত অধিক পাইলে এই দশা হয়। নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।

সেটা নিজের সম্বন্ধে যেমন, স্বদেশের সম্বন্ধেও তেমনিই। আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ, আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিম্বা কঠিন কর্ত্তব্যপালন তাহার নাম নাই—কেবল আহা উহু, কেবল কোলে কোলে নাচান। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়, অমনি তাহার মাতৃ-স্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যানী মহা হাঁকডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মোচন করিয়া তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।

আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙ্গালীর আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিত ভাবে প্রিয়বাক্যও বলি অপ্রিয় বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্য-গদ্গদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসঙ্গত। আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভাল জিনিষগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি, যে, তাহাতে ভাল জিনিষের অমর্য্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল কবির সেরা, মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ, হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে—এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস, মনুসংহিতা এবং হিন্দু-সমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে যোড়করে বলিতেন "তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড় করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না! বাপুরে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্ব্বক, একটু সংযতভাবে কথা বল! পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই ভালও থাকে মন্দও থাকে—তোমরা যতই কূটতর্ক কর না, অসম্পূর্ণতা হো হা দ্বারা ঢাকা পড়ে না! যাহার যথেষ্ট ভাল আছে, তাহার অল্পস্বল্প মন্দর জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না, সে ভাল মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসঙ্কোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্পস্বল্প ভাল, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েন্ট্ ধরিয়া ওকালতি কর। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না, অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না—তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন্ শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশী! কিন্তু ঐ কলঙ্কের

অন্য বাজে কৈফিয়ৎ দিতে গেলেই কিম্বা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।”

শিক্ষা-প্রণালী।

আমাদের ‘শিক্ষিত’ যুবকদের মধ্যে শিক্ষার যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, ততটা যে দেখা যায় না, বরং অনেকটা উল্টাই দেখা যায়, এ বিষয়ে যদি আমার সহিত কাহারও মতভেদ হয়, তাহা হইলে আগে থাকিতেই বলিয়া রাখি, আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নয়। তবে যদি কেহ বলেন যে, কুফলটা আমাদের মস্তিষ্কেরই দোষ, শিক্ষা-প্রণালীকে সে জন্য দায়ী করা যাইতে পারে না, তা’ হইলে, বোধ হয়, শিক্ষা-প্রণালীর গুরুতর ত্রুটি যে আছে, এই কথা প্রমাণ করিতে পারিলেই, তাঁহারা আমাদের মস্তিষ্ককে বেকসুর খালাস না দিন, নিদেন শিক্ষা-প্রণালীকে সমদোষী সাব্যস্ত করিবেন।

আমাদের স্কুলের ছাত্রদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং সে প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতিসাধন সম্ভব কি না, ইহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা, এবং দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তি চালনা করিবার ক্ষমতা চর্চ্চা করা। যে শিক্ষায় দুই উদ্দেশ্যই সাধন হয়, সেই শিক্ষাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে এক উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইলেও শিক্ষাটাকে চলনসই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুইটার মধ্যে

কোন উদ্দেশ্যই সফল না হইলে সে শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে বোধ হয় তর্কের আবশ্যক নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীতে না হয় যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানসঞ্চয়, না হয় মনোবৃত্তি চর্চ্চা। দেবায় এবং ধর্ম্মায় নাই হোক্, চলনসই রকম কেরাণীগিরি ছাড়া সে শিক্ষা আর কোন কাজে লাগাইতে হইলে অসাধারণ বুদ্ধির আবশ্যক। এই শিক্ষা সত্ত্বেও যে আমাদের মধ্যে প্রতিভাশালী লোক পাওয়া যায়, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়।

কালেজের শিক্ষার কথা এখন আমি বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। কালেজে পাঠ করিবার বয়সে শিক্ষাটা অনেকটা আমাদের নিজের উপর নির্ভর করা উচিত, আর সেই নিজেকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা অনেকটা আমাদের প্রথম শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শৈশবাবস্থায় আমরা সকল বিষয়েই অন্যের হস্তে, তখন অন্যে আমাদের শরীর মন যে প্রকারে গড়িয়া তুলেন তাহারই ফল আমাদিগকে চিরজীবন ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য বাল্যশিক্ষাই আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কি রকম করিয়া A B C পড়াইতে হইবে, কি রকম করিয়া ক খ পড়াইতে হইবে, এসব কথা যেন কেহ তুচ্ছ বিবেচনা না করেন। এই A B C পড়া এবং ক খ শিক্ষা করাই আমাদের জীবনের ভিত্তি; এই ভিত্তির দৃঢ়তার উপর, পরে অট্টালিকা হইবে কি কুঁড়ে ঘর হইবে, নির্ভর করে।

কোন কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় অবলম্বন করাই সাধারণ নিয়ম। নিতান্ত নির্ব্বোধ অশিক্ষিত মূর্খকেও সোজা পথ ছাড়িয়া বিনা কারণে বাঁকা পথ ধরিতে দেখিলে তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ঘোর আশঙ্কা উপ-

স্থিত হইবার কথা। অথচ আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে প্রণালী প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে, যেন উদ্দেশ্যসাধনের সহজ পথ ধরিয়া চলাটা তাঁহারা নীতি কিম্বা যুক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞান করেন।

দেখা যাক্, জ্ঞানসঞ্চয় ও মনোবৃত্তি চর্চ্চা শিক্ষার এই দুই উদ্দেশ্যমধ্যে আমাদের উপস্থিত প্রণালী দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্যটি ভালরূপে সম্পাদিত হয়।

ইংরাজী স্কুলে ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা, এই কয়টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণীতে অতি অল্প পরিমাণে বাঙ্গলা পড়ান হয়; এত অল্প যে, সে নামমাত্র। যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিলে জ্ঞানলাভও হয় বটে, এবং মনের উৎকর্ষসাধনও হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়গুলি সত্যসত্যই শিখান দরকার। শিখাইবার ভান করিয়া পাখী পড়াইবার মতন করিলে কোন লাভ নাই। জ্যামিতির সত্যগুলি জানা যতদূর আবশ্যক, তদপেক্ষা এই সত্যগুলি আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তে আনিবার প্রয়াসে যে মানসিক অনুশীলন হয় তাহা আমাদের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে বেশী আবশ্যক। আমরা স্কুল ও কালেজ ছাড়িবার পর জ্যামিতির অনেক সত্য ভুলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু ভাল করিয়া জ্যামিতি শিক্ষা করিলে যে মানসিক অনুশীলন হয় তদ্দ্বারা আমাদের মন যদি যুক্তি ধারণা করিবার ক্ষমতালাভ না করে তাহা হইলে সে শিক্ষাই নিষ্ফল। ত্রিভুজের দুই কোণ সমান হইলে তাহার দুই বাহু সমান হইবে এ সত্যটি না জানিলেও পৃথিবীর অনেক কাজ চালাইতে

পারা যায়, কিন্তু এই সত্যটি ও ইহার প্রমাণ ধারণা করিবার জন্য যে মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক তাহা লাভ করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সত্য ও যুক্তি ধারণা করিবার এই ক্ষমতার চর্চ্চা হইলেই মনকে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা চর্চ্চা করিবার নিমিত্ত যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক। আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা বোঝা আবশ্যক। অতএব যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার ও আয়ত্ত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়াই উৎকৃষ্ট শিক্ষা-প্রণালীর উচিত উদ্দেশ্য।

কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সুবিধা করিয়া দেওয়া দূরে থাক্, বরং যতদূর সম্ভব অসুবিধা ঘটাইবারই বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়। ভূগোল, ইতিহাস, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি যে স্বভাবতঃ আপনা হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে তা' নয়। বরং সে জন্য বিশেষ প্রয়াসেরই আবশ্যক। কিন্তু এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার কি প্রণালী অবলম্বিত হয়? না, যে ভাষা নিতান্ত বিজাতীয়, যে ভাষায় বিন্দুবিসর্গমাত্র দখল নাই, সেই ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। মনে কর, কোন লোককে কোন বস্তুর আকৃতি পরিস্ফুটরূপে দেখান আবশ্যক, সে স্থলে তাহার চোখে কালো ঝাপ্‌সা চস্‌মা আঁটিয়া দেওয়া কিম্বা কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া সেই বস্তু দেখান যে ঠিক্ যুক্তিসঙ্গত নয় এ কথা আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি। অথচ আমরা জ্যামিতির সত্য ও যুক্তিগুলিকে অপরিচিত বিজাতীয় ভাষা-কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া দেখানকে জ্যামিতি শিখাইবার উচিত উপায় মনে করি। "বি-এল্-এ ব্লে, বি-এল্-ই ব্লি" শেষ

হাস একদিনে এক পৃষ্ঠা, ইত্যাদি। সমস্ত বিষয়গুলি ছেলেরা বাড়ি থেকে মুখস্থ করিয়া আনে, ক্লাসে আসিয়া সেগুলি বসিয়া বসিয়া লিখে। স্কুলটা খালি প্রাত্যহিক পরীক্ষার জন্য—যতটুকু শিক্ষা হয় তা' বাড়িতে। এমন কি, প্রাইভেট্ টিচার না রাখিলে, কিম্বা অন্যের খোসামোদী করিয়া পড়া না বুঝাইয়া লইলে স্কুলের পড়া প্রস্তুত করা ছেলেদের পক্ষে অসাধ্য। স্কুলের মাষ্টারেরা ভাল করিয়া পড়া বুঝাইয়া দেন না, আর বুঝাইবার সময়ও পান না। মনে কর, ইতিহাস পড়ান হইতেছে, ইতিহাসের বিষয়টিমাত্র ছেলেরা বুঝিলে ও আয়ত্ত করিলে চলিবে না, কেননা পরীক্ষায় ইংরাজীতে উত্তর লিখিতে হইবে। কাজেই স্কুলের প্রথম লক্ষ্য হয় কিসে চট্‌পট্ ইংরাজীতে উত্তর লেখার অভ্যাস হয়। সুতরাং প্রত্যহ ক্লাসে ইংরাজীতে ইতিহাস লেখান অভ্যাস করাইতে হয়। যদি ইংরাজী ভাষাটার উপর খুব দখল থাকিত, তা' হইলে কোনই গোলমাল হইত না। কিন্তু এদিকে ইংরাজী ভাষাটি একেবারেই অপরিচিত, আর ওদিকে ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষা করিয়া সেই ভাষাতেই লিখিতে হইবে। মুখস্থ করিয়া লেখা ছাড়া আর কোন উপায় নাই; আর অপরিচিত ভাষায় ইতিহাস কথায় কথায় মুখস্থ করাও বড় সহজ কার্য্য নহে। দিনে এক পৃষ্ঠার বেশী যে পড়া হয় না তাহা আশ্চর্য্য নহে। এক মাসে যে ইতিহাস শিক্ষা হইতে পারিত, তাহা দুই তিন বৎসরেও হয় না। জ্যামিতি, ভূগোল ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক্ এই একই কথা খাটে। এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার জন্য যে পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পক্ষে যত পরিশ্রম করা আবশ্যক তদপেক্ষা শতগুণ বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। আর এই পরিশ্রম শুদ্ধমাত্র তোতা পাখীর মতন মুখস্থ করিতেই ব্যয় হয়। বস্তুতঃ

মুখস্থ করা যে স্থলে অপরিহার্য্য, সে স্থলে মুখস্থর উপর বুঝিবার চেষ্টা করা ছেলেদের এবং মাষ্টারদের নিকট অনর্থক পরিশ্রম বলিয়া মনে হইতে পারে। নিদান পক্ষে প্রত্যহ এই মুখস্থ করা আর লেখাতে এত সময় দিতে হয় যে, বুঝিবার কিম্বা বোঝাইবার সময় থাকে না। স্কুলের মাষ্টারেরাই বা কি করিবে? পরীক্ষা পাস করান ত চাই, পরীক্ষা পাস করাইতে না পারিলে সে স্কুলের বেশী দিন টিঁকিবার সম্ভাবনা নাই।

ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা করা। তাহা হইলে মুখস্থ করিবার প্রয়োজন থাকে না, আর বিষয়গুলি যথার্থ শিক্ষা দিবার দিকে মনোযোগ দিতে পারা যায়। শিক্ষাটাও আজকাল যেরূপ হইতেছে তাহা অপেক্ষা এতদূর সহজ হইয়া আসে যে, হতভাগ্য বালকেরা এখনকার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষালাভ করিয়াও প্রচুর পরিমাণে খেলা করিবার সময় পাইতে পারে।

ইংরাজেরা যে মধ্যে মধ্যে এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে "অর্দ্ধশিক্ষিত" বলিয়া উপেক্ষা করে, কথাটা আমাদের গায়ে লাগিতে পারে বটে, কিন্তু নিতান্ত যে অমূলক তা' নয়। ইংলণ্ডে স্কুলেও যেটুকু শিক্ষা হয় সেটুকু সত্যসত্যই শিক্ষা হয়, আমাদের দেশে শিক্ষা যতটুকু হয়, পণ্ডশ্রম তদপেক্ষা শতগুণ বেশী হয়।

আমার কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন—"কথাটা নিতান্ত অযথার্থ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আজকালকার বাজারে ইংরাজীটি না জানিলে কাজ চলে না, আর উপস্থিত প্রণালীতে আর কিছু হোক্ বা না হোক্, ইংরাজীটি নিদান পক্ষে ভাল শিক্ষা হয়।" উপস্থিত প্রণালীতে যে ইংরাজী শিক্ষা

ভাল হয় সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। আমাদের ইংরাজী শিখাইবার প্রণালীতে কতকগুলি বাঁধা বই মুখস্থ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না। দু' একটি টেক্সট্‌বুক পড়ান হয়, কতকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ মুখস্থ হয়, তা' ছাড়া ভাষায় জ্ঞান-লাভ বিন্দুমাত্রও হয় না। এণ্ট্রান্স্-পাস্-করা ছেলে কি ইংরাজী লিখিতে কিম্বা বলিতে কিম্বা বুঝিতে পারে? কেমন করিয়াই বা হইবে? যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা করা হয় তাহাতে প্রতিশব্দ মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছুই চলে না। আর তা' ছাড়া, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদিতে এত সময় অপব্যয় হয় (যাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি) যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য যতটা সময় দেওয়া আবশ্যক ততটা সময় দিতে পারে না। ভাষা শিক্ষা দিতে হইলে ভাষাটা ভাষাস্বরূপে শিক্ষা দেওয়াই ভাল। ভাষা শিক্ষা হইবার অগ্রে সেই ভাষার অন্য কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে, না হয় ভাষাশিক্ষা, না হয় বিষয়শিক্ষা। তা' ছাড়া, প্রথমে কতকটা মানসিক অনুশীলন হইলে ভাষা শিক্ষা করাটাও সহজ হইয়া আসে। থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা দিয়া তৎপরে যদি দুই বৎসর ইংরাজীটা খালি ভাষাস্বরূপে শিখান হয়, তা' হলে আমার বিশ্বাস যে, এখন এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে যতটা ইংরাজী শিক্ষা হয় তদপেক্ষা বেশী হইবারই সম্ভাবনা। যদি নিতান্ত মনে হয় যে, দুই বৎসরে অতটা ইংরাজী শিখান দুষ্কর, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজীটা খালি ভাষাস্বরূপে পড়ান যাইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিবার কিম্বা পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে হয়ত বাঙ্গালায় অনেক বিষয়ে শিক্ষাপুস্তকের ব্যবহার করা ভিন্ন অন্য উপায়

ছিল না। আজকাল কিন্তু সে অভাব নাই; আর যদি বাঙ্গলার শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে, অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাঙ্গলায় শিক্ষাপুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তা' নয়। বরং এক আশ্চর্য্য দেখা যায় যে, বাঙ্গালীতে বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতেছেন—কিন্তু ইংরাজী ভাষায়! যদি বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতেন না?

আর একটি কথা। ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্স্‌ট্‌বুক কেন? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন? টেক্স্‌ট্‌-বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্সট্‌বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও "নোট্‌" মুখস্থ হয়। ভাষা-জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, ছাত্র যে ভাষায় কেমন লিখিতে পারে, বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। টেক্স্‌ট্‌-বুক পরীক্ষায় ইহার কিছুই হয় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী প্রচলিত করেন, আর সেই সঙ্গে যদি টেক্স্‌ট্‌বুক পরীক্ষা করিবার প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দুইটি প্রধান দোষ দূর করা হয়।

ডায়ারি।

(ভূমিকা)

পাঠকেরা যদি "ডায়ারি" শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন; যদি সহসা তাঁহাদের এমন আশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, লোকটা নিশ্চয় সহসা মারা গিয়াছে, এখন তাহার দৈনিক জীবনের গোপন সিন্দুক হইতে তাহার প্রতিদিবসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটন করিয়া রীতিমত ফর্দ্দ করা হইবে, তবে তাঁহারা অত্যন্ত নিরাশ হইবেন। কারণ, আমি এখনো বাঁচিয়া আছি। আমার প্রতিদিনের খসড়া হিসাব এখনো আমার চাবির মধ্যেই আছে।

তবে, ব্যাপারটি কি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক; খুব যে পরিষ্কার হইবে এমন আশাও দেওয়া যায় না।

শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা। ভিতরে পাঁচটার প্রমাণ কি তাহা লইয়া অল্প দিন হইল আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়া গেছে, সে কথা পরে বলিব। বাহিরে পাঁচটা বলিতে কি বুঝায় সে কথা সংক্ষেপে সারিয়া লই।

কোন মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। সামাজিক আদানপ্রদানের নিয়মে এক জন মানুষ, যে, অনেক জন মানুষের দ্বারা গঠিত হয়, এখানে আমি সেই অতি সাধারণ কথার উত্থাপন করিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্ম্মাণ করে। তাহার অসংখ্য

আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তেমন পারদর্শী জরিপ-আমিন থাকিলে একটা মানুষের সীমা ভাঁওরাইয়া নিম্নলিখিতমত চৌহদ্দি স্থির করিয়া দিতে পারেন—

ব্যক্তি শ্রীঅম্বিকাচরণ। উত্তরে শ্রীশ্যামশঙ্কর। দক্ষিণে শ্রীমতী—নাম করিয়া কাজ নাই। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র। পশ্চিমে শ্রীমতী—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া উত্তরপশ্চিম, পূর্ব্বদক্ষিণ প্রভৃতি আরও অনেক কোণ আছে।

উক্ত সীমানার বাহিরে সার্ভে অনুসারে পৃথিবীর অসংখ্য লোকের সহিত অম্বিকার দূরতর এবং নিকটতর সম্পর্ক আছে। কিন্তু দৈবযোগে কেবল শ্যামশঙ্কর, প্রফুল্লচন্দ্র এবং মাননীয়া শ্রীমতী অনামিকারাই অম্বিকাচরণের সহিত সংলগ্নভাবে অবস্থিত। তাঁহাদিগকে বাদ দিলে অম্বিকাচরণের ম্যাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকারের হইত।

যেমন অম্বিকাচরণের, তেমনি আমারও জনকতক লোক আছেন এই মানবজন্মে যাঁহাদিগকে আমি বিশেষরূপে আমারই জ্ঞান করি, যাঁহারা আমার জীবনের অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্বে সম্বদ্ধ হইয়া আমার পরিধির একটি বিশেষ গঠন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচ জনকে লওয়া যাক্। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া

অসম্ভব। বিশেষতঃ ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কি করিয়া?

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি ত আমার সীমা সরহদ্দের তর্ক লইয়া আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। আমার ভূগোলবিবরণ অনেকটা পরিমাণে কাল্পনিক করিয়া তুলিলেও পাঠকদের আপত্তির কারণ হইতে পারে না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম্মশপথ আছে, যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব। মৃত্তিকাকে আদালতে সত্য বলে, কারণ, তাহা কাহারও গঠিত নহে, কিন্তু পাঠক-সভায় মূর্ত্তিকে মৃত্তিকার অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া জানে, যদিও তাহা শিল্পে গড়া। বলা বাহুল্য, অনেক মূর্ত্তিও আছে যাহার মাটির দর।

এখন পঞ্চভূতের পরিচয় দিই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই একটা অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং প্রত্যক্ষভাবে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখেন, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন তাহাকেই সত্য বলিয়া মানেন। তাহার বাহিরেও যদি সত্য থাকে, সে সত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, এবং সে সত্যের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না। তিনি বলেন, যে সকল জ্ঞান অত্যাবশ্যক তাহারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহার উপর আবার সখের সত্য এবং যত সব অনাবশ্যক ভার আহরণ করিয়া আনা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। প্রাচীন-কালে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান এত স্তরে স্তরে জমা হয় নাই, মানু-

বের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল, তখন সৌখীন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর ত সে অবসর নাই। ছোট ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিলে কোন ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়া-দাইয়া আর কোন কর্ম্ম নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, যাহাকে করিয়া-কর্ম্মিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া, উঠিয়া-হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কণ, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন? তাহাকে ও সমস্ত অনাবশ্যক অলঙ্কার দূরে ফেলিয়া দিয়া, কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে প্রতিদিন অলঙ্কার খসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশঃ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।

শ্রীমতী অপ্ (ইঁহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির এ তর্কের কোন রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল ছলছল কলকল করিয়া, সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন—না, না, ও কথা কখনই সত্য না। ও যখন আমার মনে লইতেছে না, তখন ও কখনই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বারবার "না না, নহে নহে"। তাহার সহিত আর কোন যুক্তি নাই কেবল একটি তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অশ্রু-ছল-ছল অনুনয় স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন। না না, নহে নহে। এবং সেই সঙ্গে আদর, যত্ন, স্নেহ এবং নেত্র, বাহু ও সর্ব্বাঙ্গের ভাষা। আমি অনাবশ্যককে ভালবাসি, অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক অনেক সময় আমাদের আর কোন উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জ্জনের স্পৃহা

উদ্রেক করে, পৃথিবীতে সেই ভালবাসার আবশ্যকতা কি নাই? ঘুরিয়া ফিরিয়া কোমলস্বরে কেবলই, "আহা না, না, নহে নহে!" শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয়প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান, কিন্তু কোন যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কি?

শ্রীমতী তেজ (ইহাঁকে দীপ্তি নাম দেওয়া গেল) একেবারে নিষ্কাসিত অসিলতার মত ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে ক্ষিতিকে বলেন, ইস্! তোমরা মনে কর পৃথিবীতে কাজ তোমরা কেবল একলাই কর, এবং সভ্যতা যতই বাড়িতেছে কেবল তোমাদেরই কাজ বাড়িতেছে! আমরা হাঁকডাক মারধোর আস্ফালন করি না বলিয়া কাজ করি না? তোমাদের কাজে যাহা আবশ্যক নাই বলিয়া অনাবশ্যকবোধে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাও, আমাদের কাজে তাহার আবশ্যক থাকিতে পারে। তোমাদের আচারব্যবহার, কথাবার্ত্তা, বিশ্বাস, শিক্ষা এবং শরীর হইতে অলঙ্কারমাত্রই তোমরা ফেলিয়া দিতে চাও, কেন না সভ্যতার ঠেলাঠেলিতে স্থান এবং সময়ের বড় অনটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যে চিরন্তন কাজ, ঐ অলঙ্কারগুলো ফেলিয়া দিলে তাহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত ভাব, কত ভঙ্গী, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্য্য চালাইতে হয়! আমরা মিষ্ট করিয়া হাসি, বিনয় করিয়া বলি, লজ্জা করিয়া কাজ করি, দীর্ঘকাল যত্ন করিয়া যেখানে যেটি পরিলে শোভা পায় সেটি পরি, এই জন্যই তোমাদের মায়ের কাজ, তোমাদের স্ত্রীর কাজ এত সহজে করিতে পারি। যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞানবিজ্ঞান

ছাড়া আর সমস্তই দূর হইয়া যায়, তবে, একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে অনাথ শিশুসন্তানের এবং পুরুষের মত এত বড় অসহায় এবং নির্ব্বোধ জাতির কি দশাটা হয়!

শ্রীযুক্ত বাবু (ইহাঁকে সমীরণ বলা যাক্) প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ক্ষিতির কথা ছাড়িয়া দাও; একটুখানি পিছন হঠিয়া, পাশ ফিরিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া একটা সত্যকে নানা দিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেই উহার মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, যে, বেচারার বহুযত্ননির্ম্মিত পাকা মতগুলি কোনটা বিদীর্ণ, কোনটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কাজেই ও ব্যক্তি অচল অটল হইয়া বসিয়া থাকে। বলে, দেবতা হইতে কীটপর্য্যন্ত সকলি মাটি হইতে উৎপন্ন। কারণ মাটির বাহিরে আর কিছু আছে স্বীকার করিতে গেলে আবার মাটি হইতে অনেকখানি নড়িতে হয়। এই জন্যে উহাকে একটা কথা বুঝানো আমার মত উড়ো লোকের পক্ষে একেবারে অসাধ্য। ও লোকটা স্থির করিয়া বসিয়া আছে, পৃথিবীতে কেবল মানুষ এবং জড় আছে—এই জন্য বিজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এ বিষয়ে উহার সন্দেহ নাই। উহাকে এই কথাটা বুঝানো আবশ্যক যে, মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ। কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশী শেখ না কেন, তাহাতে করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষার কোন সাহায্য করে না। কিন্তু যেগুলি জীবনের অলঙ্কার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে, পরস্পরের পথের কণ্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত

আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, এবং জীবনের প্রসার মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তারিত করে। কিন্তু এ সকল কথা কোন যুক্তি দ্বারা উহাকে বুঝাইতে পারিব না; কেবল যদি তোমরা শ্রীমতী স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি দিনকতক উহার প্রতি একটু বিশেষ মনোযোগ কর, তবে উহার বিস্তর পাকা মত কাঁচাইয়া দিতে পার এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত ব্যোম কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া বলিলেন—হর হর বোম্ বোম্। ঠিক মানুষের কথা যদি বল, যাহা অনাবশ্যক তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যে-কোন-কিছুতে সুবিধা হয়, কাজ চলে, পেট ভরে, মানুষ তাহাকে প্রতিদিন ঘৃণা করে। এই জন্য ভারতের ঋষিরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম একেবারেই উড়াইয়া দিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। বাহিরের কোন কিছুর যে নিতান্ত আবশ্যক আছে ইহাই জীবাত্মার পক্ষে অপমানজনক। সেই অত্যাবশ্যকটাকেই যদি মানব সভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয় এবং তাহার উপর যদি আর কোন সম্রাট্‌কে স্বীকার না করা যায়, তবে, সে সভ্যতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।

ব্যোম যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না। পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় স্রোতস্বিনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে বেচারা পাগল বলিয়া বিশেষ দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না। অধীর হইয়া উঠিয়া মাঝখানে অন্য কথা পাড়িতে চায়। তাহার কথা ভাল বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।

কিন্তু ব্যোমের কথা আমি কখন একেবারে উড়াইয়া দিই না।

আমি তাহাকে বলিলাম, ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়। ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম এবং মানুষের প্রতি জড়ের যে শত সহস্র অত্যাচার আছে, বিজ্ঞান তাহাই দূর করিতে চায়। জড়ের নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কে ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজারূপে অভিষিক্ত করিলে আর ত মনুষ্যের অবমাননা থাকে না। অতএব স্থায়ীরূপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতার উপনীত হইতে গেলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক যুগ অতিবাহন করা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্ষিতি যেমন তাঁর বিরোধী পক্ষের কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে বসা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করেন, আমাদের ব্যোমও তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন, তাহার পর যে যাহা বলে তাঁহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে পারে না। আমার কথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্ষিতি যেখানে ছিল সেইখানেই অটল হইয়া রহিল এবং ব্যোমও আপনার প্রচুর গোঁফদাড়ি ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।

এই ত আমি এবং আমার পঞ্চভূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে শ্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন, "তুমি তোমার ডায়ারি রাখনা কেন?"

মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধসংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে-লোক নহি; আমি কি ভাবি, কি করি তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য; অদ্য বর্ত্তমান যদিবা আমাকে অনাদর করিয়া

থাকে দূরদর্শী ভবিষ্যৎ আমাকে নিশ্চয় সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। বলা বাহুল্য এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীও আমার মস্তকের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া দুই একটা অকালপক্ক অপরাধী কেশের সন্ধান করিতে করিতে, স্নেহমুখে, সস্মিতনেত্রে কহিলেন "সত্যি, তুমি ডায়ারি লেখনা কেন?" বিশ্বাসপরায়ণা স্রোতস্বিনীর মাথারও আমার সম্বন্ধে দুই একটি অমূলক সংস্কার আছে। সমীরণ উহার চঞ্চলভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "লেখ না হে!" কেবল ক্ষিতি এবং ব্যোম চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, ডায়ারি লিখিবার একটি মহদ্দোষ আছে।

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তা থাক্, তুমি লেখ!

স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, কি দোষ, শুনি!

আমি কহিলাম—ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট গোলমাল আছে, সব-কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।

কোথাও কিছুই নাই, ব্যোম বলিয়া উঠিলেন—সেই জন্যইত তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল কর্ম্মই নিষেধ করেন। কারণ, কর্ম্মমাত্রই এক এই [illegible]। যখনি তুমি একটা কর্ম্ম সৃজন করিলে, তখনি সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল। আমরা

যতই ভাবিতেছি, ভোগ করিতেছি, কাজ করিতেছি, ততই আপনাকে নানা-খানা করিয়া তুলিতেছি। অতএব বিশুদ্ধ আত্মাটিকে যদি চাও, তবে, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দাও।

দীপ্তি ভারি চটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সমীরণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, তোমার বিশুদ্ধ আত্মাও যা, আর মাছ বাদ দিয়া মাছের ঝোলও তাই। একেবারে বিশুদ্ধ বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে হইতেছে ০। অতবড় বিশুদ্ধ অবস্থার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মিশ্র অবস্থাই আমি ভালবাসি।

আমি কহিলাম, আমারও সেই কথা। আমি নিজেকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল—ডায়ারিকে কেন যে জীবন বলিতেছ আমি ত এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

আমি কহিলাম, সব কথাই যে একেবারে পুরোপুরি বুঝিতে হইবে এমন নহে। মানুষের ভাষাও মানুষের মত; কেবল যে নিজের কাজটুকুই করে তাহা নহে, সময়ে অসময়ে পাড়া-পড়শির কাজও করিয়া দেয়। জীবন বলিতে প্রত্যহ যেমনটা বুঝায়, কোন এক সময়ে আবশ্যকমত তাহা হইতে অর্থের একটু ইতস্ততঃ হইলে অত্যন্ত মারাত্মক হয় না। আমার কথা এই, জীবন একদিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর একটা রেখা কাটিয়া

যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা, যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায় তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না, তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। দুটি রেখার মধ্যে কে আসল কে নকল, ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্ব্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে, সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্ত্তী করিতে চাহে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্র চিত্তে কহিল—বুঝিয়াছি তুমি কি বলিতে চাও। স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্ম্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।

স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায় যে, মনে হয় যেন বহুযত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহুপূর্ব্বেই সে আমার কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে—তখন একটু

লজ্জা বোধ হয়। সেই সঙ্গে আশ্চর্য্য বোধ হয়। স্রোতস্বিনীর সহজ বুদ্ধিশক্তি প্রতিবারেই একটা নূতন আবিষ্কারের মত আনন্দ দান করে।

আমি কহিলাম—সেই বটে।

দীপ্তি কহিল—তাহাতে ক্ষতি কি?

আমি কহিলাম—ক্ষতি তুমি কি বুঝিবে? যে ভুক্তভোগী সেই জানে। যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে। সাহিত্যব্যবসায়ীকে নিজের অন্তরের মধ্য হইতে নানা ভাব এবং নানা মানুষ বাহির করিতে হয়। যেমন ভাল মালী ফরমাস অনুসারে নানারূপ সংঘটন এবং বিশেষরূপ চাষের দ্বারা একজাতীয় ফুল হইতে নানা জাতীয় ফুল বাহির করে, কোনটার বা পাতা বড়, কোনটার বা রঙ বিচিত্র, কোনটার বা গন্ধ সুন্দর, কোনটার বা ফল সুমিষ্ট, তেমনি সাহিত্যব্যবসায়ী আপনার একটি মন হইতে নানাবিধ ফলন বাহির করে। মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের উপর জীবনের উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করে। যে সকল ভাব, যে সকল স্মৃতি, মনোবৃত্তির যে সকল উচ্ছ্বাস সাধারণ লোকের মনে আপন আপন যথানির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে, অথবা রূপান্তরিত হইয়া যায়—সাহিত্যব্যবসায়ী সেগুলিকে ভিন্ন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে মানুষ করিয়া তোলে। যখনি তাহাদিগকে ভালরূপে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করে, তখনি তাহারা অমর হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমশঃ সাহিত্য-ব্যবসায়ীর মনে একদল স্বস্বপ্রধান লোকের পল্লী বসিয়া যায়। তাহার জীবনের একটা ঐক্য থাকে না। কখন্ সে যে কি ভাবে চলিবে সে আপনিই জানে না ত অন্যে কি জানিবে। সে দেখিতে

দেখিতে একেবারে শতধা হইয়া পড়ে। তাহার চিরজীবনপ্রাপ্ত ক্ষুধিত মনোভাবের দলগুলি বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র আপন হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। সকল বিষয়েই তাহাদের কৌতূহল। বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশদিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে বাঁশি বাজাইয়া বেদনাপাশে বদ্ধ করে। দুঃখকেও তাহারা ক্রীড়ার সঙ্গী করে, মৃত্যুকেও তাহারা পরখ করিয়া দেখিতে চায়। নব কৌতূহলী শিশুদের মত সকল জিনিষই তাহারা স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কোন শাসন মানিতে চাহে না। একটা দীপে একেবারে অনেকগুলা পলিতা জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত জীবনটা হুহুঃশব্দে দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়। একটা প্রকৃতির মধ্যে এতগুলা জীবন্ত বিকাশ বিষম বিরোধ বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ম্লানভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে এইরূপ বিচিত্র স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার কি কোন সুখ নাই?

আমি কহিলাম—সৃজনের একটা বিপুল আনন্দ আছে। কিন্তু কোন মানুষত সমস্ত সময় সৃজনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না—তাহার শক্তির সীমা আছে, এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেও হয়। এই জীবনযাত্রায় তাহার বড় অসুবিধা। মনটির উপর অবিশ্রাম কল্পনার তা' দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে তাহার গায়ে কিছুই সয় না। সাত ফুটাওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভাল, ফুৎকারমাত্রে বাজিয়া ওঠে, কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসার-পথের পক্ষে ভাল, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়।

সমীরণ কহিল—দুর্ভাগ্যক্রমে রংশখণ্ডের মত মানুষের কার্য্য-

বিভাগ নাই—মানুষ-বাঁশিকে বাজিবার সময় বাঁশি হইতে হইবে, আবার পথ চলিবার সময় লাঠি না হইলে চলিবে না। কিন্তু ভাই, তোমাদের ত অবস্থা ভাল, তোমরা কেহ বা বাঁশি, কেহ বা লাঠি, আর আমি যে কেবল মাত্র ফুৎকার। আমার মধ্যে সঙ্গীতের সমস্ত উপকরণই আছে, কেবল যে একটা আকারের মধ্য দিয়া তাহাকে বিশেষ রাগিণীরূপে ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, সেই ছাঁচটা, সেই যন্ত্রটা নাই। আমি কেবল চারদিকে হাহা হুহু করিয়াই মরি। বন্ধুরা সর্ব্বদা তাগিদ্ করেন, একটা কিছু কাজ কর না কেন; আমি বলি আমার এত বেশী ভাবের প্রাবল্য যে, কোন একটা বিশেষ কাজ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমার সর্ব্বাঙ্গে এত অধিক বর্ম্ম চর্ম্ম অস্ত্রশস্ত্র কল-কৌশল যে, লড়াই করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং যে লড়িবে আমি তাকে অস্ত্র যোগাইতে পারি। কোন কোন বন্ধু বলেন, তবে লেখনা কেন? আমি কিছু কাঁস না করিয়া চোখ টিপিয়া বলি, আমি ত সেই চেষ্টাতেই আছি—আর দিনকতক যাক না। বন্ধু আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া যান, আমি বসিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবি, ভাবের ত কিনারা দেখি না—কিন্তু লিখিতে গেলে ত এক জায়গায় আরম্ভ এবং এক জায়গায় শেষ করিতে হইবে। বন্ধু যদি সেইটে নির্দ্দেশ করিয়া বাড়ি যাইতেন ত কাজে লাগিত।

দীপ্তি কহিলেন—মানবজন্মে আমাদের অনেক জিনিষ অনর্থক লোকসান হইয়া যায়। আমাদের কত চিন্তা, কত ভাব, কত ঘটনা প্রবল সুখদুঃখের ঢেউ তুলিয়া দিয়া যায়, তাহারা কি এত তুচ্ছ যে একেবারে বিস্মৃতির যোগ্য! আমাকে যাহারা প্রতি-দিন নানারূপে বিচলিত করিয়া যায়, তাহাদিগকে যদি লেখার

বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে মনে হয় যেন আমার জীবনের অনেকখানি হাতে রহিল। সুখই হোক্, দুঃখই হোক্, কাহারো প্রতি একেবারে সম্পূর্ণ দখল ছাড়িতে আমার মন চায় না।

ইহার উপরে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিলাম স্রোতস্বিনী একটা কি বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় যদি আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করি তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের কথাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল—কি জানি ভাই, আমার ত আরো ঐটেই সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক মনে হয়। প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না। আমাদের অনেক সুখদুঃখ, অনেক রাগদ্বেষ অকস্মাৎ সামান্য কারণে গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। হয়ত অনেক দিন যাহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছি একদিন তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে, যাহা আসলে অপরাধ নহে একদিন তাহা আমার নিকটে অপরাধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তুচ্ছকারণে হয় ত একদিনকার একটা দুঃখ আমার কাছে অনেক মহত্তর দুঃখের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছে, কোন কারণে আমার মন ভাল নাই বলিয়া আমরা অনেক সময় অন্যের প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহার মধ্যে যেটুকু অপরিমিত, যেটুকু অন্যায়, যেটুকু অসত্য তাহা কালক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যায়—এইরূপে ক্রমশই জীবনের বাড়াবাড়িগুলি চুকিয়া গিয়া জীবনের মোটামুটিটুকু টিঁকিয়া যায়, সেইটেই আমার প্রকৃত আমারত্ব। তাহা ছাড়া আমাদের মনে অনেক কথা অর্দ্ধস্ফুট আকারে আসে যায়

মিলায় তাহাদের সবগুলিকে অতিস্ফুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রতি তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।

সহসা স্রোতস্বিনীর চৈতন্য হইল কথাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া এবং কিছু আবেগের সহিত বলিয়াছে, অমনি তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল—মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল—কি জানি, আমি ঠিক বলিতে পারি না, আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে!

দীপ্তি কখন কোন বিষয়ে তিলমাত্র ইতস্ততঃ করে না—সে একটা প্রবল উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আমি কহিলাম—তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমিও ঐ কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু অমন ভাল করিয়া বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। শ্রীমতী দীপ্তির এই কথা মনে রাখা উচিত, বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়। অর্জ্জন করিতে গেলে ব্যয় করিতে হয়। জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কি হইবে প্রত্যেক তুচ্ছ-দ্রব্য মাথায় তুলিয়া, প্রত্যেক ছিন্নখণ্ড পুঁটুলিতে পূরিয়া, জীবনের প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত পশ্চাতে টানিয়া লইয়া? প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য!

দীপ্তি মৌখিক হাস্য হাসিয়া করযোড়ে কহিল—আমার খাট হইয়াছে তোমাকে ডায়ারি লিখিতে বলিয়াছিলাম, এমন কাজ আর কখন করিব না।

সমীরণ বিচলিত হইয়া কহিল—অমন কথা বলিতে আছে! পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম। আমরা মনে করি দোষ স্বীকার করিলে বিচারক দোষ কম করিয়া দেখে, তাহা নহে; অন্য লোককে বিচার করিবার এবং ভৎর্সনা করিবার সুখ একটা দুর্লভ সুখ, তাহাতে মনেমনে একটা উচ্চাসনের অধিকারী হওয়া যায়। তুমি নিজের দোষ নিজে যতই বাড়াইয়া বল না কেন, কঠিন বিচারক সেটাকে ততই চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়। আমি প্রমাণ করিয়া দিব, সংসারের মধ্যে জীবনের কাজ করিয়া যাওয়ার অপেক্ষা ডায়ারির মধ্যে একটা জীবন গঠিত করিয়া যাওয়া ঢের ভাল কাজ। হুইট্‌নি সাহেব কহেন, পাণিনি যে এমন একটা সুসম্পূর্ণ ব্যাকরণ, তাহার কারণ, উহা কোন ভাষা অবলম্বন করিয়া রচিত নহে—তৎপূর্ব্বের সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার অবিকল যোগ নাই—অনেক আইনকানুন, ধাতুপ্রত্যয় নিজের ইচ্ছামতে গড়িয়া ব্যাকরণটা খুব সুসম্বদ্ধ হইয়াছে। জীবন্ত ভাষার ন্যায় মানুষের জীবনও অসম্পূর্ণ। অতএব জীবনটাকে বাদ দিয়া ডায়ারিকে পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলে যাহা হউক একটা রীতিমত কাজ করা হয়। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব ভাবিতেছিলাম, এখন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিখিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন সকল অনুরোধ দীপ্তি আমাকে করেন না। আমার মত এমন বিশুদ্ধ ক্ষেত্র আর নাই। আমি যে কি হইতে পারি এবং না হইতে পারি তাহা কেহ বলিতে পারে না—খবরের কাগজের সম্পাদক হইতে হাইকোর্টের জজ্ পর্য্যন্ত আমি যে কি আকারে পৃথিবীকে চকিত স্তম্ভিত করিব তাহা কেহ জানে না। অতএব দীপ্তির মাথায় যে সকল নূতন নূতন ভাব সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আমাকে

যদি তার উপযুক্ত পরীক্ষাস্থল বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই তাঁর বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দেওয়া হয় এবং আমার মত কর্ম্মহীন হতাশ লোকের মনেও কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মে। যাহা হউক্ দীপ্তি আমাকে যদি ডায়ারি লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি কহিলাম—আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উঠিল। সসীরণ করযোড়ে কহিল—"দোহাই তোমার, সব কথা যদি লেখায় ওঠে, তবে বাড়ি হইতে কথা মুখস্থ করিয়া আসিয়া বলিব। এবং বলিতে বলিতে যদি হঠাৎ মাঝখানে ভুলিয়া যাই, তবে আবার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহাতে ফল হইবে এই যে, কথা বিস্তর কমিবে এবং পরিশ্রম বিস্তর বাড়িবে। যদি খুব ঠিক সত্য কথা লেখ, তবে তোমার সঙ্গ হইতে নাম কাটাইয়া আমি চলিলাম।

আমি কহিলাম—আরে না, সত্যের অনুরোধ পালন করিব না, বন্ধুর অনুরোধই রাখিব। তোমরা কিছু ভাবিও না আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।

ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রসারিত করিয়া কহিল—সে যে আরো ভয়ানক। আমি বেশ দেখিতেছি তোমার হাতে লেখনী পড়িলে যত সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।

আমি কহিলাম—মুখে যাহার কাছে তর্কে হারি, লিখিয়া তাহার প্রতিশোধ না নিলে চলে না। আমি আগে থাকিতেই

বলিয়া রাখিতেছি, তোমার কাছে যত উপদ্রব এবং পরাভব সহ্য করিয়াছি এবারে তাহার প্রতিফল দিব।

সর্ব্বসহিষ্ণু ক্ষিতি সন্তুষ্টচিত্তে কহিল—তথাস্তু।

ব্যোম কোন কথা না বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ হাসিল, তাহার সুগভীর অর্থ আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

সুখ না দুঃখ?

মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্যই সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায়, বা যে যা' বুঝে, তাহার জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতরপ্রাণীর পক্ষেও সুখের চেষ্টাই জীবন-প্রণালী; এবং স্থূলহিসাবে সুখান্বেষণ-চেষ্টার ফলই জৈবিক অভিব্যক্তি ও জৈবিক প্রবাহ। এস্থলে সুখ কি, সুখের আধ্যাত্মিক অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতণ্ডা তোলার আবশ্যক নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে সে তাহাই করে, এবং তাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষ্যীভূত পদার্থ; অন্যের আদর্শোপযোগী হউক আর নাই হউক, সেই নিজ নিজ চেষ্টার সমবেত ফলে সৃষ্টি চলিতেছে; উন্নতিই বল আর অধোগতিই বল, বিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তি তাহার ফলেই চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তি-প্রণালী স্থূল কথায় এই;——

যদিও আবহমানকাল মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, কিন্তু জীবনে সুখের ভাগ বেশী কি

দুঃখের ভাগ বেশী, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই কথাটার মীমাংসা লইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে জীবনে সুখের মাত্রাই অবশ্য অধিক; অন্যপক্ষ বলেন, অসুখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিকমাত্রায় পাইয়াছেন; তাঁহারা সকলই সুস্থ-চোখে সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ নিজ জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্যশালী নহেন; তাঁহাদের রুগ্ন চক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্ব্বলতায় শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পাঁক হইতে উঠিয়া সহজলভ্য সুখের শুষ্কপথে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এরূপস্থলে তাঁহাদের মতামত নিজ জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়ামাত্র; জগতে সুখদুঃখের তারতম্য নির্ণয়ে ইহাঁদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা, নিকৃতির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে তাহা ঠিক্ দেখিবার উপায় থাকিলে, এতদিন মীমাংসা বাকী থাকিত না। কেন না, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন প্রকৃতি-গত চশ্‌মা চোখে না দিয়া পারেন না; কাজেই কেহ বলেন, এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্।

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই;—জীবনে সুখ বেশী, জীবনের অস্তিত্বই তার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন? মানুষ যে বাঁচিতে চায়, (অবশ্য দুই চারিটা আত্ম-ঘাতীকে বাদ দিয়া) ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে।

দুঃখের ভাগ বেশী হইলে, দড়ি কলসী যোগান এতদিন 'বিরাট' ব্যাপার হইত; সংসার এতদিন জীবহীন মরুভূমে পরিণত হইত। আধিব্যাধি, মরণযাতনা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, তাহার উপর মুখোস্‌পরা ধর্ম্মের জয়জয়কার ও প্রণয়ে কৃত্রিমতা, এসব নাই এমন নহে; তবে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, মমতা, সারল্য, প্রেম ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এইসকলও জগতে বর্ত্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহারনিদ্রা সম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও নিতরাং ব্যাপৃত; নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি ব্যাপারটা এতদিন লোপ পাইত, এবং ডারুইন সাহেবকেও অভিব্যক্তি-বাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্ব রক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাঁহারা নীতিশাস্ত্র নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না;—কেন না, দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্দ্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য; সুতরাং দুঃখ আছে বৈ কি। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের প্রবাহ সেই মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা সুখপ্রদ বা মোটের উপর সুখপ্রদ তাহাই ধর্ম্ম, যাহা মোটের উপর দুঃখপ্রদ তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মের সংজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে; কিন্তু 'সুখ' শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবে উঁচু অর্থ প্রয়োগ করিয়া

আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ কি, না যাহাতে জীবন বর্দ্ধন করে; এবং জীবনবর্দ্ধনের ন্যায় মহান্ উদ্দেশ্য প্রকৃতির নিকট আর কি আছে? এইরূপে সুখ কথাটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা বড় থাকে না। যাই হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি হইতেছে যদি ধরা যায়, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে; কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্ব্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রাপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক; নহিলে মানুষ জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত। ধর্ম্মনীতি উলটাইয়া যাইত, স্নেহমমতা, পাপ ও চুরি-ডাকাতি ধর্ম্মের পর্য্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের জাতীয় অভিব্যক্তি নামক পুঁথিখানা জগতের দৃশ্যপটটাকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শান্তি, প্রীতি ও মাধুর্য্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা, স্বার্থ, শোণিততৃষা ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্ত-রসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম! এই নির্ম্মম কাটাকাটিই আবার মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির অনেকটা মূল, এ কথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি-অঙ্কের অভিনয় এখনও যে শীঘ্র থামিবে এরূপ ভরসা বড়ই অল্প। কিন্তু যাঁহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চান ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে বৈজ্ঞানিক

মতের উল্লেখ করিয়াছি, হর্বার্ট স্পেন্সর ইহার প্রধান প্রচারক; এবং হর্বার্ট স্পেন্সর ডারুইন-তত্ত্বের একজন প্রসিদ্ধ 'পাণ্ডা'।

ডারুইনের দর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখসম্বন্ধে বিশ্বাস করা বড়ই অসংসাহসিক ব্যাপার হয়; কেন না, হিংসা ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আবার সুখ কি? ঘাতকের কিয়ৎপরিমাণে আপন মনের মত সুখ বা তৃপ্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু সেও ক্ষণিকমাত্র, কেন না, জঠরজ্বালারূপ সদাতন মহাদুঃখ নিবারণের জন্যই এই হত্যা-ব্যবসায়; এবং আহারব্যাপারের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান, তাহার যে পরোপকার-বৃত্তি সে সময়ে বিশেষ প্রবল হয় এবং তজ্জনিত পরমানন্দ উপভোগ করে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, সুপ্রসিদ্ধ আল্‌ফ্রেড্ ওয়ালাস্ ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস্ এহেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, হিংসা আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই। হত্যাকার্য্যের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কার্য্যটা নিষ্পন্ন হইতেছে সে ততটা পায় না; দয়াশীলা প্রকৃতির এমনি সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না, এমন কি, বোধশক্তি হয়ত হননকালে লোপ পায়। প্রহার দেখা, শুনা বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে কোন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষাটা করিতে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ; তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে বলা যায় না। প্রহারভোগে যেন ক্লেশ খুব কম হইল, বা না হইল; তবে প্রহারদর্শনও ত নিত্য ঘটনা। আবার দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে

সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায় ; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। আবার দুঃখ হইতে মুক্তিচেষ্টাইত অভিব্যক্তি। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখ লঘুকরণের অভিমুখী, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ও-পক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান। কই খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য, দুঃখের ন্যায় সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, ধনী কয়টা ? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায় ? আবার অধর্ম্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম্ম বেশী না অধর্ম্ম বেশী ? ধার্ম্মিক যেখানে দুইটা, অধার্ম্মিক সেখানে দুশটা ; আবার ধার্ম্মিক দুইটার ধার্ম্মিকত্ব প্রমাণাপেক্ষ, অধার্ম্মিক দুশটার অধার্ম্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবন বা জীবনী চেষ্টা যাহাকে বল, সে ত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াসমাত্র। কিন্তু হায়, অধিকাংশস্থলে প্রয়াস কি কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র নহে। আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই ইচ্ছা বা লালসা। ইচ্ছা বা লালসা লইয়াই জীবন ও জীবনের সমুদায় কার্য্য ; বুদ্ধি, কি চিন্তা, কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত ইচ্ছারই ভরণপোষণ, পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত। সেই ইচ্ছার অর্থ কি ? না, বর্ত্তমান অভাব, বর্ত্তমান ক্লেশ, দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে ইচ্ছা থাকিত না, জীবনের আবশ্যকতা থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের স্রোত হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণে নিষ্ফল আয়াসই জীবনের সমাপ্তি,

সেখানে জীবন দুঃখময়, কি সুখময় তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবনপ্রবাহ ত রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা, তবে নিষ্কৃতি হয় না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছু নাই? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা যায়? ধর সুখত আছে, দুঃখত আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে, দুঃখ যত থাকে তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায়; দুঃখকে সুখ হইতে দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ষ্যা, পরিতাপ সবই দুঃখময়;—যৌবন, স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাবমাত্র; ধন, মান, প্রণয়, সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ,—স্নেহ, দয়া, মমতা, ইহারা ত অধিকাংশ দুঃখেরই মূল;—জ্ঞান, ধর্ম্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়।" * যে জ্ঞানী, যে ধার্ম্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক। দুঃখও অধিক। মানুষেরইত দুঃখ, কাঠপাতরের আবার দুঃখ কি?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, সুতরাং ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি

* Sidgwick's History of Ethics p. 273.

প্রখর, নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভব-শক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখই অধিক। ফিজিদ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায়; বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাওয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে, কার দুঃখ অধিক ?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকট মানুষের পূর্ণ অধীনতা প্রমাণ করে। মানুষ অন্ধশক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে; ফাঁদ এড়াইতে যাইয়া ফাঁদে পা দিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না, তথাপি বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য। বুদ্ধিমান যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

বর্ত্তমান দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেন হাওয়ার ও হার্টম্যান অগ্রণী। সুখের আশা নাই; সভ্যতাবৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর; ইচ্ছা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যত্বে সমাহিত হউক। স্ফূর্ত্তিমান্ ইংরাজ যে, মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায়, কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মনিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল ভাল বুঝা যায় না।

হিন্দুর লয়তত্ত্ব, বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ, এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, গরু দাও, ভাল শ্রী দাও, বলিয়া যাঁহারা হোমানলে সোমরস ঢালিতেন,

তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে মুক্তির চেষ্টাই বুদ্ধদেবের জীবন। তার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে; যিনি যখন বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা; ইচ্ছা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মোক্ষ লাভ করিবে। আধুনিক হিন্দুর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে কাব্যে যাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অনুভাবের প্রতিফলিত ভাবমাত্র। কালিদাস যে, কখন সুখ ও সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন বোধ হয় না। ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দিয়া কেবল সুন্দর-দর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের মহান দুঃখসঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর; বৈরাগী হইও না। শেক্ষপীয়রের কল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদ্গত প্রফুল্ল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখা-

সেই শেক্সপীয়র জীবনের রহস্যভেদে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রণয়ের নৈরাশ্য, ধর্ম্মের বিড়ম্বনা ও জীবনের নিষ্ফলতায় উচ্ছ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধুশোকার্ত্ত টেনিসন্ সৃষ্টিলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃতদেহের সহিত সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে; কিন্তু তোমার বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন খেয়াল নিষ্ঠুরভাবে তোমায় বলিদান দিবে, তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে বুঝা যায় না।

মোট কথা, পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না;—প্রকৃতির এই উপদেশ।

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য।

লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে—তিনি মনেমনে দুঃখকেই যেন বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সংসারে যদি সুখের পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইলে মীমাংসার ত কোন গোল থাকে না। জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে তহবিল মেলে না—জগতের জমাখরচে যদি দুঃখটাই বেশী হইয়া পড়ে তবে জগৎটার হিসাব নিকাশ হয় না।

ধর্ম্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্ব্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে ভুলানো হয় মাত্র। যাঁহারা সংসারের দুঃখতাপ অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগতের দুঃখের অংশ কোন মতে গোঁজামিলন দিয়া সারিয়া লইবার চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়ের কাজ। জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট, অনেক দৈন্য আছে, যাহার কোন মহিমা নাই, যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত, সঙ্কীর্ণ, শ্রীহীন করিয়া দেয়—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে—আমরা তাহার কোন কারণ, কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিণামের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্দ্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।

কিন্তু অনেক সময়ে একটা জিনিষকে তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়। দুঃখকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একত্র করিলে পর্ব্বতের ন্যায় দুর্ভর ও স্তূপাকার হইয়া উঠে, কিন্তু স্বস্থানে তাহার এত ভার নাই।

সমুদ্র হইতে এক কলস জল তুলিয়া লইলে তাহা বহন করা কত কষ্টসাধ্য, কিন্তু জলের মধ্যে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর শত সহস্র কলস জল তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার ভার অতি সামান্য বোধ হয়। জগতে ভার যেমন অপরিমেয়, ভার সামঞ্জস্যও তেমনি অসীম। পরস্পর পরস্পরের ভার লাঘব করিতেছে। চিরজীবন নিত্যবহন করিবার পক্ষে আমাদের শরীর কিছু কম ভারী নহে। স্বতন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলে তাহার ভারের পরিমাণ যথেষ্ট দুঃসহ মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, আমরা তাহা অক্লেশে বহন করি। সেইরূপ জগতে দুঃখ অপর্য্যাপ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাঘব করিবারও সহস্র উপায় বর্ত্তমান। আমরা আমাদের কল্পনা-শক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখপারাবারের মধ্যেও সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সুভা।

১।

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে? তাহার দুটি বড় বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মত বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না, সে যে কিছু অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এই জন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে, বিধাতার অভিশাপ-স্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখন ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষতঃ তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপে দেখিতেন। কেন না, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশ-স্বরূপে দেখেন—কন্যার কোন অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ

কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়ের অপেক্ষা যেন একটু বেশী ভালবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত। কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জ্জমা করার মত; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জ্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখন প্রসারিত, কখন মুদিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর, অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মত একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২।

গ্রামের নাম চণ্ডিপুর। নদীটি বাঙ্গলা দেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূরপর্য্যন্ত তাহার প্রসর

নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াসন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে, প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্য্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়াল ঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান, নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্ম্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্ম্মর সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চির-নিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লব-বিশিষ্ট সুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখীরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজল জগৎ সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক

বিজন মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্ব্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখন শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভৎর্সনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিত। সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোন কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতা-পরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্ম্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে গা ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষ ভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি

তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন্ তখন্ সুভার গরম কোলটি নিঃসঙ্কোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে, যে, তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩।

উন্নত-শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোট ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সে যে, কাজকর্ম্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্ম্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোন কার্য্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারী সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। সহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারী বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই চারিটা অকর্ম্মণ্য-সরকারী লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেকর্ম্মে, আমোদে অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে, সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান সখ, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটান' যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে

ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভাল। মাছধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্য্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ্ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত প্রতাপের কোন একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা কোন কাজে লাগিতে, কোন মতে জানাইয়া দিতে, যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, বলিত, "তাইত! আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা ত জানিতাম না!" মনে কর, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মাণিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে—কে বসিয়া?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর

একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব! আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছে না।

৪।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোন একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোন একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় চেতনা-শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না। গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে এক একদিন ধীরে শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে। পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মত একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনে রহস্যে, পুলকে বিষাদে, অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত, এমন কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মত বাণী

বিদেশে গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "চল, কলিকাতায় চল।"

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মত সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্ব্বাক্ জন্তুর মত তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ্ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কিরে, সু, তোর না কি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে কর্‌তে যাচ্চিস্? দেখিস্, আমাদের ভুলিস্ নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল। মর্ম্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে "আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছিলাম," সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়ন-গৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্র-পল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্ল দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুইটি বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা, আমার মত দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ!"

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভৎর্সনা মানিল না।

বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মন্দ নহে।" বিশেষতঃ বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোন কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

বৃত্তিত্রয়ের অভিব্যক্তি।

অহংবৃত্তি মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি এই তিন বৃত্তিকে এখানে আমরা বৃত্তিত্রয় বলিতেছি। শব্দ লইয়া মিথ্যা গোলোযোগ বাধানো আমাদের দেশের একটি চিরন্তন প্রথা—তাহার সাক্ষী রাশি রাশি টীকা, ভাষ্য এবং টিপ্পনীসকলের একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া—বৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝি, সেটা সর্ব্বাগ্রে ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি।

লেখক কোনো এক প্রবন্ধের একস্থানে বৃত্তিভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাতে তদুপলক্ষে কোনো বিজ্ঞ সমালোচক (তাঁহে বোধ হইল যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া) পরোক্ষে বলিয়াছিলেন, "এখনো ইনি বৃত্তিভেদ মানেন!" অর্থাৎ যেন বৃত্তি-ভেদ না মানা ঊনবিংশ-শতাব্দীর বিদ্যা-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ! ইঁহার জানা উচিত যে, বৃত্তি-ভেদ যদি বাস্তবিক না থাকিত, তবে কল্পনাতেও বৃত্তিভেদের কথা উঠিতে পারিত না। বাহ্যেন্দ্রিয় যেমন বহু, মনোবৃত্তিও তেমনি বহু; প্রভেদ কেবল এই যে,(১) বৃত্তিগণের সমাবেশ ধারাবাহী (one dimentional), অর্থাৎ তাহারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইভাবে অনুবদ্ধ; (২) বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সমাবেশ ত্রৈধারিক (Tridimentional), অর্থাৎ তাহারা উপর নীচে, বাম দক্ষিণ, সম্মুখ পশ্চাৎ এইভাবে সম্বদ্ধ। ইহার সহজ উদাহরণ;—মুকুল এবং পুষ্প দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে ইহা তো স্বীকার কর? মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রদবস্থা দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে, ইহা তো স্বীকার কর?—মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। নিদ্রা এবং জাগরণের সন্ধিস্থল ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তি মনোবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়; এবং নিদ্রা ভাঙিলে মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মুকুল এবং পুষ্পের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ; আবার, একটি পুষ্পের দুইটি দলের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, বাম চক্ষু এবং দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। মনে করিও না যে, পুষ্প ঝরিয়া পড়িল, ফল পাকিয়া উঠিল, পুষ্প গেল—আর সে দেখা দিবে না! অথবা, সূর্য্য অস্ত-

বৃত্তি। তাহার পরে যখন জানা হয় যে "এটা এই", "ইহার উহার মধ্যে প্রভেদ এই" ইত্যাদি—জ্ঞানের এই যে অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থা ইহাকেই আমরা বলিতেছি বুদ্ধিবৃত্তি। এ যেন হইল—কিন্তু এ তো পরম্পরাক্রম; পর্য্যায়ক্রমের প্রমাণ কি? বুঝিলাম যে, ১, ২, ৩, এইরূপ ক্রমে অহং, মন এবং বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়;—কিন্তু তাহারা যে ১, ২, ৩; ১, ২, ৩; ১, ২, ৩; এইরূপ করিয়া সঙ্গীতের তালের ন্যায় পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই;—মনুষ্য প্রথমে প্রকৃতির হস্তে গঠিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়—তাহার পরে মনুষ্যের হস্তে গঠিত হয়; এই দ্বিতীয় বারে, যিনি গঠিত হইতেছেন তিনিও মনুষ্য; কাজেই "মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্য গঠিত হয়" এরূপ বলিলে তাহার সঙ্গে ইহাও বুঝাইয়া যায় যে, মনুষ্য কতকপরিমাণে আপনা কর্ত্তৃক আপনি পরিগঠিত হয়। সভ্যজাতীয় মনুষ্য ছয় জন কারিকরের হস্তে ক্রমান্বয়ে পরিগঠিত হয়—(১) প্রকৃতির হস্তে, (২) মাতার হস্তে, (৩) পিতার হস্তে, (৪) শিক্ষকের হস্তে, (৫) সঙ্গীগণের হস্তে, (৬) আপনার হস্তে। মাতা, পিতা গুরু প্রভৃতির হস্তে গঠিত হইয়া মনুষ্য যখন রীতিমত মানুষ হইয়া উঠে; তখন হইতে সে আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনি পরিগঠিত হইতে থাকে। প্রথমে মাতা এবং সহকারী মাতা (অর্থাৎ ধাত্রী), মনুষ্যকে মানুষ করে; তাহার পরে শিক্ষক এবং সঙ্গীগণ তাহাকে মানুষ করে; তাহার পরে এই জন্মেই যখন সে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে—তখন হইতে আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনি আপনাকে মানুষ করে; (শুধু তা' নয়—রাক্ষসও করে;—যেমন, রাবণ, রিচার্ড দি থার্ড; দেবতাও করে, যেমন, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট ইত্যাদি।)

কচি বালক প্রথমাবস্থায় আপনার অহংটুকু মাত্র জানে—

ক্ষুধা হইলেই চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে; আর কেহ খাইল কি না খাইল তাহা বিন্দুমাত্রও ভাবে না—কিন্তু তাহার আপনার খাওয়াটি চাইই চাই। কচি বালকের এরূপ আচরণ দেখিয়া কেহই তাহাকে দোষ দেয় না, যেহেতু তাহাতেই তাহার সৌন্দর্য্য। এ অবস্থায় বালক মাতার হস্তে লালিতপালিত হয়; ক্রমে তাহার মনোবৃত্তি যতই বিকসিত হইতে থাকে ততই 'এটা কি,' 'ওটা কি' জানিবার জন্য তাহার একটা আঁকুবাঁকু জন্মে; এবং তাহারই উত্তেজনায় ক্রমে সে মাতৃভাষায় স্বভাব-সুলভ ব্যুৎপত্তি লাভ করে—অর্থাৎ না পড়িয়া যতদূর ভাষাবিৎ হইতে পারা যায়, তাহাই হয়। এইরূপে তাহার মনোবিকাশ কতক দূর অগ্রসর হইলে তাহাকে যখন বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়, তখন হইতে তাহার বুদ্ধি-বিকাশ আরম্ভ হয়; তাহার পরে তাহার বুদ্ধি ক্রমে যখন পরিপক্ক হইয়া উঠে, তখন মাতৃগর্ভ হইতে শিশু যেমন অন্তঃপুরে জন্মগ্রহণ করে, সে সেইরূপ বিদ্যালয় হইতে সংসার-ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণবশতঃ পূর্ব্ব-কালে ব্রাহ্মণেরা গুরুগৃহ হইতে রীতিমত পরিগঠিত হইয়া বাহির হইলে দ্বিজ নামে সংজ্ঞিত হইতেন। এইরূপ অবস্থায় মনুষ্য যখন প্রথম জন্ম হইতে দ্বিতীয় জন্মে পদনিক্ষেপ করে, তখন প্রথম জন্মে যেমন তাহার অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি পরে পরে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় জন্মে পুনর্ব্বার সেই তাহার অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি আরএক ভাবে পরে পরে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। কি ভাবে?

প্রথম জন্মের অহং, মন, বুদ্ধি, এবং দ্বিতীয় জন্মের অহং, মন, বুদ্ধি, উভয়কে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—কি ভাবে।

প্রথম জন্মের অহংবৃত্তি আপনাকে কেবল জানে, আর কিছুই জানে না; কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের অহংবৃত্তি বুদ্ধিবিকাশের পরে বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়; সুতরাং এবারে এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, অহংবৃত্তি কেবল আপনাকেই জানে, আর কিছুই জানে না।

দুই বারের দুই অহংবৃত্তিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম জন্মের অহংবৃত্তি যখন আপনাকে ছাড়া অন্য কিছুই জানে না, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, অন্যের সঙ্গে আপনার তুলনা করিয়া আপনার আপনাত্ব সংস্থাপন করা তাহার কার্য্য নহে; কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের অহংবৃত্তি বুদ্ধিবিকাশের পরবর্ত্তী—সুতরাং এবারকার অহংবৃত্তি আপনাকে যেমন জানে, তেমনি অন্যকেও জানে; তা' ছাড়া অন্যের সঙ্গে আপনার তুলনা করিয়া উভয়ের ভেদাভেদ কিরূপ তাহাও জানে; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অন্যের তুলনায় আপনার বড়ত্ব সমর্থন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এইজন্য, দ্বিতীয় জন্মের অহংবৃত্তি অহংকার শব্দের বাচ্য। দ্বিতীয় জন্মের মনোবৃত্তিও বুদ্ধিবিকাশের পরবর্ত্তী; প্রথম জন্মের মনোবৃত্তি "এটা কি ওটা কি" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিত এবং তাহার উত্তরে তাহাকে যে যাহা বলিত তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত; কিন্তু এবারকার মনোবৃত্তির জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি সেরূপ সহজে হইতে পারে না; এ অবস্থার লোকে জিজ্ঞাস্য বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া-শুনিয়া—হাতেকলমে পরীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করে। পূর্ব্বে যেখানে জিজ্ঞাসা-মাত্র ছিল—এখন সেখানে 'মীমাংসা,' কিনা প্রমাণের ইচ্ছা, আসিয়া দেখা দেয়। বুদ্ধিও এবারে সামান্য জ্ঞানে (পুঁথিগত বিদ্যায়) সন্তোষ মানে

না। এবারে বুদ্ধি নানা কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া বিজ্ঞতা এবং বহুদর্শিতা উপার্জ্জন করে; সেই শৃঙ্খলা-বদ্ধ (systematic) জ্ঞান উপার্জ্জন করে—যাহার নাম বিজ্ঞান। এখানে পুস্তকের বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হইতেছে না;—এমন অনেক মুহুরি আছেন যিনি অঙ্কশাস্ত্র পড়েন নাই—অথচ হিসাব-রাখা-কার্য্যে অদ্বিতীয় নিপুণ। বিশেষ বিশেষ মনুষ্য বিশেষ বিশেষ কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করে। বিজ্ঞতামাত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান; উড়ো উড়ো সামান্য জ্ঞান কখনই বিজ্ঞতা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

এইরূপ করিয়া জীবন-চক্র দুইপাক ঘুরিলে তবেই সাংখ্য-দর্শনের এই কথা সপ্রমাণ হয় যে, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে মন ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন, যথা—

১ { অহং
মন
বুদ্ধি (সামান্য জ্ঞান)

পুনরায়

২ { অহঙ্কার
মন
বুদ্ধি (বিজ্ঞান)

} সাংখ্যের উৎপত্তি-ক্রম।

এইরূপ প্রথম জন্মের অপরিস্ফুট অহং এবং মন ছাড়িয়া দিয়া তৎকাল-সুলভ বুদ্ধি (সামান্য জ্ঞান) হইতে গণনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই সাংখ্যের উৎপত্তিক্রম। অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল বিষয়ে আর একবার পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল, সেই সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের মহত্ত্ব যে,

প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুটা কি তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

কবি ভবভূতি।

ভারতবর্ষের কাব্যজগতে কালিদাস ও ভবভূতি কবিশ্রেষ্ঠ। মহাভারত ও রামায়ণ এই দুইখানি অসামান্য, অতুল্য ও অনন্ত কাব্যরত্নখনি ছাড়িয়া দিলে, সংস্কৃত আর কোনও গ্রন্থই শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের সমতুল নহে। কল্পনাপটু ও কারুণ্যরসপ্রধান হিন্দু কবিদিগের কল্পনা হইতে শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের ন্যায় সুন্দর কাব্য কখন নিঃসৃত হয় নাই। হিন্দুজগতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকটেই শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের যেরূপ আদর, অন্য কোনও কাব্যের সেরূপ আদর নাই।

অনেক প্রগল্‌ভ বালক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়? প্রশ্নটী শুনিলে, বিবাহের সময় যে জিজ্ঞাসা করে, বর বড়, না কনে বড়,—সেই কথাটা মনে পড়ে! দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বর বড় হইতে পারেন, মাধুর্য্য ও কমনীয়তায় কনে বড়। বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিতে কখন কখন বর বড়,—অনেক সময়ে কনে বড়! লেখাপড়ায় এতদিন বর বড় ছিল, এখন বলা যায় না, অনেক কনে "বি এ"-উপাধি সম্প্রাপ্তা! কাব্য ও উপন্যাস লেখায় আজকাল কনে বড়,—আমরা হার মানিয়াছি।

কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়, এ কথা সহজে মীমাংসা করিবার যোগ্য নহে। প্রগল্‌ভ বালকে যাহাই বলুক, যাঁহারা কবিত্বের মর্ম্ম হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই এই প্রশ্নের

উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবেন। অনেক গুণে কালিদাস বড়, আবার অনেক গুণে ভবভূতি বড়। কালিদাসের রচনা মধুর ও সুললিত, ভবভূতির রচনা সেরূপ মধুর নহে, স্থানে স্থানে কর্কশ। কালিদাসের উপমাগুলি যেন উপবনে রাশি রাশি বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ বিচিত্র, সেইরূপ সুগন্ধ ও সুন্দর—হৃদয়মুগ্ধকারী। ভবভূতির সেরূপ উপমাচাতুর্য্য নাই। তদ্ভিন্ন কালিদাসের কল্পনায় যেন আবিষ্কারক্ষমতা অধিক আছে, কল্পনা হইতে যে জগৎটী যখন সৃষ্টি করেন, কি কণ্বমুনির আশ্রম, কি উমার জন্মস্থান, কি যক্ষের প্রবাসভূমি, সে জগৎটী যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, পাঠক সেই জগতে বিচরণ করিতে করিতে যেন বহির্জগৎ ভুলিয়া যান, তাহার প্রাণমন কবির জগতে স্নিগ্ধ ও আনন্দিত হয়। ভবভূতির কল্পনায় এরূপ আবিষ্কারক্ষমতা নাই। আরও বোধ হয়, মানবহৃদয়ের সরলতা, কমনীয়তা, মধুরতা বর্ণনা করিতেও কালিদাস ভবভূতি হইতে সুপটু, এবং বহির্জগৎ বর্ণনায় কালিদাস অতুল্য। উদাহরণস্থলে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার হৃদয়ের সরলতা ও কমনীয়তা দেখ, এবং যক্ষবর্ণিত ভারতবর্ষের শৈল ও নদী, পুরী ও প্রান্তরের বর্ণনা দেখ।

এইসমস্ত গুণে কালিদাস বড়, কিন্তু ভবভূতিও নির্গুণ নহেন। মানবহৃদয়ের তীব্র তেজ, তীব্র দর্প, তীব্র দুঃখ বর্ণনায় ভবভূতি কালিদাসকে পরাস্ত করেন। মালতীমাধবে যেরূপ ভয়াবহ বর্ণনাসমূহ আছে, কালিদাসের কোনও কাব্যে সেরূপ নাই। সীতার বনবাসে যেরূপ দুঃখের পর অধিকতর দুঃখের উচ্ছ্বাসে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কালিদাসের কোনও কাব্যে সেরূপ নাই। সীতা ও রামের প্রগাঢ় প্রণয়, তাহাদের বিচ্ছেদে তীব্র

বেদনা, তাহার পর পূর্ব্বকথাস্মরণে রামচন্দ্রের হৃদয়ে শতবৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা, এসমস্ত যেরূপ ভবভূতির তীক্ষ্ণ লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, কালিদাসের লেখনীর সেরূপ ক্ষমতা কোথায়ও দেখা যায় না। শকুন্তলার শোকবর্ণনা সীতার শোক বর্ণনার সমতুল নহে; দুষ্মন্তের মনস্তাপ রামচন্দ্রের মনস্তাপের নিকট যৎসামান্য বোধ হয়।

ফলতঃ মনুষ্যহৃদয়ের তীব্র ও গভীর ভাবগুলি বর্ণনা করিতে ভবভূতি ভারতবর্ষে অতুল্য। যে গুণে ইংরাজী কবিদিগের মধ্যে শেক্ষপীয়র প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, সে গুণ ভারতকবিদিগের মধ্যে ভবভূতির অধিক পরিমাণে আছে। "ওথেলো" পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় যেরূপ অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়, উত্তর-রামচরিত পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় সেইরূপ ব্যাকুল ও অধীর হইয়া উঠে।

আমরা কবিদ্বয়ের দোষগুণ বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে কে বড় তাহা ছাঁদনাতলার সুন্দরীগণ নির্ণয় করিয়া লইবেন।

এখন কালিদাস ও ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা, হিন্দুদিগের অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করে। কবিগণ আকাশ হইতে পড়েন নাই, এই আমাদের হিন্দুসমাজেই বাস করিতেন, হিন্দু রাজাদিগের সভা ভূষিত করিতেন, হিন্দু শ্রোতাদিগকে তুষ্ট করিতেন। কোন্ সময়ের কি প্রকার সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ রাজার সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়।

কালিদাসের কথা আমরা পূর্ব্বে অন্যত্র লিখিয়াছি। খৃষ্টের অনুমান ৫৫০ বৎসর পর যখন বিক্রমাদিত্য রাজা, বিদেশীয় আক্রমণকারীগণকে পরাস্ত ও বিদূরিত করিয়া সিন্ধুতীর হইতে মগধ-

প্রদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, যখন উজ্জয়িনী-রাজধানীতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে জড় করিলেন, তখন সেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস সেই সভায় বিরাজ করিতেন। বিদ্যার আলোক, জ্ঞানের আলোক, কাব্যের আলোক সেইকালে যেরূপ ভারতক্ষেত্রে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, সেরূপ তাহার পর আর কখনও হয় নাই।

সেই সময়েই, কালিদাসের কিছু পূর্ব্বে, মগধদেশে পাটলীপুত্র নগরে জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং পৃথিবী যে প্রত্যহ ঘুরিতেছে এ কথাও তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়। আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন, "নৌকারোহী ব্যক্তি যেরূপ নদীর তীরের দিকে চাহিয়া মনে করে, তীরস্থ স্থির বস্তুগুলি পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, সেইরূপ পরিবর্ত্তমান জগতের লোকে মনে করে যে, আকাশের স্থির তারাগুলি প্রত্যহ সরিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ উদয় হইয়া অস্ত যাইতেছে।"

আর্য্যভট্টের পর বরাহমিহির নামক জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত কালিদাসের সময়ের লোক, এবং বিক্রমাদিত্যের সভার এক পণ্ডিত ছিলেন। পাঁচটী প্রাচীন সিদ্ধান্ত একত্রিত করিয়া তিনি "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" * নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং "বৃহৎ-

---

* এ পুস্তকখানি সম্প্রতি কাশীধামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের নিকট আমি এ গ্রন্থ প্রথমে দেখি।

সংহিতা" নামক আর একটী গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা "এসিয়াটিক্ সোসাইটী" দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃহৎ সংহিতায় নানা কথা আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের কথাও আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক নানা হিন্দু দেব, অর্থাৎ রাম, বলি, বিষ্ণু, বলদেব, সুভদ্রা, সাম্ব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব ও পার্ব্বতী, বুদ্ধদেব, সূর্য্য, লিঙ্গ, যম, বরুণ, কুবের এবং গণেশের কথা, এবং তাঁহাদিগের প্রতিমাগঠনের নিয়মাদি লিখিয়া গিয়াছেন।

বরাহমিহিরের পর ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন, এবং "ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই ত গেল জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা। অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ আলোচনা হইতেছিল। বৈয়াকরণ বররুচি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন, কেন না, নাটকাদিতে তখন প্রাকৃত ভাষার চলন হইতেছিল। অমরসিংহ তাঁহার চিরস্মরণীয় অভিধান লিখিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং বুদ্ধগয়াতে রচিত সুন্দর মন্দির তাঁহারই নির্ম্মিত এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে। ধন্বন্তরী বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত উজ্জয়িনীর সভা আলোকিত করিয়াছিলেন। পরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্যের সেই পণ্ডিতমণ্ডলীবেষ্টিত সভায় যখন কালিদাসের শকুন্তলা অভিনীত হইত, অথবা জগতে অতুল্য বর্ণনাকাব্য মেঘদূত যখন মেঘগম্ভীর শব্দে পঠিত হইত, তখন ভারতবর্ষের গৌরবের দিন, ভারতবাসীদিগের কি সুখের দিন ছিল!

ভারবীও সেই সময়ে, কি তাহার কিছু পরে "কিরাতার্জ্জুনীয়" রচনা করেন—কিন্তু তাঁহার দেশকাল ঠিক করা যায় না।

খৃষ্টের ৬১০ খৃষ্টাব্দ পরে হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নামক আর

একজন প্রসিদ্ধনামা সম্রাট্ ভারতসাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে মগধপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং কান্যকুব্জ তাঁহার রাজধানী ছিল।

হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তখন বিশেষ দ্বেষভাব ছিল না। এখন যেমন অনেক হিন্দু বৈষ্ণব হয়, তখন সেইরূপ অনেক হিন্দু বৌদ্ধ হইত। বৈষ্ণবগণ যেমন সংসারত্যাগী হইয়া বৈরাগী হইতে পারে, অথবা সংসারে বাস করিতে পারে, বৌদ্ধগণ সেইরূপ সংসারী হইয়া থাকিত, অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুকী হইয়া মঠে বাস করিত। ভারতবর্ষে তখন অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং মগধদেশে নালন্দার যে প্রসিদ্ধ মঠ ও বিনয় বিদ্যালয় ছিল জগতে সে সময়ে সেরূপ বিদ্যামন্দির ছিল না। একজন চীন ভ্রমণকারী সেই কালে নালন্দার মঠে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "এখানে সমস্ত দিনে শাস্ত্রীয় প্রশ্নোত্তর শেষ হয় না, প্রাতঃসন্ধ্যা এখানে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক চলিতেছে, বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরকে শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতেছে"। এই চীন ভ্রমণকারী বহুবৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান নগর দর্শন করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি হিন্দুদিগের দেবমন্দির এবং বৌদ্ধদিগের মঠ ও বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। স্বয়ং সম্রাট শিলাদিত্য বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তিনি কান্যকুব্জে যে একটী বৌদ্ধ মহাপূজা সম্পন্ন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বিংশ জন রাজা আহূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগণ অনেকেই হিন্দু ছিলেন, কামরূপ বা আসামদেশের রাজা খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তথাপি বৌদ্ধ পূজায় উপস্থিত হইতে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না, কেন না, সেকালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী অঙ্গমাত্র ছিল।

এই পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী নাটক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। সম্রাটের নামে এ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, "ধাবক" নামক তাঁহার একজন সভাস্থ কবি নাটকখানি রচনা করিয়া দিয়াছিল। সে যাহা হউক নাটকখানি মধুর ও সুললিত তাহার সন্দেহ নাই। তবে কালিদাসের অতুলনীয় কবিত্বশক্তি এ নাটকে দৃষ্ট হয় না।

ভর্ত্তৃহরির শতকগ্রন্থগুলিও এই সময়ে রচিত হয়। এবং আমরা যাহাকে ভট্টিকাব্য বলিয়া জানি, সে কাব্যখানিও কবি ভর্ত্তৃহরির রচিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "ভট্টি" শব্দটা "ভর্ত্তৃ" শব্দের রূপান্তরমাত্র।

শিলাদিত্যের সময়ে পদ্যরচনারও অভাব ছিল না। প্রাচীন পঞ্চতন্ত্রের সরল ও সুললিত গদ্য ছাড়িয়া এ সময়ের লেখকগণ একটু জাঁকাল রকম গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। "দশকুমার-চরিত"-লেখক দণ্ডী বোধ হয় শিলাদিত্যের রাজ্যকালেও জীবিত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। "কাদম্বরী"-রচয়িতা বাণভট্ট শিলাদিত্যের একজন সভাসদ ছিলেন, এবং তিনি "হর্ষচরিত" নামক শিলাদিত্যের একটী জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছু পরে সুবন্ধু "বাসবদত্তা" রচনা করেন।

পাঠক একবার শিলাদিত্যের সময়ের গৌরব অনুভব করিয়া দেখুন। যে সময়ে ভারতক্ষেত্রের সমগ্র সম্রাট আহূত হইয়া কান্যকুব্জের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে সৌহৃদ্য ছিল, এবং নগরে নগরে হিন্দু দেবালয় ও বৌদ্ধ মঠ ও বিহার বিরাজ করিত, যে সময়ে উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং নালন্দা প্রভৃতি

স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা হইত, যে সময়ে সম্রাটের রচিত রত্নাবলী রাজসভায় অভিনীত হইত, ভট্টিকাব্য পাঠ করিয়া বালকগণ সুখে ব্যাকরণ শিক্ষা করিত, এবং দণ্ডী ও বাণভট্টের বিশাল ও সগর্ব্ব সংস্কৃত ভাষা সভাপণ্ডিতদিগের মন পুলকিত করিত,—ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন স্মরণ করুন।

তাহার পর ৭০০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা নামে একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সভায় একজন মাত্র প্রসিদ্ধ কবি ছিল, কিন্তু সেই এক কবি জগদ্বিখ্যাত ভবভূতি! বিদর্ভদেশে ভবভূতির জন্ম, এবং বিদর্ভদেশের মন্ত্রীপুত্র মাধবই তাঁহার রচিত "মালতীমাধব" নামক গ্রন্থের নায়ক। কিন্তু কান্যকুব্জ তখন ভারতবর্ষের রাজধানীস্বরূপ, সুতরাং ভারতবর্ষের কবিশ্রেষ্ঠ কান্যকুব্জে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তথায়ও ভবভূতি চিরকাল থাকিতে পারিলেন না। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, কান্যকুব্জরাজ পরাস্ত হইলেন এবং বিজেতা ললিতাদিত্য কান্যকুব্জের প্রধান রত্ন ভবভূতি-কবিকে কাশ্মীর-দেশে লইয়া গিয়া মহাদরে তাঁহাকে রাজসভায় স্থান দান করিলেন। এইরূপে সরস্বতীর প্রভাবে কবি ভবভূতি বিদর্ভ হইতে কান্যকুব্জে, এবং কান্যকুব্জ হইতে কাশ্মীরদেশে নীত হইয়াছিলেন।

আমরা এক্ষণে কালিদাস ও ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কতকটা জানিতে পারিলাম। ৫৫০খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫০খৃষ্টাব্দ এই দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান কবি ও পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা জানিলাম। বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য ও যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্যের বিষয় জানিলাম। বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ও শাস্ত্রালোচনার কথা জানি-

লাম। উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জ, নালন্দা ও কাশ্মীরের গৌরবের কথা শুনিলাম। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত, কালিদাস, অমরসিংহ, বররুচি ও ভারবি, শ্রীহর্ষ, ভর্ত্তৃহরি, দণ্ডী ও বাণভট্ট, এবং বিদর্ভদেশবাসী অতুল্য কবি ভবভূতির কথা জানিলাম।

ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস যদি এইরূপে শিখিতে পারি তবে আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। হিন্দুসাহিত্য ও সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস যদি এইরূপে পড়িতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল। নতুবা কেবল সোমনাথের মন্দিরের ধ্বংস, বা পলাশীর যুদ্ধের কথাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে না।

মুসলমান সমাজ।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষার একটা শুভ ফল দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অল্পে অল্পে ধর্ম্মকে প্রাচীন আরবীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথাসকল হইতে মুক্ত করিয়া মহম্মদের সদুপদেশ ও সাধু সংকল্পের অনুবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কোরাণে নানা কথা আছে; কেবলি যে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ তাহা নহে, তৎকালীন আরব সমাজের উপযোগী রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম, আইনকানুন সম্বন্ধে বিস্তর প্রসঙ্গ—আবশ্যক অনুসারে মহম্মদ যখন যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা-গান এবং স্বদেশীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠাই মহম্মদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এবং কোরাণের প্রত্যেক সুরায় প্রথমেই তিনি দয়াময় ঈশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন। মহম্মদের

এই এক পাষাণ দেবতাকে স্থানচ্যুত করা ভিন্ন তাহার প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই। পাষাণখণ্ডের সহিত সে সকল দুর্নীতি নিয়ত জড়িত হইয়া ধর্ম্মেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কদাচার দেবতার অনুমোদিত, সুতরাং সম্যক্ প্রতিপালনই বিধি। তাই প্রথমেই মহম্মদ আল্লা আকবরের নামে লোকসকলকে জড়-দেবতার রোষানলভয় হইতে মুক্ত করিলেন—এবং তাহার পর অল্পে অল্পে দেশকালপাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজ গঠন করিতে লাগিলেন। অনেকাংশে সফলও হইলেন। কিন্তু আরব-সমাজের সমস্ত কুপ্রথা উন্মূলিত হইল না; হইতে পারে যে, মহম্মদের আদর্শ তাদৃশ উন্নত ছিল না, অথবা আরব-সমাজের অবস্থা নূতন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল না। নব্য শিক্ষিত মুসলমানেরা শেষোক্ত কথার উপরেই বিশেষ ঝোঁক দেন—এবং তৎকালীন আরব-সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না। আর মহম্মদও যখন এই সমাজের মধ্য হইতেই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট বর্ত্তমান কালোচিত উন্নত আদর্শ আশা করাও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে।

মহম্মদ সম্বন্ধে খৃষ্টান লেখকদিগের অনেকের গ্রন্থে এই এক প্রধান দোষ দেখা যায়। তাঁহারা মহম্মদকে তাঁহার দেশকাল হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন এবং বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নত আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া তাঁহাকে শয়তানের এক ধাপ উচ্চে আসন দিয়া থাকেন। মহম্মদ স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেন নাই, বহুবিবাহ এবং দাসপ্রথা রহিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তিনি স্বর্গেও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহজীবনে বহুদারপরিগ্রহ ও আবশ্যকমত যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা

আপন পার্থিব স্বভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব তাঁহার গৌরব কিসের!

কিন্তু মহম্মদ মানুষই ছিলেন। এবং আপনাকে মানুষ বলিয়াই তিনি প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে খৃষ্টের যে স্থান, মুসলমান ধর্ম্মে মহম্মদের সেরূপ স্থান নহে। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা, মাতার নাম আমিনা। অতি শৈশবেই মহম্মদ পিতৃমাতৃহীন হয়েন এবং পিতৃব্যের স্নেহে লালিতপালিত হইয়াই তিনি মানুষ হইয়া উঠেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে খদিজা নাম্নী এক ধনী বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এইসময় হইতেই মহম্মদের কপাল ফিরিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার মনে যখন যে কথা উঠে, তিনি খদিজাকে শুনান, এবং খদিজাও তাঁহার কথার সম্যক্ মর্ম্মগ্রহণ করেন। এইরূপে পত্নীর সহমর্ম্মিতায় তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া জায়া সমভিব্যাহারে এক নিভৃত পর্ব্বতগুহায় অবস্থিতি করিয়া তিনি ধ্যানধারণায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইলেন; মহম্মদের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সৃষ্টির সকল পদার্থেই তিনি ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিলেন; এবং নিভৃত পর্ব্বতগুহা ছাড়িয়া সজন লোকালয়ে প্রচার করিতে বাহির হইলেন—"আল্লা আকবর" ঈশ্বর মহান্ এবং "ইস্‌লাম" আমরা তাঁহারই আজ্ঞাবহ।

ইহাই মহম্মদের গৌরব। যাহারা ঈশ্বরের নাম শুনে নাই, তিনি তাহাদিগকে সেই অভয়-নাম শুনাইলেন, যাহারা অবিশ্বাসী ছিল তাহাদিগকে বিশ্বাস দিলেন, যাহারা দীন দুঃখী আতুর, তাহাদিগকে বলিলেন—ঈশ্বর ন্যায়বান্ এবং দয়ালু, তোমরা নিরাশ হইও না। সেই নিখিলনির্ভরের নামে মন্দিরে মন্দিরে

পাষাণ-দেবতাসকল বিচলিত হইল এবং পাষাণখণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল তাহার মধ্যে একটা প্রবল বিপ্লব সূচিত হইল।

তাই বলিয়া যাহারা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না এবং পিতৃপুরুষের বিধবাকে বলপূর্ব্বক ভোগ্যারূপে নিযুক্ত করিয়া পৌরুষ অনুভব করিত, তাহারা সহসা স্ত্রীজাতির প্রতি পশ্বাচরণ ছাড়িয়া দেবতার ন্যায় ব্যবহার সুরু করিল না, এবং অভ্যস্ত দাসপ্রথা ত্যাগ করিয়া দুরাচারেরা ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীন মানবের অধিকারও ফিরাইয়া দিল না। কিন্তু মহম্মদের যত্নে বিবাহবিধি অনেক সংস্কৃত হইল, অবগুণ্ঠনবতী কুলরমণীর প্রতি পথে-ঘাটে সামান্যা দাসীর ন্যায় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, এবং ক্রীতদাসদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ঈশ্বরের রাজ্যে কখনও নিষ্ফল নহে—এই সাধু উপদেশ প্রচারিত হইল। ইহার অধিক কিছু করা মহম্মদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, এবং বোধ করি, এতদধিক তিনি চেষ্টাও করেন নাই।

সেজন্য মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দোষারোপ করা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে খৃষ্টান জগতের সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির অবস্থা যে বড় ভাল ছিল এমন নহে, এবং যে দাসপ্রথার ধূয়া ধরিয়া ইংরাজ লেখকেরা মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আত্যন্তিক অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, খৃষ্টান জগতে খৃষ্টান পাদ্রিগণের বিশেষ সহায়তায় সেই নিষ্ঠুর দাসব্যবসায় ধর্ম্মানুগত বলিয়া গণ্য হইতেও ত্রুটি হয় নাই। এ সকল বিষয়ে সভ্যতার উন্নতির সহিত মানব-সমাজের আদর্শ ক্রমে উন্নত হইতেছে। সংস্কারকেরা যুগে যুগে তখনকার উপযোগী বিধানসকল প্রচার করেন মাত্র; তাহা কালাতীত নহে এবং অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে। কিন্তু এই সকল

কালোপযোগী সমাজসংস্কার তাঁহাদের প্রচারিত কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মূল সত্যের সহিত জড়াইয়া ক্রমে যখন সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন ধর্ম্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখিয়া লোকে তাহার চতুষ্পার্শ্বের সভ্যতা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, এবং কাল যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ধর্ম্ম সহস্র প্রাচীন কুসংস্কার ও দুষ্ট প্রথার আবরণে অত্যন্ত হীন এবং হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

ধর্ম্মের এরূপ অধঃপতন নিবারণের একমাত্র উপায় জ্ঞানের অনুশীলন। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর যে অংশে মহম্মদের আবির্ভাব, সেখানে বহুকাল ধরিয়া অজ্ঞানের অপ্রতিহত একাধিপত্য চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার সেরূপ বিস্তার হয় নাই; সামান্য-শিক্ষিত মৌলবীগণ ধর্ম্ম এবং স্বার্থ একত্র জুড়িয়া দম্ভসহকারে হিংস্র গোঁড়ামি প্রচার করে মাত্র; এবং ভাবটুকু ছাড়িয়া কোরাণের অক্ষর-মাহাত্ম্য লইয়া মানবে মানবে নিত্য দলাদলি ও মনোমালিন্য জন্মিতে থাকে।

বর্ত্তমান শিক্ষা ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগকে ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। দেখাইতেছে যে, অধিকাংশ খাতনামা কোরণ-ব্যাখ্যাতা কোরাণকে যে হিসাবে দেখিয়াছেন, কোরাণ সে হিসাবে দ্রষ্টব্য নয়। কোরাণে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোকের মধ্যে দুই শতের অধিক আইন-কথা নাই, এবং তাহাও বারো-আনা ভাগ দু'একটি খণ্ড খণ্ড কথা, দুই তিন কি চারি কথার সমষ্টি, বা গুটিকতক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ পদ—নানান্ জনে তাহার নানারূপ মনগড়া ব্যা[illegible]রিয়া থাকেন। মহম্মদের ত আইন-প্রণয়ন উদ্দেশ্য ছিল না, তবে বিশেষ দমনযোগ্য কতকগুলি সামাজিক কদাচার সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি নিষেধ-বিধি জারী করিয়াছেন মাত্র।

আর কতকগুলি পালনবিধিও আছে—তাহা কতক সে সমাজে যেরূপ বিধি প্রচলিত ছিল, কতক বা প্রচলিত বিধিরই অনুবিস্তর সংস্কার। বর্ত্তমান শিক্ষা আরও দেখাইতেছে যে, কোরাণের মূলভিত্তি কোথায় এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অনুগত আচার ব্যবহার কোরাণবিরুদ্ধ না হইতেও পারে। মুসলমান ধর্ম্ম যদি মহম্মদের বহু পরকালবর্ত্তী খলিফগণের সংগৃহীত স্তূপাকার সত্য মিথ্যা লোককথা এবং জনশ্রুতির সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া কেবলমাত্র কোরাণগঠিত হইত তাহা হইলেই বর্ত্তমান কালের সহিত তাহার বিরোধ মিটিয়া আসিত। কথায় দাসত্বই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

মহম্মদের এক প্রধান গুণ ছিল, তিনি মানবকে তাহার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনাপূর্ব্বক কাজ করিতে পরামর্শ দিতেন, কেতাবের গুটিকতক অধ্যায়ের মধ্যে হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে জড় করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। গল্প আছে, মাআজকে য়েমেন প্রদেশে নিজ প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইবার সময় মহম্মদ প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, লোকসকলকে তিনি কিরূপে বিচার করিবেন? মাআজ উত্তর করেন, "ঈশ্বরের গ্রন্থ অনুসারে আমি তাহাদিগের বিচার করিব।" মহম্মদ বলিলেন, "গ্রন্থে যদি সকল কথা না পাওয়া যায়?" উত্তর—"আমি প্রেরিত পুরুষের নজীর ধরিয়া কাজ করিব।" "যদি নজীর না থাকে?" "তাহা হইলে নিজের বিবেচনা খাটাইবার চেষ্টা করিব।" মহম্মদ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

নিজেকে অভ্রান্ত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা মহম্মদের আদৌ ছিল না—আরবের হিতার্থে এবং পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য জানিয়া তিনি যাহা কিছু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। ইমাম মুস্লিম মহ-

ম্মদ সম্বন্ধে একটি গল্প বলেন যে, একদা মদিনার পথে কতকগুলি লোককে খর্জ্জুরবৃক্ষে পরাগসেক করিতে দেখিয়া মহম্মদ তাহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। সে বৎসর ফল ভাল হইল না। লোকেরা মহম্মদকে গিয়া বলিল যে, তাঁহার কথা শুনিয়াই তাহাদের এই দুর্দশা হইয়াছে। মহম্মদ বলিলেন, "আমি সামান্য মনুষ্যমাত্র—নির্ভুল নহি। ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদিগকে যাহা বলিব তোমরা তাহাই শুনিও; অন্যান্য বিষয়ে আমার কথার মূল্য তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক নহে।"

কিন্তু মুসলমানেরা এক্ষণে মহম্মদকে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়াই মনে করেন। এবং খৃষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা যেমন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা রচনা করিয়াছেন, মুসলমান মৌলবীরাও সেইরূপ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার নামে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া রটনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অনেক সময় খলিফদিগের দুর্দ্দান্ত যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিবার জন্যও মহম্মদের নাম দিয়া অনেক অসম্ভব অসঙ্গত মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে। অশিক্ষিত লোকেরা ত আর তাহা বুঝে না। এবং য়ুরোপীয় লেখকেরা সহৃদয়তাভাবে যত্নপূর্ব্বক এবিষয়ে অনুসন্ধানও করেন না।

উদাহরণ যথেষ্ট আছে। খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা সাধারণতঃ যে সকল দুষ্টাচার মহম্মদের বিশেষ অনুমোদিত বলিয়া মনে করেন, কোরাণে দেখা যায়, মহম্মদ তাহার বিরুদ্ধে বিধি দিয়াছেন। যেমন, বহুদারপরিগ্রহ। সুরা নেসা নামক অধ্যায়ে বিধি আছে, পুরুষ ইচ্ছা করিলে দুই তিন অথবা চারিজন নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, চারিজনের

প্রতি তিন সমান ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে একাধিক-পত্নীগ্রহণ না করাই শ্রেয়। কোরাণের ঐ সুরাতেই অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীগণের সম্বন্ধে সম্যক্ ন্যায়াচরণ মানবের সাধ্যাতীত। অতএব কোন্ বিধি অনুসারে বহুদার-পরিগ্রহ কোরাণসম্মত বলিয়া গণ্য হয়?

কিন্তু বিধি না থাকিলেও নজীর মহম্মদ স্বয়ং। ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমানের অনেকে ইহার যে কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন, "মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ"-শীর্ষক প্রবন্ধে মৌলবী চিরাগ আলির মত সমালোচনাকালে আমরা তাহার আভাসও দিয়াছি। এখানে আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা যাইতে পারে।

তিপ্পান্ন বৎসর বয়স অবধি মহম্মদ বরাবর একপত্নীক ছিলেন, এবং শেষ বয়সে অনেকগুলি বিবাহ করিলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত খদিজাই তাঁহার হৃদয়েশ্বরী। তিনি যাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিন জন তাঁহার আবিসীনিয়াপ্রবাসী অনুচরদিগের বিধবা এবং দুইজন মদিনার যুদ্ধে হত দুইটি শিষ্যের স্ত্রী। বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত ইহাদিগকে অন্য কোনও উপায়ে আশ্রয়দান অসম্ভব ছিল।

আরবদিগের মধ্যে এখনও এই প্রথা কতকটা প্রচলিত আছে। বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা আরবেরা একটা পারিবারিক কর্ত্তব্যের হিসাবে দেখে। হয়ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুইটি শিশুসন্তান এবং একটি নিরাশ্রয়া বিধবাকে রাখিয়া অকালে লোকান্তর গমন করিলেন। বিধবাকে পরহস্তে সমর্পণ করিলে শিশুদিগকে মাতৃহীন করা হয়, কিম্বা বিধবার সঙ্গে শিশুদিগকে পিতৃকুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হয়—এস্থলে পরিবারভঙ্গ

নিবারণার্থে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সকল দিক রক্ষা করে। সমাজের অসভ্যাবস্থায় ইহাপেক্ষা সুচারু ব্যবস্থা দুর্লভ।

এখন, মহম্মদকে অনুচরদিগের বিধবাজন রক্ষার্থে বিবাহ করিতে হইয়াছিল কেন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সে সময়ে আরবের যে অবস্থা, তাহাতে বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা নিন্দনীয় হইত, এবং শিথিল আরবপ্রকৃতি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখিলে আপন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের একটা অবসর পাইত।

কিন্তু ভোগ্যা-দাসীরক্ষণ প্রথা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে বহুবিবাহ নিষেধ করিলেও আরব-সমাজের দুরাচার সংশোধিত হইল এমন বলা যায় না। মহম্মদ সেইজন্য নানা উপায়ে সে পথেও কণ্টক আরোপ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কোরাণে ব্যবস্থা দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যার পাণিগ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশ্বাসিনী দাসীকে বিবাহ করিবে। এবং অব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগকে যৌতুক প্রদান করিবে। কিন্তু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও যদি তাহারা ব্যভিচারপরায়ণা হয়, তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা স্ত্রীর অর্দ্ধেক শাস্তি বিধি। তোমাদের মধ্যে যাহারা কুকার্য্যের ভয় করে তাহাদেরই জন্য এই বিবাহ। ধৈর্য্যধারণ করিলে তোমাদেরই মঙ্গল। ঈশ্বর জিতেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। কিন্তু যাহারা দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহারা বিপথে চালিত হয়।—এইরূপে দাসীবিবাহের বিধি দিয়া এবং বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ গর্হিত বলিয়া মহম্মদ ভোগ্যারক্ষণ নিষেধ করিলেন। এবং দাসীর পাণিগ্রহণ অপেক্ষা ধৈর্য্যধারণই শ্রেয় এই কথায় তাঁহার মত আরও ভালরূপ ব্যক্ত হইল। শাসনও রহিল যে, কামনার অনুসরণ করিতে চাও কর, কিন্তু ও পথে কল্যাণ নাই।

কোরাণে যে, ভোগ্যারক্ষণের অনুকূলে কোনও কথা নাই তাহা নহে। সুরা মারেজ নামক অধ্যায়ে মহম্মদ স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ভিন্ন অপরার প্রতি আসক্তি নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং

দাসীরক্ষণ মহম্মদের অনুমোদিত নহে ত কি? কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানেরা বলেন যে, মহম্মদ ক্রমে ক্রমে আরব-সমাজ সংস্কার করিয়াছেন—প্রথমে তিনি এই ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন, কারণ, আরব-সমাজের দারুণ ব্যভিচারস্রোত রোধ করিবার তখন আর কোনও উপায় ছিল না; ক্রমে সময় বুঝিয়া দাসীরক্ষণ নিবারণের জন্য দাসীদিগকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে ধৈর্য্যাবলম্বনের মহত্ত্বটুকু উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না; এবং পরে বহুনারীর প্রতি সমান ন্যায়াচরণ অসম্ভব বলিয়া বহুদারপরিগ্রহও প্রকারান্তরে নিষেধ করিলেন। দাসীরক্ষণ মহম্মদের আদৌ অনুমোদিত নহে। সুরা নূরে ক্রীতদাসদাসীদিগের বিবাহ দিবার জন্য তিনি স্পষ্টই আদেশ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে অবিবাহিতদিগকে চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যও উপদেশের ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু হইলে হইবে কি? সহস্র কূটতর্ক বাহির করিয়া মুসলমানেরা পালনচ্ছলে বারবার মহম্মদের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবং লঙ্ঘিত বিধি প্রচলিত আচারের প্রভাবে ক্রমে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ লেখকেরা মুসলমানদিগের প্রতি যে সকল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করেন, মুসলমান-প্রচলিত ব্যবস্থাই তাহার কারণ। লোকাচার এবং ইদানীন্তন আইনে মিলিয়া মহম্মদকে একেবারে আড়াল করিয়াছে। বহুবিবাহ নিবারণ, দাসীরক্ষণ প্রথার উচ্ছেদ, ক্রীতদাসদিগের দুরবস্থা মোচন, যথেচ্ছ দারপরিত্যাগ নিষেধকরণ প্রভৃতি যে সকল শুভানুষ্ঠানের তিনি সূচনা করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান-জগতে তাহার একটিও সম্যক্ রক্ষিত হয় নাই। অজ্ঞানের আধিপত্যে তাহার সম্ভাবনাও বিরল।

কিন্তু একটা কথা সহজেই মনে হয়। সমস্ত মুসলমান-জগৎ জুড়িয়া চিরদিন যদি অজ্ঞানই নিষ্পরোয়া আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, তবে সে অন্ধকার মরুরাজ্যে মানবের হৃদয়মথিত এক অপূর্ব্ব সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল কোথা হইতে? তাহাতে যে মধুর প্রেমগীতি ধ্বনিত হইয়াছে, সে দেবগাথা পৃথিবীতে দৈবাৎ শুনা যায়, যে করুণ উদারতা এবং নির্ভীক সহৃদয়তা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া উঠে নাই—তাহা

মানবেরই করুণ হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাস। এবং এখনও সেই সুফী কবিগণের রচিত গীত গাহিয়া মুসলমান ভক্তহৃদয় নির্জ্জনে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার নিগূঢ় যোগসাধন করে। ইহা কি কখনও অজ্ঞানের ফল হইতে পারে?

বোগ্দাদের খলিফেরাও যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, আরব্যোপন্যাসের কল্যাণে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবং মুসলমান-জগতে খলিফদিগের জ্ঞানচর্চ্চার সুফলও কিছু কিছু ফলিয়াছিল। খলিফ আলমামুন পাঁচ শত মন স্বর্ণ দিয়া গ্রীক সম্রাটের নিকট তাঁহার সভাপণ্ডিত লিওকে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়া মুসলমান ছাত্রদিগকে কিছুদিন যদি দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, খলিফ আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিবেন। দামাস্কাসে মুসলমান-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন পণ্ডিত খৃষ্টান। ইহাতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যে অকপট সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জ্ঞানালোচনারই ফল। জ্ঞানের মত গোঁড়ামির আর অমোঘ ঔষধ নাই।

কিন্তু এ জ্ঞানালোচনা অবিচ্ছেদে বরাবর চলে নাই। প্রথমতঃ, খলিফেরা সকলে সমান ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিগ্রহাদিজনিত রাজনৈতিক বিপ্লবে দীর্ঘকাল সমভাবে জ্ঞানচর্চ্চার বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আরও এক কথা, এখন যেমন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, তখন কেবল পণ্ডিতগণের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। এবং পণ্ডিতেরা অনেক সময় কেতাবের মর্ম্ম সাধারণের নিকট সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন।

যাহাই হউক্, এ সকল ত্রুটি থাকিলেও, মুসলমানদিগের দ্বারা পৃথিবীর যে অনেক হিতসাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এবং বিদেশী লেখকেরা মুসলমান-জগতে নিত্য অত্যাচার অবিচারের ধারাবাহিক উল্লেখ করিলেও, সুশাসন, শৃঙ্খলা এবং সহৃদয়তা মুসলমান-ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে এ কথাও মানিতে হয়। মুসলমান-শাসনও যে ভাল হইতে পারে স্পেনের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। মূরদিগের রাজত্বকালে স্পেনের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বহু দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা স্পেনে

বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিত; বড় বড় অধ্যাপকেরা জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, এবং লোকের মুখে মুখে ভাল ভাল কবিতা শুনা যাইত। ইহা ভিন্ন, স্থাপত্য বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল বলা বাহুল্য। মূরদিগের শাসনসময়ে স্পেন য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ গুটিকতক প্রাচীন নজীর কোরাণের অনুশাসনের সহিত যুক্ত হইয়া নব্য মুসলমানদিগকে ভরসা দিতেছে যে, মুসলমানেরা পৃথিবীর অভিশপ্ত সন্তান নহে, তাহারাও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত সৎকার্য্যের অধিকারী এবং সাধু অনুষ্ঠানে সক্ষম; একবার সংঘভাবে আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ফল সুনিশ্চিত। যে যাহা বলে বলুক, ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই হইবে, প্রাচীন কুসংস্কার এবং অজ্ঞানান্ধকারে যাহা চাপা পড়িয়াছে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে এখন পথও সুগম। সুতরাং এই এক মহা অবসর।—আরবের মরুপ্রান্তে মহম্মদ যে আল্লা আকবর ধ্বনি তুলিয়াছিলেন এইবারে তাহা সফল হউক্।

প্রসঙ্গ-কথা।

আজকাল আমাদের ছাত্রবৃন্দ নীতিশিক্ষা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি, বক্তৃতা, আর চটি বইয়ের এত ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে যে, এই কয়টি উপাদানের মাহাত্ম্যে নীতির উৎকর্ষসাধন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনতিবিলম্বে আজকালকার বালকগণ এক একটি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রূপে অভিব্যক্ত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে; আর যদি এই সুফল ফলিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় ত সে কেবল ছাত্রচরিত্রে নীতির অভাবের আধিক্যবশতঃ, চটি বইগুলার ব্যর্থতাবশতঃ নয়।

ছাত্রদের নীতি লইয়া যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সহজে মনে হইতে পারে যে, হঠাৎ বুঝি এদেশের যুবাদের মধ্যে দুর্নীতির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, আমরা সকলে মিলিয়া "জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট" না সাজিলে আর চলেনা। লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর সার্কুলার জারি করিতেছেন, নন্-পোলিটিকাল স্বদেশহিতৈষীরা কমিটি করিতেছেন, কোন কোন কলেজের প্রিন্সিপাল "মোরালিটি"তে পরীক্ষা প্রচলিত করাইবার চেষ্টায় আছেন, আর অনেকেই নিজের নিজের সাধ্যমত "মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক্" প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।

ব্যাপারটা দেখিয়া একটু হুজুকের মতন মনে হয়। শুদ্ধমাত্র "মর‍্যাল্ টেক্স্‌ট্‌বুক্" পড়াইয়া নৈতিক উন্নতিসাধন করা যায় এ কথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এপ্রকার অসীম বিশ্বাসকে সকৌতুকে প্রশংসা করা ছাড়া আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা। এরকম বিশ্বাসে পর্ব্বত নড়ান যায়, দুর্নীতি ত সামান্য কথা। "চুরি করা মহাপাপ," "কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না" এই প্রকার বাঁধি বোল দ্বারা যদি মানুষের মনকে অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে ত ভাবনাই ছিল না। এ সব কথা মান্ধাতার এবং তৎপূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত; ইহার জন্য নূতন করিয়া টেক্স্‌ট্ বুক্ ছাপাইবার প্রয়োজন নাই।

দুই একটি টেক্সট্‌বুক দেখিয়া মনে হয় যেন বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য নীতি শব্দটা একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই আবশ্যক। আমাদের ছাত্রদের চরিত্র কি এই বিষয়ে এতই খারাপ যে, এই একটিমাত্র বিষয় লইয়াই এত বেশী আলোচনা করা দরকার? রাজসাহী কালেজের কোন একজন প্রোফেসর "ইন্দ্রিয়-সংযম"-নামক এমন একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন যে, আমি ত ওরকম পুস্তক বালকদের হস্তে দিতে সঙ্কোচ বোধ করি। বালকবালিকা ও মহিলাদের পাঠ্য মাসিকপত্রে এরকম পুস্তকের সম্যক সমালোচনা করা অসম্ভব।

একটিমাত্র বিষয় অনেক দিক হইতে অনেক রকমে নাড়াচাড়া করিয়া প্রোফেসর মহাশয় দেখাইবার মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সকলেই দূষণীয় জ্ঞান করে। তিনি কি মনে করেন যে, যাহারা সমাজের ও আত্মীয়স্বজনের মত উপেক্ষা করিয়া গোপনে দূষণীয় কার্য্যে রত থাকে তাহারা চটি বইটি পড়িবামাত্র চরিত্রসংশোধনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে? আর যাহাদের এ সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নিকট এ সকল বিষয় আলোচনা করা কি সঙ্গত কিম্বা প্রয়োজনীয়? এই বইখানি আবার রাজসাহী কালেজের নিয়ম অনুসারে সকল ছাত্রই পড়িতে ও শুধু পড়িতে নয় কিনিতে বাধ্য।

আমার কোন এক তীক্ষ্ণজিহ্ব বন্ধু তাঁহার এক বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, আজকাল নীতিশিক্ষার অর্থ দুইটি মাত্র; (১) রাজকর্ম্মচারীদিগকে সেলাম করা এবং (২) সংস্কৃত কাব্যের কোন কোন বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া। প্রথমটি কালেজে কিম্বা স্কুলে শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই, স্কুল ছাড়িয়া একবার উমেদারী ধরিলেই শিক্ষাটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। সংস্কৃত কাব্যের কোন কোন বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া কোন কোন সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু নিদান পক্ষে সে বর্ণনাগুলা তবু ত কবিতা বটে। এসব প্রসঙ্গ কাব্য হইতে ছাঁটিয়া দিয়া ময়্যাল টেক্সট্‌বুক-এ নীরস শুষ্কভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। বালকদের পাঠ্যপুস্তকে এরকম পাঁক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার কাছে ত অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়।

নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধিবোল দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে "কাপি-বুক মোয়ালিটি" বলে, তাহার দ্বারা এ পর্য্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই। নীতিগ্রন্থে শুধু বলিয়া দেয় যে, এটা পাপ, ওটা পুণ্য; ইহা পাপপুণ্যের একটা ক্যাটালগ্‌স্বরূপ। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় ইহা চলনসইরকম জানিবার নিমিত্ত ক্যাটালগের আবশ্যক করে না।

দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের প্রশংসা ও নিন্দা দ্বারা যে সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, বস্তুতঃ সেই সব সংস্কার দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হয়। কিন্তু ছেলেরা বাড়িতে যে সব দৃষ্টান্ত দেখে, তাহা হইতে নৈতিক উন্নতিসাধনের কোনই আশা নাই। ছেলে স্কুলে শুষ্ক নীরস নীতিগ্রন্থে পড়িয়া আসিল যে, মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ; এবং বাড়ি আসিয়া দেখিল যে, তাহার বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো, সকলেই মুসলমান বাবুরচির রান্না দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবের মাংস গোপনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বাহিরে এপ্রকার আচরণ করিতেছেন যেন কখনও নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। সেই স্থানে আবার যদি সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়া থাকে ত সেই বালক দেখিবে যে, তাহার অখাদ্য-ভোজী বাপ, ভাই, জ্যাঠা খুড়ো সকলেই এই ধর্ম্মসভার সভ্য; এবং ধর্ম্মসভার নিয়মাবলীর মধ্যে এমন নিয়মও দেখিবে যে, যাঁহারা "প্রকাশ্য" খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ অবৈধ আচরণ করেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন। কোন সরলমতি পাঠক কি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে এই বঙ্গদেশে এইরূপ ধর্ম্মসভার ও এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব আমার কল্পনাজাত নহে?) বালকটি নিতান্ত নির্ব্বোধ হইলেও একথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উপরোক্ত নিয়মটির একমাত্র অর্থ সম্ভব—যাহা করিতে হয় লুকাইয়া কর; প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিও, আমরা জানিয়া-শুনিয়াও চোক কান বুজিয়া থাকিব, কিছুই বলিব না; কিন্তু সাবধান, সত্যকথা বলিও না, তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বনাশ। এই প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া কি এই বালকের কখনও সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে?

দৃষ্টান্ত চুলায় যাক্, উপদেশ দ্বারাও যে, বাড়িতে কোনরূপ নীতিশিক্ষা হয় তা নয়। বাড়িতে যতগুলি পিতৃতুল্য গুরুজন আছেন (এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত) তাঁহাদের

সহিত ছেলেদের গৃহস্থের সহিত চোরের সম্পর্ক। ছেলেদের হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে তাঁহারা চেষ্টাও করেন না পৌঁছানও না। ছেলেরা বোঝে যে, এই সব পিতৃতুল্য গুরুজন কেবল কারণে অকারণে ধমকাইবার নিমিত্ত ও "যা, যা, পড়্‌গে যা" বলিয়া তাড়া দিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। তাহাদের ভালবাসা, স্ফূর্ত্তি, উচ্ছ্বাস, আনন্দ সেস্থানে ফুটিবার নহে। গুরুজনের প্রশংসাটা নিতান্ত বিরল বলিয়া ছেলেদের হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে বটে, কিন্তু অমিশ্র প্রশংসা গুরুজনের নিকট পাওয়াই দুষ্কর। তাঁহারা আবার ছেলেদের নিকট হইতে এত তফাৎ যে, তাঁহাদের ভর্ৎসনা বা নিন্দা ছেলেদের মনে লেশমাত্র অঙ্কিত হইতে পারে না, তা' ছাড়া তাঁহারা ত চিরকালই ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন, এই ত তাঁহাদের কাজ। বকুনিটা খাবার সময় ছেলেদের মনে একটু অসোয়াস্তির ভাব আসে বটে, কিন্তু সেটা অন্যায় করিয়াছে বলিয়া নয়, বকুনি খাইতেছে বলিয়া, আর প্রহারের আশঙ্কায়।

বাড়ির ভিতরে মা পুত্রকে পিতৃশাসন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজে মিথ্যা বলিতেছেন ও মিথ্যা শিখাইতেছেন। ছেলেরা বাড়ির ভিতর যায় খাইবার জন্য ও আদর পাইবার জন্য। বাড়ির ভিতরটা নীতি কিম্বা অন্য কোনপ্রকার শিক্ষার স্থান নহে। অশিক্ষিতা মাতারা, বালিকা বয়সেই মাতৃত্বভার স্কন্ধে লইয়া কিই বা শিক্ষা দিবেন! তাঁহারা কেবল ভালবাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কাছে অন্ধ ভালবাসা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করাও যায় না।

নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে, কর্ত্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা, ইত্যাদিকে যদি হৃদয়মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাহ ত এই সব গুণের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অপবিত্রতা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা যে কতদূর কুৎসিত তাহাই দেখাইতে হইবে। এবং এমন করিয়া

অজ্ঞাতপাপ পৃথিবীতে অল্পই আছে। গুরুতর অন্যায় কার্য্যগুলা সকলেই অন্যায় বলিয়া জানে, এমন কি, ব্যবসায়ী চোরেরাও চুরি করাটাকে নৈতিক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কতকগুলি কার্য্য, জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, করিলেই পাপ। যেখানে শাস্ত্রে লেখা আছে যে, দক্ষিণমুখী হইয়া বসিতে হইবে, সেস্থলে উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে হিন্দুমতে পাপ হইতে পারে এবং একথাটা সকলেও না-ও জানিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার পাপ-পুণ্য আপাততঃ আলোচ্য নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থে যে সব অন্যায় কার্য্য উল্লেখ করা যায়, কিম্বা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কোনটাকে বোধ হয় কাহারও ভ্রমবশতঃ ন্যায় কার্য্য বলিয়া ভাবিবার সম্ভাবনা নাই।

নীতিশিক্ষার প্রণালী স্থির করিবার পূর্ব্বে নীতি কিপ্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দেয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, বুনিয়াদটা কিরকম, মালমসলা কিরকম এবং কিপ্রকারে গাঁথিলে দেয়ালটা সোজা হইয়া থাকিবে ও পড়িয়া যাইবে না, এই সব কথা ভাবিয়া লওয়াই ভাল। চরিত্রের দোষ দূর করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে দোষের কারণটা অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত। রোগের হেতু না জানিয়া চিকিৎসা করিতে বসিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা।

মানবহৃদয়ে সুখস্পৃহাই একমাত্র চালক-শক্তি। ইচ্ছা করিয়া কেহ কখনও দুঃখ সহ্য করে না। কথাটা শুনিবামাত্রই অনেকে তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে উঠিবেন, কিন্তু একটু বুঝাইয়া বলি। কর্ত্তব্যপালনের জন্য অনেক সময় কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনেই আমার যে আন্তরিক সুখ হয়, সেই সুখ ঐ কষ্ট অপেক্ষা বলবান বলিয়া, কিম্বা পরকালে অধিক পরিমাণে সুখ পাইবার অথবা ততোধিক দুঃখ এড়াইবার আশায় আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে কষ্ট সহ্য করিয়া

থাকি। এস্থলে আমি ফিলজফির নিগূঢ় তর্ক তুলিতে চাহি না; কিন্তু সকলেই বোধ হয় নিদান পক্ষে এ কথাটা স্বীকার করিবেন যে, লোকে সুখের প্রলোভনেই অন্যায় পথ অবলম্বন করে, এবং কর্ত্তব্যের প্রতি আন্তরিক টানই এই প্রলোভন অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়।

মানুষকে অন্তরে বাহিরে কর্ত্তব্যের পথে রাখিবার একটি সহজ উপায় ধর্ম্ম। কিন্তু এ স্থলে ধর্ম্মের তর্ক তুলিতে চাহিনা ও তুলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের ত এ পথ বন্ধ। শিক্ষকদের উপর নীতিশিক্ষা দিবারই হুকুম জারি হইয়াছে, ধর্ম্মশিক্ষা নিষেধ। তাহার উপর বাড়িতেও যে বড় একটা ধর্ম্মশিক্ষা হয় তা' নয়। নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য "আগ্‌নাস্তিক," আর বাকির মধ্যে বেশী ভাগ নামে হিন্দু, কাজে কি তা' বলা কঠিন। অতএব, ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নীতিশিক্ষা দিবার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

নীতিশিক্ষার আর এক সহজ উপায় আইন-অনুযায়ী দণ্ডের কিম্বা সামাজিক নিন্দার ভয় দেখান। বুদ্ধিমানের নিকট এই প্রকার নীতি-শিক্ষার একমাত্র অর্থ ধরা পড়িও না। আমাদের সমাজের আবার এমন অবস্থা যে, নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শঠতা কর, প্রবঞ্চনা কর, মিথ্যা কথা বল, মাতাল হও, কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদে জীবন যাপন কর,' সমাজ এ সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া লইয়া তোমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিবে, এবং যদি উত্তম কুলীন হও ও সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকে ত তোমাকে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এমনও শোনা গিয়াছে যে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সমাজে লওয়া সম্বন্ধে এই একটিমাত্র আপত্তি কোন কোন স্থানে হইয়াছিল যে, জেলের মধ্যে পান আহারের বন্দোবস্তে জাতিভেদটা নিখুঁৎ বজায় থাকে কি না সন্দেহ! এইপ্রকার সমাজের নিন্দার মূল্য লইয়া বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যস্বভাব, বিশেষতঃ বাল-স্বভাব অনুকরণশীল ও প্রশংসা-প্রিয়। অল্পবয়সে মান্যের, বিশেষতঃ গুরুজনের ও প্রিয়জনের

চরিত্র গঠন করিতে হইবে যে, আমরা যেমন অপরিষ্কার কিম্বা বীভৎস কোন পদার্থ স্পর্শ করার কল্পনা করিতেও সঙ্কোচ ও ঘৃণা অনুভব করি, তেমনি অপবিত্রতার সংস্পর্শ কল্পনা করিতেও ঘৃণা অনুভব করিব ও অন্যায় কার্য্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিব। আমরা যেমন ছেলেদের কাদায় লুটাইবার সুখ পরিহার করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার সুখ ভোগ করিতে শিক্ষা দিই, সেই প্রকারে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অন্যায় কার্য্য পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এপ্রকার শিক্ষা দু' চারিটি শুষ্ক নীরস নীতিবচনের কর্ম্ম নহে; ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম্ম। নীতিবচনের বাঁধিবোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ ত বরং ভাল নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মরাল টেক্সট্‌বুক্‌এর সহিত হৃদয়ের কোনই সংশ্রব নাই।

আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়ই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও ত তাহার পরিবর্ত্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজে যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখ ত লোকে স্বভাবতঃ সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতিজ্ঞানে আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না। আমাদের সমাজের অবস্থা এ রকম যে, বাড়ি অত্যন্ত নিরানন্দ, এবং সব সময়ে শান্তির আলয়ও নয়; কাজেই ক্রীড়া কৌতুক ও বিশ্রামের জন্য লোকের বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। পেট্রিয়টরা শুনিয়া রাগ করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইংলণ্ডের ন্যায় আমাদের "হোম্ লাইফ্" থাকিলে ভালই হইত।

স্বরলিপি।

আনন্দ-ধ্বনি।

রাগিণী মিশ্র হাম্বির—তাল ফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল, "উঠ উঠ" সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
কর, তিমির রজনী যায় ওই, আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে, ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয় অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানব সমাজে, চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না অলস শয়নে, থেকে না মগন স্বপনে।
লাজ লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়,
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন-প্রায়।
ফেল জীর্ণ-চীর পর নব সাজ, আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে।

৪।৩ ॥
॥ গা মা ধপা -া। গা মা ধা -া। ধনঃধঃ-নসা র্সাঃনঃ ॥
॥ আ ন ন্দধ্ব —। নি জা গা ও। গ —গ ণে

৩-৪।১
। ধা না -া। র্সা -া ধা -না। পা -ধা -া। মা -া -পা -মা।
। কে আ —। ছ — জা —। গি — —। য়া — — —।

। গা -মাঃ -গঃ। রা -া গা -া। ধা -পা -া। রা -া গা -া।
। পূ — —। র — বে —। চা — —। হি — য়া —।

। পা পা -া। ধা -া না -ধা। পা -ধা -া। র্সা -া -া -না।
। ব ল —। উ — ঠ —। উ — —। ঠ — — —।

। ধা -না -া। র্রা -া র্সা -া। গা গা -া। গা -া গা- -মগা।
। স — —। ঘ — নে —। গ ভী —। র — নি — ।

। রগরা -সা -া। ন্‌া -া ন্‌সা -রা। সা -া -া। ধা -া না -া॥
। দ্রা — —। ম — গ —। নে — —। জা —গা ও ॥

॥ । । -পা পা। পা পা -া। ধা -া ধা -া। না না -া।
॥ হে র। তি মি —। র — র —। জ নী —।

। র্সা -া -নর্সা -র্রা। র্সা -া -া। -া -া -া -না। ধা না -া।
। বা — — র। ঐ — —। — — — —। হা সে —।

। র্সা -া ন র্সা -া। ধা পা -া। মা -া গমা -পা। মা -া -া।
। উ — ষা —। ন ব —। জ্যো— তি —। র্ম্ময়ী — —।

। -া -া -া -া। র্গা র্গা র্গা। র্গা -া র্গা -র্মা। র্রা র্সা -া।
। — — — —। ন ব আ। ন — ন্দে —। ন ব —।

। না -া নর্সা -র্রা। র্সা -া -া। -া -া । । । গা -া গা।
। জা — ব —। নে — —। — — — —। কু — ল।

। গা গা গা -মগা। রা গা রা। সা রা সা -া। সা রা গা।
। কু সু মে —। ম ধু র। প ব নে —। বি হ গ।

। মা পা ধা -া। -না -া না। র্সা -া -া॥ । । সা সা।
। ক ল কূ —। — — জ। নে — —॥ হে র।

। সা সা -মা। মা -া মা -া। গমা -পা -মা। পা -া -া -া।
। আ শা —। র — আ —। লো — —। কে — — —।

। গা গা -া। মা -া গমা -পা। গা -মা -রা। সা -া -া -া।
। জা গে —। গু — ক —। তা — —। রা — — —।

। পা পা -র্সা। না -া ধপা -া। গা মা -া। না -া ধা -া।
। উ দ —। য় — অ —। চ ল —। প — থে —।

। ধা না ধা। না না র্সাঃনঃ। ধা না ধা। না -া র্সা -া।
। কি র ণ। কি রী টে। ত রু ণ। ত — প ন।

। পা ধা পা। মা গা মা -পা। রা -পা -মা। গা -া -া -া।
। উ ঠি ছে। অ রু ণ —। র — —। থে — — —।

। পা পা -া। ধা -া ধা -া। না -া -া। র্সা -া -া -না।
। চ ল —। রা — ই —। তা — —। জে — — —।

। মা না -া। র্সা -া নর্সা -র্রা। না -র্সা -ধা। পা -া -া -া।
। মা ন —। ব — স —। মা — —। জে — — —।

। র্গা র্গা -া। র্গা -া র্গা -র্মা। র্রা -া -া। র্সা -া -া -া।
। চ ল —। বা— হি —। রি — —। য়া — — —।

। ন্মা মা -া। মা -া মা -া। গমা -পা -মা। পা -া -া -া।
। অ গ —। তে — র —। মা — —। ঝে — — —।

। সা সা সা। রা রা রা -া। গা -া মা। পা -া -া -া।
। থে ক না। অ ল স —। শ — য়। নে — — —।

৪।৩ ৩-৪।২
। গা মা ধপা -া। গা মা ন্ধা -া। পা পা পা
। (আ ন ন্দধ্ব —। নি জা গা ও)। থে ক না।

৩।২
। ধা ধা ধা -া। না -া না। র্সা -া -া -া॥ সা -া -া।
। ম গ ন —। স্ব — প। নে — — —॥ যা য় —।

। {রা -া রা। গাঃ -রঃ গা। মা পা পা। হ্মা ধা পা।
। {লা — জ। ত্রা — স। আ ল স। বি লা স।

। মা গা মগা। রগা -মপা মা। গা -া -া। -া পা
। কু হ ক। মো — হ। যা — —। য় ও ই।

। র্সা র্সা না। র্সা নর্সর্রা র্সা। ধা -ঞা ধা। পা -া -া।
। দূ র হ। য় শো ক। সং — শ। য় — —।

। ধা -া পা। মা পা মা। (গা -া -া। -ঃরঃ সা -া -া)}
। দুঃ — খ। স্ব প ন। (প্রা — —। য় যা য়।)}

। পা পা -া। র্সা -া র্সা। নর্সর্রা -র্সা -া। র্সা -া -া
। ফে ল —। জী — র্ণ। চী — —। র — —।

। নর্সা ধা -না। র্সা -নর্সা র্রা। না -র্সা -ধা। পা -া -া।
। প র —। ন — ব। সা — —। জ — —।

। র্সা -া -া। র্গা -া র্রা। র্সা -া -ধা। র্সা -া -া।
। [illegible] র [illegible] ন্ত। ক — —। র — —।

। র্সা -নর্সা র্রা। র্সা -না র্সা। ধা -ন -া। পা । -া।
। জী — ব। নে — র। কা — —। জ — —।

। সা সা সা। রা রা রা। গা গা -া। মা মা মা।
। স র ল। স ব ল। আ ন —। ন্দ ম নে।

। পা পা পা। ধা ধা ধা। না -া না। র্সা -া -া॥
। অ ম ল। অ ট ল। জী — ব। নে — —॥

ব্যাখ্যা।

১। এই গানে মধ্যে মধ্যে তাল-পরিবর্ত্তন হয়। আনন্দ-ধ্বনি" হইতে আরম্ভ করিয়া "গগনে" পর্য্যন্ত ঢিমা-তেতালার তাল। তাই শিরোদেশে ৪।৩ এই তালাঙ্ক রহিয়াছে—অর্থাৎ প্রত্যেক তালি-বিভাগে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে—এবং প্রতি মাত্রা ৩ সংখ্যা দ্রুত উচ্চারণ করিলে যত সময় লাগে তত ক্ষণ স্থায়ী। "কে আছ" র আরম্ভ হইতে "শয়নে" পর্য্যন্ত পোস্তা তাল। তাই শিরোদেশে ৩—৪।১ এই তালাঙ্ক আছে। "থক না নগন" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একতালা। তাই শিরোদেশে ৩।২ এই তালাঙ্ক রহিয়াছে।

ভুলে।

একেলা তটিনী-কূলে শ্যাম-নব-দূর্ব্বাদলে
শুয়েছি জগত ভুলে আজিকে হেথায়।
কাহারে আপনা দিয়া বাঁধিতে পারিনি হিয়া,
বেঁচে আছি তবু যেন কাহার আশায়।
ঝরে ঝরে পড়ে পাতা মনে পড়ে কার কথা
মনে আসে কার মুখ আজি এ নিশায়।
দূরে ডেকে ওঠে পিক্ কি যেন হ'লনা ঠিক্
কি যেন ক'রেছি ভুল জীবন-খেলায়।

তুলে ফুল সারা বেলা গাঁথিতে ফুলের মালা
সুরেতে বাঁধিতে বীণা আপনায় ভুলে,
কাহারে শুনাতে গান, কার হাতে দিতে প্রাণ
কার গলে দিতে মালা, দেছি কারে ভুলে।

মেঘ-কোলে আলো ফোটে রাঙা-রবি বসে পাটে
মনে পড়ে এলোচুল, আঁখি দুটি কার।
সাঁজেতে বকুল ছায় রজত জোছনা তায়
মনে পড়ে গানে কার বাজেগো সেতার।
তেমনি সে ফুটে ফুল বায়ু বহে ঢুলুঢুল্
নদী বহে কুলুকুল্ সমীর দোলায়,
উছলে তেমনি জল শতদল ঢলঢল্
পিক্ কুহু কলকল্ প্রভাত নিশায়।

চাঁদ সে তেমনি ওঠে ধেনু আসে বায় গোঠে
সমুদ্র পাষাণে লোটে, হাসে শুকতারা,
তবু যেন কিছু নাই পুড়ে যেন সব ছাই,
নিশিদিন যেন তাই কেঁদে আমি সারা।
হাসিতে আসেনা হাসি বাজেনা প্রাণের বাঁশি
প্রবাসের পথে আসি, যেন আমি-হারা।
বিরহে বিকল প্রাণ মনে আসেনাক গান
কোথা তুমি, কোথা তুমি মোর ধ্রুবতারা।

আশার পরাণ বেঁধে শুধু জেগে শুধু কেঁদে
জীবন কি শুধু যাবে প্রতীক্ষায় তোর।
হিজিবিজি কাল-হৃদি ফুটে কি হবে না ছবি
রবেকি, রবেকি, চির ভেজান এ দোর।
জীবন প'ড়েছে ঢোলে কাঁদিয়া মরণ-কোলে
হবেনা কি, হবেনাকি, এ রজনী ভোর।
হারাইয়া লাভে মূলে শুয়েছি দুনিয়া ভুলে
অকূলে, কিরাও কূলে ধ্রুবতারা মোর।

সাধনা।

মহামায়া।

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোন কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম্ম এই, তুমি কি সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ? আমি এ পর্য্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোন কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল—"আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলঙ্কার, এমন কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল—

আরও দুটো পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একটু নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙ্গা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্ব্বোধ লোকটা শুদ্ধ কেবল বলিল, চল আমরা বিবাহ করিগে!

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। যেন শরৎ-কালের রৌদ্রের মত কাঁচা সোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই; বড় ভাই আছেন—তাঁহার নাম ভবানী-চরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মত নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটা বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড় সাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটীর কুঠিতে লইয়া আসেন। আমি যে প্রাচীনকালের কথা বলিতেছি তখনকার সাহেবদের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা প্রায় দেখা যাইত। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইহারা ভবানীচরণের প্রতি-বেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে [illegible]
কি, উনিশ হইয়া উঠিল, [illegible]
[illegible] বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব [illegible]
অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুসি হইলেন, [illegible]
করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারী-বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এ যাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যত কিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে, হয়, আমরণ সুখ, নয়, আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন

একটা সঙ্কটের দিনে রাজীব কেবল কহিল—"চল, তবে বিবাহ করা যাউক্!" এবং তার পরে বিস্মৃত-পাঠ ছাত্রের মত থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্দ্ধসংলগ্ন ভাঙ্গা কবাট এক একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল। মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্-বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্‌রা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণবাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্ করিয়া উঠে, এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙ্গা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এইসমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল, রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত মহামায়ার

মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কতকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মত মৌলিক ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে! ভালবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক্, মহামায়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কি আবশ্যক! কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

রাজীব কহিল, আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদ্‌লি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল দুই জনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল—"আচ্ছা!" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে—এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"চাটুয্যে মহাশয়!" মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফা-

ইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।" ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল—আর রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন—এইটে পরিয়া আইস। মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।" ভবানীচরণের আদেশ, এমন কি, সঙ্কেতও কেহ কখন অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া বুঝিল এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্র প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্ত্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার

আর্ত্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেরূপ হইল না। এমন কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধূম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্ব্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদ্‌লি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে। মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।" সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাততঃ একমাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মত ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা, নয় একটা কিছু করিবার উদ্যোগ করিতে যাইতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এম্‌নি ঝড় যে, রাজীবের মনে হইল বাড়ি মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যখন দেখিল, বাহ্যপ্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ

একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তিপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোম্‌টা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া। উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?" মহামায়া কহিল "হাঁ! আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বল, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর সমস্তই তুচ্ছজ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিও—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল "তবে এখনি চল—তোমার সাহেব যেখানে বদ্‌লি হইয়াছে সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এম্‌নি ঝড় যে দাঁড়ান কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া শ্বাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাত দুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহ-যন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া

একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কি ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্ত্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কি ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্ব্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্ত্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষতঃ মহামায়া পুরাণ-বর্ণিত কর্ণের মত সহজ কবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে, অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এত দূরে চলিয়া

গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডীর বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশি-যাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোন কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মত উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কি! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানল-শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান্ রসনায় মহামায়ার কামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল—পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর"।

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

বৈষ্ণব-কবিতা।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন

শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার!
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা!

এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;—
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী,
উৎসুক শ্রবণ পাতি' শুনি যদি ভারি
দুয়েকটি তান,—দূর হ'তে তাই শুনে'
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি' উঠে; শুনি' সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা;—মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু র'য়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,—

যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে ! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে ! তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হ'তে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !
আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ ! এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায় !
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই

তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছি আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তারা
লুটে-পুটে নিতে চায় সব! এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখে দিয়া
বহে' যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তারা ল'য়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে! তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছে রোষ!
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে'।

সারসংগ্রহ।

একাত্মবাদ—প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ ?

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না। ভারতবর্ষ এত প্রাচীন যে, ইহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনার পদাঙ্ক বিলুপ্তপ্রায়। রাজাজ্ঞা-লাঞ্ছিত প্রস্তরস্তম্ভ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, খোদিত ধাতুফলক ইহার অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না। এজন্য অনেকে বলেন যে, ইতিহাসের প্রাতঃসন্ধ্যার ক্ষীণালোকে উদ্ভাসিত ভারতীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে মতামত নির্ম্মাণ নিষ্ফল ও নিরর্থক। কিন্তু কথাটা নিতান্ত একদিকদেঁষা। মতামত নির্ম্মাণের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তার ইচ্ছা করিলে মতামত বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। An ounce of fact is worth a pound of theory—এবাক্য নিতান্ত স্থূলদৃষ্টি-প্রসূত। বিচ্ছিন্ন সহস্র সত্য থাকিলেও মতামতের চুন সুরকি ব্যতীত তাহা কোন কার্য্যেই আসে না। সত্য যাহা তাহা ত সত্য আছেই কিন্তু মনুষ্যের বোধায়ত্তে না আসিলে তাহা সমুদ্রের কুক্ষিগত রত্নের ন্যায় নিষ্প্রয়োজনীয়। যতটুকু সত্য পাওয়া যায় তাহাকে লইয়াই মতামত গড়িতে হয়, নতুবা জ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কোন কল্পে ৺চন্দ্রশেখর দেব "Reminiscences of Ram Mohun Roy" শীর্ষক যে দুইটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহার একটিতে বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায়ের মতে সুতীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে প্রাচীন ব্রাহ্মণশাস্ত্র হইতে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার

হইতে পারে। রামমোহন রায়ের গ্রন্থবিশেষে দেখা যায়, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি স্থির করেন যে, পরশুরামের সময় হইতে ভারতবর্ষে বর্ণবিভেদ দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তিনিই একপ্রকার বর্ণভেদের আদিকর্ত্তা। পরবর্ত্তী স্বদেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে এই সত্যটি আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যতদূর দেখা যায় তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনায় যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীন ভারতীয় ঘটনাবলীর সময় নির্ণীত না হউক, তাহাদের পর্য্যায় ও ক্রম অনেকটা স্থির করা যাইতে পারে। মতামতের অভ্যুদয় ও পতন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয় এবং ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাপর বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে উপরোক্ত প্রণালী বিশেষরূপে কার্য্যকরী।

গত অক্টোবর মাসের "মোনিষ্ট" নামক মার্কিন-দেশীয় ত্রৈমাসিক পত্রে "একাত্মবাদ—প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ?" নামক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক অধ্যাপক রিচার্ড গর্ব্বে। তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ যখন কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর এত বাড়াইয়া তুলিলেন যে, তাহা লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল—তখন লোকের ভাবনা উপস্থিত হইল যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি। তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, "আমি কে; কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাকে কোথায় যাইতে হইবে, জন্মের পূর্ব্বে আমি কোথায় ছিলাম, আর যাঁহার উদ্দেশে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞ হইতেছে—তিনি কে, তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ?" এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেই উপনিষদ্-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। উপনিষদের সার কথা এই যে, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্‌বিধ বিকাররহিত, বৃহৎ

হইতে বৃহৎ অণু হইতে অণু, এক আত্মা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপন করিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁকে বিবিক্ত করিয়া লইলে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না। এক কথায়, উপনিষদের মূলমন্ত্র "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"। বেবর, মোক্ষমূলর, রেঞ্জো, ডয়সন্, ভাণ্ডারকার প্রভৃতির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া লেখক বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা এই একাত্ম-বাদের প্রবর্ত্তক নহেন, একাত্মবাদের উদ্ভাবক ক্ষত্রিয়। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি কয়েকটি ঔপনিষদিক আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রথম, বৃহদারণ্যক ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদোক্ত বালাকী গার্গ্য ও কাশীরাজ অজাতশত্রুর সম্বাদ। বালাকী গার্গ্য কাশীরাজকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে গিয়া পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা তাহাতে ব্রাহ্মণের ভ্রম দর্শাইয়া তাঁহাকে যথাবৎ ব্রহ্মোপদেশ করেন।

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গত। রাজা প্রবাহণ জৈবালি ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতা গৌতমকে ব্রহ্মোপদেশ করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, তদুপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের অবিদিত ছিল।

শেষ আখ্যায়িকাটী ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়। এখানে উদ্দালক আরুণি প্রমুখ ব্রাহ্মণবর্গকে রাজা অশ্বপতি ব্রহ্মোপদেশ করিতেছেন।

লেখক বলেন, এই সকল আখ্যায়িকা সত্য হউক মিথ্যা হউক তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যখন প্রামাণ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এরূপ আখ্যায়িকা স্থান পাইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় একাত্মবাদ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে। ব্রাহ্মণেরা এমতের প্রবর্ত্তক হইলে নিঃসঙ্কোচে নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখি-

বার যত্ন করিতেন——উক্ত আখ্যায়িকাগুলিকে শাস্ত্রে স্থান দিতেন না।

এখানে দুইটি আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে, এই একাত্মবাদ বিশেষ অর্থে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কি না। যদি ঋগ্বেদের মন্ত্রখণ্ড উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহা হইলে একাত্মবাদ যে উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। বামদেব ঋষি বেদমন্ত্রে বলিয়াছেন যে, "আমি মনু, আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্রমা" ইত্যাদি। এখানে একাত্মবাদ নামের উল্লেখ নাই বা তাহার দার্শনিক বিবৃতি নাই। তবে একাত্মবাদ ইহার মর্ম্মে নিহিত রহিয়াছে। এক অর্থে সমুদায় ঋক্-মন্ত্রের অন্তরালে একাত্মবাদ রহিয়াছে। চরাচরাত্মক জগৎ এক আত্মা—এই ভাবে মন অধ্যাসিত হইলে যখন যে বস্তুতে মন আকৃষ্ট হয় তাহাতেই আত্মদৃষ্টি করিয়া মন পরিতৃপ্ত হয়। মন্ত্রগুলিকে এইভাবে দেখিলেই তাহাদের পূর্ব্বাপর মিলন ও অর্থ পরিস্ফুট হয়। * আরও একটী দেখা যায় যে, দশ মহা উপনিষদেরও অনেক স্থানে ব্রহ্মোপদেশ কালে "ইতি শুশ্রুমঃ পূর্ব্বেষাং যেন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" এরূপ ভূয়ঃ প্রয়োগ আছে। যেখানে ক্ষত্রিয়ের নামগন্ধ নাই সেখানেও "কস্মৈ দেবায় হবিষা জুহুমঃ" এরূপ প্রস্তাবনা করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ আছে। অতএব একাত্মবাদ প্রবর্ত্তনায় ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য উপনিষদ্-প্রমাণে দাঁড়ায় না। যদিই বা মানিয়া লওয়া যায় যে, উপনিষদ্-শাস্ত্র রচনায় ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য, তাহা হইলেও বামদেবের উক্তিতে বেদমন্ত্রে একাত্ম-

---

* প্রমাণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমান উদ্দেশ্যের বহির্ভূত, তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যেমে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে একই দেবতা বিশিষ্ট হইতেছে—একথা অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতেরও অভিমত।

বাদের উপনিষদ্ অপেক্ষা প্রাচীনত্ব থাকিয়া যায়। আর বেদ-মন্ত্রের অভিপ্রায় পূর্ব্বোক্ত রূপ বলিয়া গৃহীত হইলে ত বিচারের স্থলই থাকে না। যদি লেখক ও তাঁহার অনুকূল মতাবলম্বী পণ্ডিত-গণের এই অভিপ্রায় হয় যে, কোন এক সময়ে যখন কর্ম্মকাণ্ডের প্রবলতায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একাত্মবাদ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তখন ক্ষত্রিয় রাজারা উক্ত মতের একটী বিশেষভাব প্রচার করিয়াছিলেন—তাহা হইলে আপত্তির কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না। তবে এই একটি কথা বলিতে হয় যে, "সুত্তনিপাতে"র অন্তর্গত "বাহ্মণ সুত্তে" ইহা বুদ্ধের মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের জন্য ক্ষত্রিয়গণ দায়ী এবং ক্ষত্রিয়-দিগের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণগণ বিপথগামী হইয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণেরও একস্থানে লিখিত আছে যে, কোন রাজদ্রোহী শূদ্রনরপতির অসৎ পরিচালনার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণ নানা মিথ্যা শাস্ত্ররচনা ও মিথ্যা ব্যবহারস্থাপন করিয়াছিলেন।

শেষ কথা এই বলিতে হয় যে, উদ্ধৃত ঔপনিষদিক আখ্যায়িকাগুলি যে ব্রাহ্মণ-বর্ণের অপরাধের বিশেষ একটী প্রমাণস্থল এরূপ সিদ্ধান্ত কোনরূপে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ।

কিয়ৎকাল হইল, একজন আগন্তুক, আচার্য্য হর্সলির পরীক্ষাগারে উপস্থিত হইয়া জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। জীবিত অবস্থায় দেহচ্ছেদ করিলে পশুকে যন্ত্রণা দেওয়া হয় কি না, ইহাই তাঁহার প্রশ্ন করিবার মূল উদ্দেশ্য। আচার্য্য হর্সলির সহিত আগন্তুকের যে কথোপকথন [illegible] তাঁহার

মর্ম্ম নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে। দেহচ্ছেদ-প্রকরণে পশু-দিগের যন্ত্রণা হয় কি না তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

আগন্তুক।—প্রথমতঃ আপনি কি অস্বীকার করেন যে, জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ আবশ্যক হইলেও উহা নিষ্ঠুর কার্য্য?

হর্শলি।—অবশ্য। নিষ্প্রয়োজনে কষ্ট দেওয়াই নিষ্ঠুরতা। বিরোধী পক্ষীয়েরা এ কথা বলিতে পারেন, কোন্‌টা প্রয়োজন, কোন্‌টা নিষ্প্রয়োজন তাহাই অগ্রে স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু আরও অন্যান্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মনুষ্য ও পশুকে কষ্ট দেওয়া যে আবশ্যক হয়, তাহা জনসাধারণে স্বীকার করিয়া থাকে। তাহার এক দৃষ্টান্ত, আমাদের আহারের যোগান। ইহা দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে কষ্ট নিতান্তই আবশ্যক—সেই অর্জ্জিত জ্ঞান কি মনুষ্য, কি পশু উভয়েরই উপকারে আইসে—সুতরাং সেই কষ্টের কিয়দংশ পশুরও ভোগ করা যুক্তিসঙ্গত। এই কারণে, জীবিতাবস্থায় পশুদের দেহচ্ছেদ দ্বারায় আমি নিষ্ঠুরতাচরণ মনে করি না। যদিও কখন কখন তাহাদিগকে কিছু কষ্ট দিতে হয় কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষাস্থলে তাহাদের কোন কষ্টই হয় না—কারণ, ক্লোরোফর্ম্ম-জনিত অচেতনাবস্থা হইতে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বধ করা হয়।

আগন্তুক।—একবার একটা খর্গসের উপর পরীক্ষা করিবার সময় ক্রেটন-তৈলপূর্ণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচের গোলক তাহার পৃষ্ঠের মাংসপেশীর মধ্যে গভীররূপে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যখন ঘা শুকাইয়া গেল তখন চাপ পাইয়া কাচের গোলকগুলি ভিতরে ভাঙ্গিয়া গেল। এই পরীক্ষা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এবং এই দীর্ঘকাল ক্রেটন-তৈল দেহমধ্যে সঞ্চারিত

হওয়ায়, গভীর বিস্ফোটকসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পশুর উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকিবে।

হর্সলি। ক্রেটন-তৈলের ফলে ফোস্কা হইতে পারে কিন্তু সে অধিকক্ষণ থাকে না।—তা'ও আবার মর্ফিয়া-প্রয়োগে প্রশমিত হয়। ইহাও যেন মনে থাকে, মাংসপেশীতে চেতনশক্তি অতি অল্পই আছে। তা' ছাড়া, এইরূপে যে বিস্ফোটক উৎপন্ন হয় তাহাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। এরূপ বিস্ফোটককে ডাক্তারি ভাষায় ঠাণ্ডা বিস্ফোটক বলে, ইহাতে আদবে দব্‌দবানি নাই—সুতরাং ইহাতে কোন কষ্ট হয় না।

আগন্তুক।—আচ্ছা মহাশয়, "কুরারে" প্রয়োগের কথা কি বলেন? ইহা কি সত্য নহে যে, আপনারা ঐ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া পশুদিগকে একেবারে অক্ষম করিয়া ফেলেন, অথচ তাহাদের চেতনা পূর্ণমাত্রায় থাকে?

হর্সলি।—এ কথা নিতান্ত অর্থহীন। "কুরারে" একপ্রকার বিষ—দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তীরের ফলায় ব্যবহার করে। কিছুকাল হইল, এই দ্রব্যটি শারীরতত্ত্ব-ঘটিত পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ভ্রম-নিরাকরণের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই দ্রব্যটির প্রয়োগে চর্ম্মস্থিত ঐন্দ্রিয়িক স্নায়ু ও পৈশিক স্নায়ুর শেষাংশ অসাড় হইয়া পড়ে—সুতরাং ইহা দ্বারা পশুদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেবল যে অসাড় করিয়া ফেলা হয় এরূপ নহে—তাহাদের চেতনাও বিলুপ্ত হয়।

আগন্তুক।—কিন্তু যখন তাহাদের চেতনা আবার ফিরিয়া আসে, তখন অবশ্য তাহাদের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

হর্সলি।—তাহাদের চেতনা আর ফিরিয়া আসে না। এই

সকল পরীক্ষায়, অচেতন অবস্থায় থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে বধ করা হয়।

আগন্তুক।—কিন্তু যে স্থলে, তাহাদিগকে আবার সচেতন করিয়া তোলা হয়, সেস্থলে কিরূপ হয়? যেমন মনে করুন, যখন তাহাদের মস্তিষ্কের অর্দ্ধ-মণ্ডল অপসারিত করা হয়, তখন কিয়ৎ সপ্তাহ ধরিয়া তাহাদের ভীষণ যন্ত্রণা পরে উপস্থিত হয় কি না? ম্যান্‌চেষ্টারের বিশপ এই কথা বলেন।

হর্সলি।—না, তা' হয় না। আমি তাহা এখনই দেখাইয়া দিব। এরূপ পরীক্ষা-স্থলে মনুষ্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, পশুদেরও প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, প্রথমে তাহাদিগকে ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা অচেতন করিয়া, তাহার পর তাহাদিগকে একটা টেবিলের উপর শোয়ান হয়—গরম জলের বোতল তাহাদের চারিপার্শ্বে রাখা হয়, তাহাতে শস্ত্র-ক্রিয়া-জনিত অবসাদ অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। শোণিত-নিবারণের বিবিধ উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বন করিয়া অতি সাবধানে এই সকল শস্ত্র-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আগন্তুক। কিন্তু যখন ঐ পশুসকল পুনর্ব্বার চেতনালাভ করে, তখন তাহাদের মস্তিষ্ক-খণ্ড অপসারিত হওয়ায়, নিশ্চয়ই তাহাদের উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হয়?

হর্সলি। তোমাদের সহজে এইরূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা চেতনা-হীন পদার্থ। মনুষ্যের উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে—মস্তিষ্কের কিয়দংশ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথচ রোগী বুঝিতে পারিবে না যে, তাহাকে কোনপ্রকারে স্পর্শ করা হইয়াছে। মনুষ্য-রোগীর সম্বন্ধে

আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, পশুদিগের যদি কিছুমাত্র কষ্টের লক্ষণ দেখি, অমনি আমরা তাহাদিগের চর্ম্মমধ্যে সর্ফিয়া প্রবিষ্ট করিয়া দিই। মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগের ক্ষতস্থান পচন-নিবারণী ক্রিয়ার দ্বারা এক সপ্তাহের মধ্যেই সারিয়া উঠে। ক্ষত স্থানে পূঁজ সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা জুড়িয়া যায়—চব্বিশ ঘণ্টাকাল অল্পস্বল্প বেদনা থাকে মাত্র।

আগন্তুক। পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিবার জন্য জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা করা কি নিতান্তই আবশ্যক?

হর্সলি। তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি আমরা দেখি, কোন্ প্রকার প্রতিকূল উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে—অমনি আমরা পরীক্ষায় ক্ষান্ত হইয়া, পরীক্ষাধীন পশুকে ক্লোরোফর্ম্ম-প্রয়োগে বধ করি। ইহার প্রমাণস্বরূপ এক্ষণে তোমাকে কতকগুলি পশু প্রদর্শন করিব, তাহাদের মস্তিষ্কার্দ্ধ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আগন্তুক। কিন্তু সে যাই হউক, এই সকল পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?—উহার ঔচিত্য কি প্রকারে সমর্থন করেন?

হর্সলি। এ সঙ্গত প্রশ্ন বটে; এই বিষয় আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে বিশপ পাদ্রিরা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল করিতেন। এই সকল পরীক্ষার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা জীবিত পশুর দেহচ্ছেদ ভিন্ন আর কোনপ্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—শুধু পরীক্ষা করিয়া দেখা, মস্তিষ্কের কোন্ অংশে অপস্মার-রোগের আক্রমণ প্রথম আরম্ভ হয়।

পশুদিগের উপর এইরূপ পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণ ফললাভ করা গিয়াছে—ইহাতে কি মনুষ্য, কি পশু উভয়েরই অশেষ উপকার। বানরদিগের উপর পরীক্ষা করিয়া আমরা এক্ষণে

জানিতে পারিয়াছি, অপস্মার-রোগের বীজ কোথায়—মস্তিষ্কের ঠিক্ কোন্ স্থলে তাহার মূল, আমরা অঙ্গুলী নিদর্শনপূর্ব্বক এক্ষণে দেখাইয়া দিতে পারি।

ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম।*

আদিম কাল হইতে সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম যেমন নিরবচ্ছিন্ন মানবসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল—কিন্তু অসহায় মানবশিশু সংসারে আসিয়াই প্রবলা প্রকৃতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার চতুর্দ্দিকেই রোগ শোক, বিপদ আপদ, যুদ্ধবিগ্রহ, মৃত্যুভয়; সংসারে সে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসে; দাবানলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায়; সে এক করিতে যায়, আর এক হইয়া পড়ে—সুতরাং সহজেই সে আপনাকে কোনও দুর্দ্দান্ত অপদেবতার ক্রীড়াসামগ্রী ঠাহরাইয়া বসে এবং সেই অদৃশ্য নিষ্ঠুরের হিংসাবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। প্রকৃতিতে বিপ্লবও নানা—নদী কূল প্লাবিত করিয়া উথলিয়া উঠে, আকাশ দারুণ মেঘগর্জ্জনে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে একটা প্রলয়-ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হয়, কাল-ছায়া আসিয়া চন্দ্রের শুভ্রকান্তি ঢাকিয়া ফেলে; ভয়বিহ্বলচিত্তে দুর্ব্বল মানবসন্তান চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে, কোনও কারণ খুঁজিয়া পায়

* Religion: Its Future—By the Rev Dr. Momerie.

না—কেবল এই বুঝে যে, এখানে সহস্র দানবশক্তি তাহার সঙ্গে নিতান্ত লাগিয়াছে, সকলগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে নিস্তার নাই। নিজের প্রকৃতি দিয়া সে দেবচরিত্র নির্ণয় করিতে বসে, এবং উৎকোচদানই তাহার নিকটে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয়। এখন এই দানব-দেবতাকে কি দেওয়া যায়? শস্য, ফলমূল মদ্যমাংস যাহা দাও, তিনি সর্ব্বভুক্। রক্তদৃশ্যে দেবতার বিশেষ আনন্দ। অতএব, দেবতাকে প্রসন্ন করিতে চাহ ত যত পার বলিদান কর। যাহারা বিশেষরূপে দেবচরিত্রের রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইল, তাহারাই ক্রমে গুরুপুরোহিত হইয়া উঠিল। এবং প্রথমে যেমন ইহলোকের সুখকামনাই দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র কারণ ছিল, কালক্রমে তাহার সহিত পারলৌকিক সুখকামনা যুক্ত হইল। পারলৌকিক সুখের আশায় লোকে ইহলোকে অনেক কষ্টভোগও স্বীকার করিল। পরলোকে স্বর্গলাভের আশায় লোকে আপনাকে হোমানলে আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে ভাসাইয়া দিয়াছে, না করিয়াছে হেন কাজ নাই। দুঃখ হইতে অব্যাহতি এবং সুখলাভের জন্য মানুষ এমনি অধীর।

এইসকল আচার অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে এক একজন মহৎলোকের আবির্ভাব হইয়াছে—যেমন, কন্‌ফ্যুশস্, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ; তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যাজকদিগের শিক্ষার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, যাগযজ্ঞ, জীববলি মন্ত্রতন্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং চরিত্রের উৎকর্ষসাধনই যে মানবজীবনের উন্নতির মুখ্য উপায় এই সত্যটি বারবার প্রচার করিয়াছেন। সংস্কারকদিগকে লোকে

প্রথমে গালি দিতে থাকে, পরে তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপক বলিয়া প্রচার করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান তাহার অনেক বিরোধী মত ও অনুষ্ঠানই তাঁহাদের নামসংযুক্ত ধর্ম্মের অঙ্গরূপে বিরাজ করিতে থাকে।

ডাক্তার আল্‌ফ্রেড মোমারি তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে ইহারই উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বড় বড় সংস্কারকেরা সকলেই একবাক্যে লোকসকলকে সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইসায়া বলিয়াছেন,—দেবতা ছাগরক্তে পরিতুষ্ট হয়েন না, উপহারের আড়ম্বরে এবং ধূপধূনার গন্ধে তাঁহার চিত্ত-বিনোদন হয় না, এ সকলি মিথ্যা পণ্ডশ্রম; অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হও, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, দরিদ্রের অভাব মোচন কর, পিতৃহীনকে আশ্রয় দাও, বিধবাকে সাহায্য কর। জোরোস্তার ইন্দ্রজালের নিষ্ফলতা দেখাইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকেই মানবের একমাত্র আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ,—পৃথিবীতে ভাল মন্দ দুই আছে, তোমরা মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভালকে গ্রহণ কর; সদালাপ, সাধুচিন্তা এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই স্বর্লোকে নেতা। কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্টাচরণে বিরত থাকাই কন্‌ফ্যুশসের প্রধান শিক্ষা। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—মস্তকমুণ্ডন, বস্ত্রত্যাগ, ধূলিশয্যা বা বেদাধ্যয়ন মানবকে শুদ্ধ করিতে পারে না, কারণ, ক্রোধ, হিংসা, মত্ততা, পরস্ত্রীকাতরতা এইসকলই মানবের অশুচি। যীশুখৃষ্টও এই কথাই বলিয়াছেন,—প্রভু প্রভু করিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়

না, সেই তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করে; যাহারা মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা করে এবং কাজের বেলায় অনাথা বিধবার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না তাহাদের কল্যাণ নাই। আরবপ্রান্তে মহম্মদেরও সেই একই কথা,—ঈশ্বর রক্ত-মাংসের বলি গ্রহণ করেন না, তোমাদের অকপট ভক্তিই তাঁহার নিকট পঁহুছায়। যাহারা ভক্তির ভাণ করে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, তাহাদের সে ভক্তি ব্যর্থ। পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িলেই পুণ্য হয় না, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা সংসাধনের চেষ্টাই যথার্থ পুণ্যকার্য্য।

ধর্ম্মসংস্থাপকেরা যুগে যুগে এই একই কথা বলিয়াছেন যে, সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনাকে বড় করিয়া তোলো, তোমাদের জন্য প্রশস্ত কল্যাণ রহিয়াছে। কিন্তু অনুচরবর্গ সহস্র অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং অনর্থক অনুষ্ঠান দ্বারা মূল কথাকে ক্রমে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—দাঁড়াইয়াছে এই যে, বুদ্ধ যাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; খৃষ্ট যাহা বলেন নাই তাহাই খৃষ্টধর্ম্মের মূল বিশ্বাস, মহম্মদ এবং মুসলমানধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী। যদি কোনও গতিকে একবার এইসকল মহাপুরুষেরা মর্ত্ত্যে আসিয়া তাঁহাদের নামসংযুক্ত ধর্ম্মের অবস্থা দেখেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন।

উত্তর বৌদ্ধধর্ম্মে এখন পৌত্তলিকতার সমস্ত আড়ম্বরই নিঃশব্দে স্থানলাভ করিয়াছে—স্বর্গীয় দূত, পবিত্র বারি, জপমালা এবং বিচিত্র দুর্ব্বোধ্য অনুষ্ঠান বুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার মৃৎপ্রতিমার পদতলে প্রতিদিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণ বৌদ্ধধর্ম্ম বাহ্যতঃ তাদৃশ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাহার যথার্থ ঐক্য অল্পই।

যাজকমণ্ডলী প্রাচীন
জ্ঞান শ্রোতৃমণ্ডলী কেব
যোগে যথাসাধ্য পুণ্য
খৃষ্টধর্ম্মেরও এই দ
পূর্ব্বকালের পৌত্তলি
অদ্ভুত অধ্যাত্মবিদ্যা
খৃষ্টকে, নামটুকু বাদে
তর্ক উঠে যে, পবিত্র
বাদই বোধ করি প্রচ
বাহির হইয়াছেন, অ
বলিয়াছেন, পাপীর
তাঁহার নিজ পুত্রের
ক্রোধশান্তি অসম্ভব
বাছাই-করা লোক
অদৃষ্টে যাহা হয় ঘা
নহে। সামান্য অ
এক দম্পতির অবা
হইতে নির্ব্বাসিত কা
পাপীর প্রতি যাহা
প্রবলপ্রতাপ বিধা
ঈশ্বরের নামে ও
করিয়াছে বিভীষিব
মুসলমান-ধর্ম্মও
আমরা তাহা দে
সায়েদ আমীর অ

গ্রন্থ হইতে ইহার অনুকূলে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মোমারি সাহেব কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কারণ, বোধ হয়, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের ন্যায় কোনও বিশেষ ধর্ম্ম-সংস্থাপকের নামের সহিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রথিত হয় নাই, এবং, ইহা ভিন্ন, হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও বিশ্বাসে আবদ্ধ নহে। নানা শাস্ত্র, নানা মত, নানা কথা, নানা বিধান—সুতরাং ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু পাওয়া কঠিন। কোথাও তেত্রিশকোটি দেবতার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কোথাও সেই তেত্রিশকোটি দেবতা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্ম ত ঠিক এক ধর্ম্ম নহে—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাই পুঁথিরক্ষিত হইয়া সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্ম নামের মধ্যে কোনপ্রকারে স্থানলাভ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এদেশেও ঋষিবাক্য প্রত্যহ লঙ্ঘিত হইয়াছে, এবং ঋষিবাক্য-লঙ্ঘনই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আরও, ইদানীং আমাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম-সংস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের অবস্থা দেখিলেই মোমারি সাহেবের অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। চৈতন্যের ধর্ম্ম এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম, নানকের ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান শিখদিগের ধর্ম্ম, এইসকল তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে চিরদিন দুই প্রকারের ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। গুরুপুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্ম্ম এক, এবং ধর্ম্মসংস্থাপক ও অল্পসংখ্যক লোকের ধর্ম্ম এক। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সুবিধাই আদর্শ, শেষোক্ত শ্রেণীর আদর্শ ন্যায়;

এক পক্ষ নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া দেন, অন্য পক্ষ নীতিকেই সর্ব্বোচ্চস্থান দিয়া থাকেন; এক পক্ষের ধর্ম্ম কতকটা অসভ্য অবস্থার এবং অভিব্যক্তির নিম্নশ্রেণীর, অপর পক্ষের ধর্ম্ম অভিব্যক্তির চরম ফল। ডাক্তার মোমারি সেইজন্য গুরুপুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্ম্মকে অতীত কালের ধর্ম্মের মধ্যে ফেলিয়াছেন। এবং মহাজনদিগের ধর্ম্মকেই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভবিষ্যতের ধর্ম্মই এখন প্রতিদিন ধীরে ধীরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভবিষ্যতের ধর্ম্মে দেবতা স্থান পাইবেন কি না? দেবদেবী ত প্রতিদিন লোপ পাইতেছে—ঈশ্বর কি থাকিবেন? কনফ্যুশস্, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ এই চারিজন ধর্ম্ম-সংস্কারকের মধ্যে শেষোক্ত দুই জনই ব্রহ্মবাদী। এবং শুনা যায়, নাস্তিক্য-ধর্ম্ম কেবলমাত্র নীতি বৈ আর কিছুই নহে। মোমারি সাহেব বলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরবিহীন নীতি নীতিবিহীন ঈশ্বর অপেক্ষা শতগুণে ভাল। কিন্তু আচরণ-প্রধান ধর্ম্মকে শুদ্ধমাত্র নৈতিক ধর্ম্মহিসাবে দেখা সঙ্গত নয়। ধর্ম্মও যে সর্ব্বত্র সুব্যক্তরূপে ঈশ্বরবাদী তাহা বলা যায় না। এবং ধর্ম্ম এবং নীতি দুই বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করাও ভ্রম। নীতি বাদ দিয়া ধর্ম্ম, কিম্বা একেবারে ধর্ম্মশূন্য নীতি অসম্ভব। নীতির মধ্যেও, অন্ততঃ গূঢ়ভাবে, ঈশ্বরনিষ্ঠাই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমাদিগকে সদনুষ্ঠানরত দেখিতে চাহেন—এবং সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেও ঈশ্বরবাদীরই মত, তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে, তাঁহার অবারিত প্রীতিলাভে সমর্থ। নীতি ধর্ম্মের পত্তনভূমি—

ধর্ম্মের সূচনা; কেবল, ধর্ম্ম এখনও আপনাকে আপনি বুঝিবার মত স্পষ্টভাব ধারণ করে নাই। যে নীতিপরায়ণ ব্যক্তি চিরদিন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছেন, তত্ত্ববিদ্যায় একটা ভুল করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাকে ধর্ম্মপরাঙ্মুখ বলা যায়!

কিন্তু নাস্তিকতা যে ভ্রম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার মোনারি প্রকৃতির একরূপতা, চিন্তাবশ্যতা এবং উন্নতিশীলতা আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথমে প্রকৃতির একরূপতা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে ইহাই প্রথম প্রমাণ। কিন্তু ইহাই অবশ্য যথেষ্ট নহে; তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রকৃতিতে অনিয়ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার কারণ হইত। প্রকৃতির একরূপতা আবিষ্কারের পূর্ব্বে একেশ্বরবাদ টিঁকিতে পারিত না। একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে বহু পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছার উপর হইতে বিশ্বাস হরণ করা চাই। যিনি সমস্ত প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যাঁহার ইচ্ছার বিচিত্র নিত্য বিকাশ, সেই অনন্তস্বরূপে বিশ্বাসস্থাপন করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি-বহির্ভূত সসীম দেবতার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গা চাই।

দ্বিতীয়, প্রকৃতির চিন্তাবশ্যতা। বেকন বলেন, বিজ্ঞান প্রকৃতির ব্যাখ্যান। কিন্তু যেখানে জ্ঞানের সম্পর্ক নাই সেখানে ব্যাখ্যা অসম্ভব; উন্মাদের কার্য্যের মধ্যে কে কবে সঙ্গতি বাহির করিতে পারিয়াছে? জ্ঞানসম্পর্কশূন্য পরমাণুসমষ্টির মধ্যে নিয়মও থাকিত না, বৈজ্ঞানিক আলোচনারও সুবিধা হইত না। এবং তাহা জ্ঞান উদ্রেক করিতেও পারিত না। এখন আমরা যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কার্য্যপ্রণালী তন্ন তন্ন বলিয়া দিতে

পারি সে এই জ্ঞানেরই সম্পর্কে। বিজ্ঞানের প্রতি নূতন আবিষ্কার প্রকৃতির অবিচলিত শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম—এক কথায়, জড়ের অন্তরে নিহিত জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। এবং এই জ্ঞান চিৎ ব্যতীত সম্পূর্ণ জড় হইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়, প্রকৃতির উন্নতিশীলতা। অন্য কথায়, অভিব্যক্তি। চতুর্দ্দিকের দুঃখকষ্ট দেখিয়া যখন ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে অবিশ্বাস জন্মে, তখন অভিব্যক্তিবাদ বুঝাইয়া দেয় যে, ইহারই মধ্য হইতে প্রতিদিন উন্নতির পর উন্নতি সূচিত হইতেছে। আরও বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান কিন্তু খামখেয়ালী নহেন। অসঙ্গত যথেচ্ছাচরণ তাঁহার স্বভাব নহে। কিন্তু ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলায় তিনি এই বিপুল সৃষ্টিকে প্রতিদিন অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন।

এইরূপে মোমারি সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতের ধর্ম্ম ঈশ্বরবাদী না হইয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মানবাত্মার অমরতা ভবিষ্যতের ধর্ম্মে টিঁকিবে কি না? মোমারি সাহেব বলিয়াছেন, টিঁকিবে। প্রথম কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই, বরঞ্চ অনুকূলে কিছু কিছু অনুমানসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্র আমরা যে শৃঙ্খলা এবং ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই, তাহা এই ভাবেরই অনুকূল। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অন্তরে চিরদিন সুখের জন্য তৃষ্ণা রহিয়াছে, অথচ সুখ আমাদের ভাগ্যে মিলে না; আমাদের অন্তরে পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা অহরহ পোষিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমরা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হীন; আমাদের অন্তরে ন্যায়ের যে উজ্জ্বলভাব মুদ্রিত হইয়া আছে, প্রতিবেশীদের সম্পদ্‌বিপদে

তাহা প্রতিদিন লজ্ঘিত হইতেছে ;—অমরতাই এই সকল বিরোধের একমাত্র মীমাংসা। তৃতীয়তঃ, সাধুতাকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভালবাসে, সে লাভের প্রত্যাশা রাখে না, সাধুতার জন্যই সে সাধুতার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু সৎ যদি নিতান্ত নশ্বর হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার আর আকর্ষণ থাকে না। অতএব, অমরতা ভবিষ্যতের ধর্ম্মে উপেক্ষিত না হইবারই সম্ভাবনা।

মোমারি সাহেবের শেষ প্রশ্ন, খৃষ্টধর্ম্ম এবং চার্চ থাকিবে কি না? উত্তর—এখন যাহা আছে, ইহা থাকিবে না। তিনি বলেন, যীশুখৃষ্টে ফিরিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা এখানে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। আমাদের পাঠকসাধারণের এ বিষয়ে বোধ করি বিশেষ আগ্রহ নাই।

কিন্তু মোমারি সাহেবের কথাটা পাল্টাইয়া আমরা স্বদেশের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমাদের দেশেরও প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক এই কথাগুলি খাটে। গুরুপুরোহিতদিগের বিধি-বিধান ত এখনই লজ্ঘিত হইতেছে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান অসুবিধাজনক তাহা কেহ মানে না। সমাজের সর্ব্বত্র কেবল একটা ভীষণ অবিশ্বাসের আধিপত্য। প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা ও কাপট্যাবলম্বন করিতে চারিদিক হইতে পরামর্শ বর্ষিত হয়। এই মিথ্যাচরণই বাহ্যতঃ এখন সমাজকে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহাই তাহার ক্ষয়ের কারণ। প্রতিদিন অল্পে অল্পে তাহার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ব বলসঞ্চয় করিতেছে—একদিন সহসা এ মিথ্যাজাল ছিন্ন করিয়া সে আপন প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিবে। সে দিন খুব বেশী দূর নহে।

স্বরলিপি।

বাহার—কাওয়ালি।

সব সখি মিলে গাওরে;
গাওরে, সবে, এই বিলাস-অলস সরস বসন্তে।
অদূরে বাঁশী মধুর বাজে,
ধরে তান বিহঙ্গ সবে
কত ললিত বিচিত্র স্বরে।
দেখ, পিককুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে,
কুহু কুহু মুহু মুহু কুহরে,
পাপিয়া ঝঙ্কারে।
ধীরে ধীরে মলয়ীর বিহরে,
সব বন আকুল চূত-মুকুল-বাসে;
তরুবর-পল্লব মর্ম্মরে হরষে,
তনু-থল করে শশী সরসে,
মলয়ের সুখকর পরশে,
মনখুলে সবে গাওরে।

০+৩

।০।১।২।৩।

০ ১ ॥ ২

॥ ধঞা পা মা মা। ধা -পমপা মঙ্গা -মা। ঞধা -ঞধা -ঞা -া।
॥ স ব স খি। মি — লে — ! গা — — ও !

৩

। র্সা -া -া -া। র্সা -া -া -া। ঞধা -ঞধা ঞা র্সা।
। রে — — —। গা — — ও। রে — স বে।

। ঞা ধা ধা ঞধা। -ঞা পপা মা পা। মা ম্গা গা গমা।
। এ ই, বি লা। — স,অ ল স। স র স, ব।

। রা -া সা -া। স-মা -া মা -া। পা পা পা পা।
। স — ন্তে —। অদৃ — রে —। বাঁ শ রী, ম।

। পা -র্সা -া র্সা। ঞর্সা -া ঞা -ধা। ঞা -া ঞা -া।
। ধু — — র। বা — জে —। ধ — রে —।

। ঞা -া -র্সা র্সা। র্সা ঞর্রা -া র্সা। র্সা র্সা ঞধা ঞা।
। তা — — ল। বি হ — ঙ্গ। স বে ক ভ

। র্সা র্সা ম্র্গা র্গা। র্মর্গর্মা র্রা র্সা র্সা। ধঞা পা মা মা।
। ল লি ত, বি। চি ত্র স্ব রে। স ব স খি।

। ধা -পমপা মগা -মা। ঞধা -ঞধা -ঞা -া। র্সা -া ধা ধা।
। মি — লে —। গা — — ও। রে — দে খ।

। মা ধা ধা ঞা। ঞা -র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সা -া।
। পি ক কু ল। আ — কু ল। কু — ঞ্জে —।

। র্সা -ঞা র্সা -া। ঞা ঞা র্রা র্সা। র্সা র্সা র্রা র্রা।
। কু — ঞ্জে —। কু হু কু হু। মু হু মু হু।

। ঞা ঞা র্সা -া। -ধা -া ধা ঞা। র্সা -র্রা -র্গা -র্মা।
। কু হ রে —। — — পা পি। য়া — — —।

। -র্মা -র্গা -র্রা -র্সা। -র্রা -র্সা -ঞা -ধা। পা র্সঞা র্সা -া।
। — — — —। — — — —। ঝ ঙ্কা রে —।

২
। সা -া মা -পা। মা -পা ম্গা -া। মা ধা -া পা।
। ধী — রে —। ধী — রে —। স মী — র।

। ধা ঞা র্সা -া। -া -া ধা ঞা। র্সা র্রা র্সা -ঞা।
। বি হ রে —। — স ব। ব ল. অ্য —।

। ধা ধা ঞা র্সা। ঙ্গা -ঙ্গর্সা র্রা র্সা। ঞধা -ঞা পা -া।
। কু ল, চূ ত। মু — কু ল। বা — সে —।

। সা সা না সা। গা -া মা মা। পা -া পা পা।
। ত রু ব র। প — ল্ল ব। ম — র্ম রে।

। পা পা পা -া। ঞা ঞা ঞা ঞা। ঞা ঞা র্সা র্সা।
। হ র ষে —। ত ল থ ল। ক রে ন শা।

। র্সা ঞা র্সা -া। ঞা র্রা র্সা র্সা। র্মা র্মা র্রা র্সা।
। স র সে —। ম ল য়ে র। সু খ ক র।

। ঞা ঞা র্সা -া। ধঞা পা মা মা। ধা -পমপা মঙ্গা -মা।
। প র শে —। ম ন খু লে। স — বে —।

। ঞধা -ধঞা র্সা -া॥
। গা ও রে —॥

ব্যাখ্যা।

ঙ্গ = কোমল গা; ঞ = কোমল নি।

লোক-চেনা।

আসঙ্গ-লিপ্সা।

আসঙ্গ-লিপ্সা অর্থাৎ সংসর্গ-বাসনা। বন্ধুতা, সমাজ-প্রিয়তা, মায়া-মমতা এই বৃত্তিরই প্রকারান্তর মাত্র। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বাৎসল্য-বৃত্তির স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাৎসল্য-বৃত্তির যে

স্থান তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিলে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের ঠিক্ মধ্যস্থলে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানটি বাস্তু-নিষ্ঠা অর্থাৎ গৃহানুরাগের স্থান। এই বাস্তু-নিষ্ঠার উভয় পার্শ্বে আসঙ্গ-লিপ্সা-বৃত্তি অবস্থিত।

ডাক্তার গল্‌কে কোন ব্যক্তি বলেন যে, তাঁহার পরিচিত একটি মহিলা আছেন, তিনি বন্ধুতার আদর্শ-স্থল—তাঁহার মাথার ছাঁচ তুলিলে ভাল হয়। ডাক্তার গল্ তখন জানিতেন না বন্ধুতা-বৃত্তির স্থান কোথায়। তিনি সেই মহিলার মস্তকের ছাঁচ তুলিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার মাথার পশ্চাদ্ভাগের দুই পার্শ্বে ঢিবির মত উঁচু হইয়া আছে। তাহা হইতেই তাঁহার প্রথম মনে হইল, উহাই বন্ধুতার স্থান। ক্রমে অনেক মস্তক পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ধারণা আরও দৃঢ় হইল। এইরূপে তিনি আসঙ্গ-লিপ্সার স্থান আবিষ্কার করিলেন।

যাহাদিগের এই বৃত্তি বলবতী, তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত মমতা-ময়—ভালবাসার প্রতিদান পাইলে তাহারা অতীব সুখী হইয়া থাকে। তাহারা ভালবাসার বস্তুকে আগ্রহের সহিত আলি-ঙ্গন করে—বন্ধুদিগের হস্তপীড়ন করিবার সময় দৃঢ়ভাবে আগ্রহের সহিত হস্তপীড়ন করে। যে সকল বালকদিগের এই বৃত্তি প্রবল, তাহারা কুকুর, খর্গস, পাখী প্রভৃতি জীবজন্তু পুষিতে ভালবাসে। এই বৃত্তি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বেশী প্রবল; স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই মায়া-মমতার পরা-কাষ্ঠা দেখা যায়। এমন কি, রাজদণ্ডার্হ অধম অপরাধীদিগের মধ্যেও এই বৃত্তির জ্বলন্ত প্রকাশ কখন কখন দেখা যায়। হত্যা-পরাধে মেরি ম্যাসিন্ নামক কোন স্ত্রীলোকের এডিনবরা নগরে ফাঁসি হয়। সে এক ব্যক্তিকে ভালবাসিত। সে ভাল

ঘাসা তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। যে পুরুষ তাহাকে ভালবাসিত, সে তাহাকে একটা রুমাল পাঠাইয়া দেয়—রুমালের এক কোণে তার নিজের নাম লিখিয়া দিয়াছিল। এবং তাহার সহিত আধখানা কমলানেবু পাঠাইয়াছিল। আর তার এই অনুরোধ ছিল যে, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ যে আধখানা কমলানেবু পাঠাইতেছে তাহা যেন সে ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চে উঠিবার সময় আহার করে—বাকী অর্দ্ধ ঠিক্ সেই সময়ে সেও আহার করিবে। যে দিন তাহার ফাঁসি হইবে তাহার পূর্ব্বদিনের সমস্ত রাত্রি সেই রুমালের কোণাটি সে মুখে করিয়া ছিল—এমন কি সেই ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চে উঠিয়াও তাহা ছাড়ে নাই। ঠিক্ ফাঁসি হইবার সময়ে কারারক্ষক তাহাকে সেই আধখানা কমলানেবু দিল—এবং সে কমলানেবুটি লইয়া নির্ভীকভাবে এই কথা বলিল, "তাকে বোলো; আমাকে বাঁচাইবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে জেনে আমি সুখে মরিতেছি এবং তাহার কথামত আমি কমলানেবুটি খাইতেছি। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। তাকে বোলো, আমার এই মৃত্যুকালের শেষ অনুরোধ, সে যেন মদ্যপান ও কুসংসর্গ ত্যাগ করে, আর অধিক রাত্রি করিয়া বাড়ি না আসে।" এই স্ত্রীলোকের মাথার ছাঁচ তোলা হইয়াছিল। আসঙ্গ-লিপ্সার বৃত্তি-স্থান উহাতে খুব বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে এই বৃত্তি বিভিন্ন আকারে দৃষ্ট হয়। কেহ বা লোকসমাজে মেশামিশি করিতে ভালবাসে—কিন্তু বন্ধুত্ব করিতে পারে না। কাহারও আলাপী অনেক কিন্তু একটিও বন্ধু নাই। কেহ বা বেশী লোকের সহিত আলাপ করিতে পারে না—কিন্তু দুই চারি জনের সহিত তাহার অকাট্য বন্ধুত্ব। চরিত্র দুই জনের হয় তো সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ

সহিত বন্ধু নির্ব্বাচন করে। যাহার আনন্দ-লিপ্সা বেশী এবং সেই সঙ্গে জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, আত্মাভিমান, দৃঢ়তা ও দয়া অত্যন্ত বেশী এবং যশোলিপ্সা গোপনেচ্ছা ও ন্যায়পরতা কম, সে যেমন উৎসাহী বন্ধু তেমনি ভীষণ শত্রু হইতে পারে। বন্ধু হইলে তাহার মত আর বন্ধু নাই, শত্রু হইলে তাহার মত আর শত্রু নাই। আনন্দ-লিপ্সার সহিত যাহাদের বাৎসল্য ও স্ত্রৈপুরুষিক আসক্তি অত্যন্ত প্রবল তাহারা নিজ পরিবার ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহারা অত্যন্ত গৃহ-নিষ্ঠ।

পঞ্চভূতের ডায়ারি।

দৃশ্য। পদ্মাতীরস্থ পল্লিগ্রাম। বারান্দার সম্মুখে নদীতটে একখণ্ড ধান্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। ঘনরোপিত শিশু ধান্যবৃক্ষগুলি যেন গাঢ় সবুজবর্ণের অগ্নিশিখার মত কাঁপিতেছে। এই নিবিড় সবুজ রঙটি যেন নিরতিশয় নিদ্রার মত দৃষ্টিকে আপনার অন্তস্তলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে চায়, দু'টি চক্ষু তাহার সুগভীর কোমলতার মধ্যে বারম্বার অবগাহন করিয়া কিছুতেই আর তৃপ্তির শেষ পায় না। এই শ্যামলতা রমণীর যৌবন-সৌন্দর্য্যের মত অতলস্পর্শ। নির্ম্মল নীলাকাশের অবারিত জ্যোতি এই সরস সম্পূর্ণ সতেজ লাবণ্যরাশির উপরে অনিমেষ প্রেম-দৃষ্টিপাতের মত পড়িয়া রহিয়াছে, এবং সৌভাগ্যমতী পৃথিবীর আনন্দপুলক অবিশ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।

শরৎকাল। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কি এক নূতন উত্তাপের দ্বারা সোণাকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে, সোণা আর নাই, কেবল তাহার সুবর্ণময়

লাবণ্যে দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ুহিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে। কাজকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে, না, মন্ত্রমুগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে বুঝা যায় না।

আমি বলিতেছিলাম—শরতের প্রভাতে যেন বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত-আকারে হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করে। কবিতায় অনেক সময়ে এই স্মৃতি-জাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিকটি বোঝা যায় না, মনে হয় ও একটা কবিতার অলঙ্কারমাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ! বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিসের স্মৃতি তাহার কোন ঠিকানা নাই। যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই তাহাকে এতদেশ থাকিতে স্মৃতিই বা কেন বলিব, বিস্মৃতিই বা না বলিব কেন, তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু "বিস্মৃতি জাগিয়া ওঠে" এমন একটা কথা ব্যবহার করিলে শুনিতে বড় অসঙ্গত বোধ হয়। অথচ কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। অতীত জীবনের যে সকল শতসহস্র স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া চিনিবার যো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতন মহাদেশের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যাহারা বিস্মৃতি-মহাসাগররূপে নিস্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা কোন কোন সময়ে চন্দ্রোদয়ে অথবা দক্ষিণের বায়ুবেগে একসঙ্গে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের চেতন হৃদয় সেই বিস্মৃতি-তরঙ্গের আঘাত অভিঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যপূর্ণ অগাধ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত

অতিবিস্তৃত বিপুলতার একতান ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শরতের ঐ দিগন্তসংলগ্ন শুভ্র মেঘখণ্ড যেমন, হৃদয়ের এই অনির্দ্দিষ্ট ভাবটিও সেইরূপ। যে জলকণা সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে রুদ্রনৃত্যে যোগ দিত এবং যে শিশিরবিন্দুটি যূথীকলিকার মুখাগ্রভাগে দোদুল্যমান ছিল, তাহারা বাষ্প হইয়া ঐ মেঘের মধ্যে এক হইয়া আছে; পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃদু বায়ুভরে অনন্ত আকাশময় স্বপ্নের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে; সহসা এক সময়ে আপনাকে ধারণ করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া এক পস্‌লা অশ্রুধারার মত ঝরিয়া পড়িবে।——

—শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমার এই আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে হাস্য-সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন—ভ্রাতঃ, করিতেছ কি! এইবেলা সময় থাকিতে ক্ষান্ত হও। কবিতা ছন্দে শুনিতেই ভাল লাগে—তাহাও সকল সময়ে নহে। কিন্তু সরল গদ্যের মধ্যে যদি তোমরা পাঁচজনে পড়িয়া কবিতা মিশাইতে থাক, তবে, তাহা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য হইয়া উঠে। বরং দুধে জল মিশাইলে চলে, গোপবংশে এমন সাধুপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করে নাই যে উক্তকার্য্যে লিপ্ত নহে, কিন্তু জলে দুধ মিশা-ইলে তাহাতে প্রাত্যহিক স্নান পান চলে না। কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশ্রিত করিলে আমাদের মত গদ্যজীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়—কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।—

—বাস্! মনের কথা আর নহে। আমার শরৎ-প্রভাতের নবীন ভাবাঙ্কুরটি প্রিয় বন্ধু ক্ষিতি তাঁহার তীক্ষ্ণ নিড়ানীর একটি খোঁচায় একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। একটা তর্কের

কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে, কি পাগ্‌লামি করিতেছ, তবে কোন যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্য ভাবের কথা পাড়িতে হইলে প্রাচীন গুণীরা শ্রোতাদের হাতেপায়ে ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। বলিতেন, সুধীগণ মরালের মত নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন; নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া সভাস্থ লোকের গুণগ্রাহিতার প্রতি একান্ত নির্ভর প্রকাশ করিতেন। কখনো বা ভবভূতির ন্যায় সুমহৎ দম্ভের দ্বারা আরম্ভ হইতেই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এবং এত করিয়াও ঘরে ফিরিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, যে দেশে কাচ এবং মাণিকের এক দর, সে দেশকে নমস্কার। দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন "হে চতুর্ম্মুখ, পাপের ফল আর যেমনই দাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু অরসিকের কাছে রসের কথা বলা এ কপালে লিখিয়ো না, লিখিয়ো না, লিখিয়ো না!" বাস্তবিক, এমন শাস্তি আর নাই। জগতে অরসিক না থাকুক, এত বড় প্রার্থনা দেবতার কাছে করা যায় না, কারণ, তাহা হইলে জগতের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। অরসিকের দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাঁহারা জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁহারা না থাকিলে সভা বন্ধ, কমিটি অচল, সংবাদপত্র নীরব, সমালোচনার কোঠা একেবারে শূন্য; এজন্য, তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু

ঘানিযন্ত্রে শর্ষপ ফেলিলে অজস্রধারে তৈল বাহির হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়া কেহ মধুর প্রত্যাশা করিতে পারে না—অতএব হে চতুর্ম্মুখ, ঘানিকে চিরদিন সংসারে রক্ষা করিও, কিন্তু তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়ো না এবং গুণীজনের হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়ো না!

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর কোমল হৃদয় সর্ব্বদাই আর্ত্তের পক্ষে। তিনি আমার দুরবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কহিলেন "কেন, গদ্যে পদ্যে এতই কি বিচ্ছেদ!"

আমি কহিলাম—পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যদি কোন রূঢ় স্বভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোন অস্ত্র নাই। এইজন্য, অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। গদ্য কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয়ের ভাবটিকে যদি সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম, তবে ক্ষিতি কেন, কোন ক্ষিতিপতির সাধ্য ছিল না তাহাকে সহসা আসিয়া পরিহাস করিয়া যায়!

ব্যোম গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া নিমীলিতনেত্রে কহিলেন—আমি ঐক্যবাদী। একা গদ্যের দ্বারাই আমাদের সকল আবশ্যক সুসম্পন্ন হইতে পারিত, মাঝে হইতে পদ্য আসিয়া মানুষের মনোরাজ্যে একটা অনাবশ্যক বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে; কবি নামক একটা স্বতন্ত্রজাতির সৃষ্টি করি-

য়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে যখন সাধারণের সম্পত্তি অর্পিত হয়, তখন তাহার স্বার্থ হয় যাহাতে সেটা অন্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠে। কবিরাও ভাবের চতুর্দ্দিকে কঠিন বাধা নির্ম্মাণ করিয়া কবিত্ব নামক একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। কৌশল-বিমুগ্ধ জনসাধারণ বিস্ময় রাখিবার স্থান পায় না। এমনি তাহাদের অভ্যাস বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ছন্দ ও মিল আসিয়া ক্রমাগত হাতুড়ি না পিটাইলে তাহাদের হৃদয়ের চৈতন্য হয় না, স্বাভাবিক সরল ভাষা ত্যাগ করিয়া ভাবকে পাঁচরঙা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। ভাবের পক্ষে এমন হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। পদ্যটা না কি আধুনিক সৃষ্টি, সেই-জন্যে, সে হঠাৎ-নবাবের মত সর্ব্বদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আমি তাহাকে দু' চক্ষে দেখিতে পারি না। এই বলিয়া ব্যোম পুনর্ব্বার গুড়গুড়ি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যোমের প্রতি অবজ্ঞাকটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কেবল জন্তুদের মধ্যে নহে, মানুষের রচনার মধ্যেও খাটে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবেই ময়ূরীর কলাপের আবশ্যক হয় নাই, ময়ূরের পেখম ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। কবিতার পেখমও সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, কবিদিগের ষড়যন্ত্র নহে। অসভ্য হইতে সভ্য এমন কোন দেশ আছে যেখানে কবিত্ব স্বভাবতই ছন্দের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই!

শ্রীযুক্ত সমীরণ এতক্ষণ মৃদুহাস্যমুখে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে ছিলেন। দীপ্তি যখন আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি

একটা সৃষ্টিছাড়া কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, কৃত্রিমতাই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান গৌরব। মানুষ ছাড়া আর কাহারো কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই। গাছকে আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্ম্মাণ করিতে হয় না, ময়ূরের পুচ্ছ প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মানুষকেই বিধাতা আপনার সৃজন-কার্য্যের অ্যাপ্রেণ্টিস্ করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটখাটো সৃষ্টির ভার দিয়াছেন। সেই কার্য্যে যে যত দক্ষতা দেখাইয়াছে, সে তত আদর পাইয়াছে। পদ্য গদ্য অপেক্ষা অধিক কৃত্রিম বটে; তাহাতে মানুষের সৃষ্টি বেশী আছে; তাহাতে বেশী রঙ ফলাইতে হইয়াছে, বেশী যত্ন করিতে হইয়াছে। আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্ম্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজন-কক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য অধিক আছে। সেই তাহার প্রধান গৌরব। অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্ম্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।

স্রোতস্বিনী অবহিত ছাত্রীর মত সমীরণের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার সুন্দর নম্র মুখের উপর একটা যেন নূতন আলোক আসিয়া পড়িল। অন্যদিন নিজের একটা মত বলিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করিতেন, আজ সেরূপ না করিয়া একেবারে আরম্ভ করিলেন, "সমীরণের কথায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে—আমি ঠিক পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না। সৃষ্টির যে অংশের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে অংশ শুদ্ধমাত্র আমাদের মনে জ্ঞানসঞ্চার করে

একটু পরিষ্কার করিয়া বল না। এমন সময় ব্যোম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সমস্ত বিশ্বরচনা যে কৃত্রিম এমন মতও আছে। স্রোতস্বিনী যেটাকে ভাবের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি, সেটা যে মায়ামাত্র, অর্থাৎ আমাদের মনের কৃত্রিম রচনা একথা অপ্রমাণ করা বড় কঠিন।

ক্ষিতি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—তোমরা সকলে মিলিয়া ধান ভানিতে শিবের গান তুলিয়াছ। কথাটা ছিল এই, ভাবপ্রকাশের জন্য পদ্যের কোন আবশ্যক আছে কি না। তোমরা তাহা হইতে একেবারে সমুদ্র পার হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব, লয়তত্ত্ব, মায়াবাদ প্রভৃতি চোরাবালির মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার বিশ্বাস ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোট ছেলেরা যেমন ছড়া ভালবাসে, তাহার ভাবমাধুর্য্যের জন্য নহে—কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝঙ্কারমাত্রই কানে ভাল লাগিত। এইজন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্ব্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, ততই ছন্দের সঙ্গে অর্থ সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, তত্ত্ব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

দীপ্তি গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন—ভাগ্যে আমাদের সমস্ত অংশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ওঠে না! মানুষের নাবালক অংশটিকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই, তাহারই কল্যাণে জগতে যা' কিছু মিষ্টত্ব আছে।

নিয়মে বাঁধিয়া চলিতে হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্তসংস্কার আছে যে, গতিই স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ, এবং স্থিতিই বন্ধন। তাহার কারণ, ইচ্ছাই মনের একমাত্র গতি এবং ইচ্ছা অনুসারে চলাকেই মূঢ় লোকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা জানিতেন, ইচ্ছাই আমাদের সকল গতির কারণ, সকল বন্ধনের মূল; এই জন্য মুক্তি, অর্থাৎ চরম স্থিতি লাভ করিতে হইলে ঐ ইচ্ছাটাকে গোড়া-ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে তাঁহারা বিধান দেন, দেহমনের সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ করাই যোগসাধন।

সমীরণ ব্যোমের পৃষ্ঠে হাত দিয়া সহাস্যে কহিলেন, একটা মানুষ যখন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, তখন মাঝখানে তাহার গতিরোধ করার নাম গোলযোগ সাধন।

আমি কহিলাম, বৈজ্ঞানিক ক্ষিতির নিকট অবিদিত নাই যে, গতির সহিত গতির, এক কম্পনের সহিত অন্য কম্পনের ভারী একটা কুটুম্বিতা আছে। সা সুরের তার বাজিয়া উঠিলে মা সুরের তার কাঁপিয়া উঠে। আলোক-তরঙ্গ, উত্তাপ-তরঙ্গ, ধ্বনি-তরঙ্গ, স্নায়ু-তরঙ্গ প্রভৃতি সকলপ্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এইজন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পনের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ু-দোলায় দোল দিয়া যায়, আলোক-রশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ু-তন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চিরকম্পিত স্নায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদায় স্পন্দনের ছন্দে নানাসূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে ইমোশন্ বলে, তাহা

আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ গতি ; তাহার সহিতও অন্যান্য বিশ্বকম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত তাহার এ কটা স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে।

এইজন্য সঙ্গীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে—সে যে হৃদয়ের স্বদেশী ভাষা বলে। হৃদয় যেমন করিয়া কাঁপে, সেও যে ঠিক তেমনি করিয়া কাঁপিতে থাকে; তাহার ধ্বনির তরঙ্গ ঠিক যে হৃদয়ের সমান ছন্দে উত্থান-পতন করে। এইজন্য উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে যেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে।

এই কারণে সঙ্গীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত অন্তরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দ্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। আমিও কখনো কখনো এমনতর ভাব অনুভব করিয়াছি এবং এমনতর ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকিব। কেবল সঙ্গীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্য্যাস্তছটাও কত-বার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্বজগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্ব্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে, তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের কোন যোগ নেই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত এবং সূর্য্যাস্ত কেন, যখন কোন প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা মহৎ ধর্ম্ম, একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মত অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্য যেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মত্ততা আকর্ষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য্যযোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত একদলে মিশিয়া অনিবার্য্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

এই ভাবকে কবিরা কত ভাষায় কত উপায়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কত লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই—মনে করিয়াছে উহা কবিদের কাব্যকুয়াশা মাত্র।

কারণ, ভাষার ত হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সে দূতমাত্র, হৃদয়ের খাস্‌মহলে তাহার অধিকার নাই, আম্‌ দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্ত্তা জানাইয়া যায় মাত্র। তাহাকে বুঝিতে, অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সঙ্গীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।

এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্গীত নিযুক্ত করিয়া দেন। সে আপন মায়াস্পর্শে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে, তখন ভাষার কার্য্য অনেক সহজ হইয়া আসে। দূরে যখন বাঁশি

বাজিতেছে, পুষ্পকানন যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়। সৌন্দর্য্য যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ের সহিত ভাবের পরিচয় সাধন করিতে পারে এমন আর কেহ নয়।

কেবল তাহাই নয়। ভাবের সহিত সঙ্গীত যোগ করিয়া কবিতা তাহার সমস্ত দৈন্য দূর করিয়া দেয়। তাহাকে প্রতিদিনের ধূলিতল হইতে তুলিয়া লইয়া একটি সৌন্দর্য্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি অনন্তের সুর বাজিতে থাকে। পৃথিবীর চারিদিকে রহস্যময় জ্যোতিষ্কখচিত নীলাকাশ যেমন, ভাবের চারিদিকে সঙ্গীত তেমনি। চারিদিকে এই আকাশটি থাকাতে আমাদের ধূলির পৃথিবীরও এত গৌরব, তাই আমরা মর্ত্ত্যভূমির সমস্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বর্গের সহিত, অনন্ত জগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিয়াছি। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য্য থাকাতে আমাদের প্রতিদিবসের ভাবগুলি চিরদিবসের হইয়া দাঁড়ায়, আমাদের চিত্তকোটরের সুখদুঃখ বেদনার উপর অনন্তের জ্যোতি নিপতিত হইয়া তাহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়।

সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সঙ্গীতের দুই অংশ। গ্রীকরা "জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গীত" বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, শেক্স্‌পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটা গতির সঙ্গে আর একটা গতির বড় নিকটসম্বন্ধ। অনন্ত আকাশ যুড়িয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহা সঙ্গীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ সঙ্গীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পা-

ষিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়। যদি কৃত্রিম কিছু হয় ত ভাষাই কৃত্রিম, সৌন্দর্য্য কৃত্রিম নহে। ভাষা মানুষের, সৌন্দর্য্য সমস্ত জগতের এবং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিলেন—নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে, তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা কার্য্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে—আমাদের মনটা নাট্য-প্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

ব্যোম চোখ বুজিয়া কহিলেন—শেক্স্‌পিয়র বলেন, সমস্ত সংসারটা নাট্যশালা। প্রকৃতি নামক একটি নটী রঙ মাখিয়া অভিনয় করিতেছে, প্রলয়ের পঞ্চমাঙ্কে এই মহা ট্র্যাজেডির অবসান।—ওরে তামাক দিয়ে যা! আগুন নিভে গেছে।

দার্শনিক মতামত।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্য-জীবনের আবর্ত্ত দুই পাক ঘুরিলে নিম্ন-লিখিত প্রকার পর্য্যায়-ক্রমের অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে—যথা,

	অহং	
	মন	(জিজ্ঞাসা)
সাংখ্যের অভিব্যক্তি-ক্রম	বুদ্ধি	(সামান্য জ্ঞান)
	পুনরায়	
	অহং	(অহঙ্কার)
	মন	(মীমাংসা)
	বুদ্ধি	(বিজ্ঞান)

এই ছয়টি ধাপের মধ্য হইতে প্রথমজন্মের বুদ্ধি ও দ্বিতীয় জন্মের অহংকার এবং মন, এই তিন বৃত্তিকে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি হইতে মন পর্য্যন্ত যে একটি ধারাবাহিক অভিব্যক্তির ক্রম নিরূপিত হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের প্রদর্শিত অভিব্যক্তি-ক্রমের সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। তা' ছাড়া—আমরা পরে দেখাইব যে, প্রথম জন্মের অহং এবং মন—প্রকৃতি-শব্দের অভিধেয়, এবং সেই প্রকৃতি গুণত্রয়ের সঙ্ঘাত। কিন্তু এইসূত্রে কোনো কোনো পরমতান্বেষী পাঠকের মনে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে—তিনি মনে করিতে পারেন যে, লেখক নিশ্চয়ই সাংখ্য-মতাবলম্বী। এই সব মত-চর্চ্চার গোলোযোগ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নির্ব্বিবাদে সত্যান্বেষণ করি, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিলাষ; এইজন্য নিম্ন-লিখিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আমরা আমা-

উত্তর। অবশ্য! (অশ্বত্থমা হতো বটে—কিন্তু ইতি গজো! স্বমত খদ্যোত বটে—কিন্তু অন্যের চক্ষে!)

উপরি-উক্ত দুই-মুখা প্রশ্নোত্তর কোন্ পাঠক কি ভাবে গ্রহণ করেন বলিতে পারি না—B. A. মহোদয় হয় তো বলিবেন "Contradiction in terms", তর্কালঙ্কার মহাশয় হয় তো বলিবেন "বদতো ব্যাঘাতঃ", বন্ধুলোকে হয় তো বলিবে, "বুঝিতে পারিলাম না", শত্রুলোকে বলিবে "আর বিলম্ব নাই!" ইত্যাদি। অতএব ঐ দুই প্রশ্নোত্তরের একটু টীকা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। প্রথম প্রশ্নোত্তরে "না" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা নহি" অর্থাৎ "তুমি যাহা বলিতেছ আমি সর্ব্বাংশে তাহা নহি।" দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে "হাঁ" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যতটা ভাবিতেছ ততটা নহে,—কিন্তু কতকপরিমাণে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা বটে।" কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই—যাহা বলিলাম সমস্ত শুনিয়া একজন বাহিরে চস্‌মা-চক্ষু এবং অন্তরে দিব্য-চক্ষু M. A. মহাত্মা হয়তো আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া বলিবেন "ওহো! Eclectic?" ইহারও উত্তর পূর্ব্ববৎ না এবং হাঁ দুইই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা অক্ষর "এ" এবং ইংরাজি অক্ষর "k" জোড়া দিয়া যদি "এক" গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার সঙ্গে পারস্য অক্ষরে "লেক্" এবং চীন-দেশীয় অক্ষরে "টিক্" জোড়া দিয়া "এক্‌লেক্‌টিক্" গড়িয়া তোলা হয়, তবে তাহা যে সাপ ব্যাঙ কি হইল—তাহা সকল দেশের সকল লোক একত্র জোটবদ্ধ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তাহার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইবে না—এরূপ কিম্ভূত কিমাকার পাঁচমিশালী বেখাপ আবির্ভাব-বিশেষকে যদি

Eclecticism বলা যায়—তবে আমরা Eclectic নহি। কি অর্থে আমরা Eclectic "না" তাহা বলিলাম, কি অর্থে "হাঁ" তাহা এখন বলি; আমি ক্ষুধিত—আমার সম্মুখে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত—"আপ্‌রুচি খানা"—পায়স মিষ্ট বলিয়া কেবল তাহাকেই সার করিতেছি না, আর, পল্‌তার ঝোল তিক্ত বলিয়া তাহাকেও ছার করিতেছি না—আমার শিক্ষা জঠরানলের নিকট হইতে—জঠরানল সকল বস্তু হইতেই ছার পরিত্যাগ করিয়া সারসংগ্রহ করে; ইহার নাম যদি Eclecticism হয় তবে আমি Eclectic হইতে অরাজি নহি—"অরাজি" শব্দই তাহার প্রমাণ। রূপক ছাড়িয়া দিয়া সাদা কথায়—সাংখ্যের কি মত, বেদান্তের কি মত, ইত্যাদি নানা মুনির কাহার কি মত তাহা আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য নহে—আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য—সত্য কি? সত্য অন্বেষণ করিতে করিতে যদি কাহারো কোন মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, তবে তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া আমরা তাহা হইতে ("পলালমিব ধান্যার্থী") তুষাংশ পরিত্যাগ করিয়া ধান্যাংশ আত্মসাৎ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আমরা সত্যের অনুরোধে কখনো বা সাংখ্যের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, কখনো বা বেদান্তের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, কখনো বা কাণ্টের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, শতমুনির শত মত অবলম্বন করিব; কিন্তু আমাদের নিজের একটা মত গোড়ায় স্থির আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া না দেখিয়া কাহারো কোনো মতকে আমরা সহসা আমাদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না;—এইজন্য ঐ সকল নানা মতের যে অংশ-গুলা পরস্পর-বিরোধী তাহা আমাদের আলোচনা-ক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারিবে না,—দ্বারোপান্তে এইরূপ একটি

Eclecticism বলা যায়—তবে আমরা Eclectic নহি। কি অর্থে আমরা Eclectic "না" তাহা বলিলাম, কি অর্থে "হাঁ" তাহা এখন বলি; আমি ক্ষুধিত—আমার সম্মুখে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত—"আপ্‌রুচি খানা"—পায়স মিষ্ট বলিয়া কেবল তাহাকেই সার করিতেছি না, আর, পল্‌তার ঝোল তিক্ত বলিয়া তাহাকেও ছার করিতেছি না—আমার শিক্ষা জঠরানলের নিকট হইতে—জঠরানল সকল বস্তু হইতেই ছার পরিত্যাগ করিয়া সারসংগ্রহ করে; ইহার নাম যদি Eclecticism হয় তবে আমি Eclectic হইতে অরাজি নহি—"অরাজি" শব্দই তাহার প্রমাণ। রূপক ছাড়িয়া দিয়া সাদা কথায়—সাংখ্যের কি মত, বেদান্তের কি মত, ইত্যাদি নানা মুনির কাহার কি মত তাহা আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য নহে—আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য—সত্য কি? সত্য অন্বেষণ করিতে করিতে যদি কাহারো কোন মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়, তবে তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া আমরা তাহা হইতে ("পলালমিব ধান্যার্থী") তুষাংশ পরিত্যাগ করিয়া ধান্যাংশ আত্মসাৎ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আমরা সত্যের অনুরোধে কখনো বা সাংখ্যের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, কখনো বা বেদান্তের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, কখনো বা কাণ্টের কোনো একটা মত অবলম্বন করিব, শতমুনির শত মত অবলম্বন করিব; কিন্তু আমাদের নিজের একটা মত গোড়ায় স্থির আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া না দেখিয়া কাহারো কোনো মতকে আমরা সহসা আমাদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না;—এইজন্য ঐ সকল নানা মতের যে অংশ-গুলা পরস্পর-বিরোধী তাহা আমাদের আলোচনা-ক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারিবে না,—দ্বারোপান্তে এইরূপ একটি

উত্তর। অবশ্য! (অশ্বত্থমা হতো বটে—কিন্তু ইতি গজো! স্বমত খদ্যোত বটে—কিন্তু অন্যের চক্ষে!)

উপরি-উক্ত দুই-মুখা প্রশ্নোত্তর কোন্ পাঠক কি ভাবে গ্রহণ করেন বলিতে পারি না—B. A. মহোদয় হয় তো বলিবেন "Contradiction in terms", তর্কালঙ্কার মহাশয় হয় তো বলিবেন "বদতো ব্যাঘাতঃ", বন্ধুলোকে হয় তো বলিবে, "বুঝিতে পারিলাম না", শত্রুলোকে বলিবে "আর বিলম্ব নাই!" ইত্যাদি। অতএব ঐ দুই প্রশ্নোত্তরের একটু টীকা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। প্রথম প্রশ্নোত্তরে "না" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা নহি" অর্থাৎ "তুমি যাহা বলিতেছ আমি সর্ব্বাংশে তাহা নহি।" দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে "হাঁ" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যতটা ভাবিতেছ ততটা নহে,—কিন্তু কতকপরিমাণে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা বটে।" কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই—যাহা বলিলাম সমস্ত শুনিয়া একজন বাহিরে চস্‌মা-চক্ষু এবং অন্তরে দিব্য-চক্ষু M. A. মহাত্মা হয়তো আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া বলিবেন "ওহো! Eclectic?" ইহারও উত্তর পূর্ব্ববৎ না এবং হাঁ দুইই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা অক্ষর "এ" এবং ইংরাজি অক্ষর "k" জোড়া দিয়া যদি "এক" গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার সঙ্গে পারস্য অক্ষরে "লেক্" এবং চীন-দেশীয় অক্ষরে "টিক্" জোড়া দিয়া "এক্‌লেক্‌টিক্" গড়িয়া তোলা হয়, তবে তাহা যে সাপ ব্যাঙ কি হইল—তাহা সকল দেশের সকল লোক একত্র জোটবদ্ধ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তাহার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইবে না—এরূপ কিম্ভূত কিমাকার পাঁচরঙা বেখাপ আবির্ভাব-বিশেষকে যদি

[illegible] মতামত হইতে [illegible] করিয়া [illegible] মনকে [illegible] করিতেছি—

প্রশ্ন। সাংখ্যমতাবলম্বী?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। বৈদান্তিক?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। স্কাটিষ্ট্।

উত্তর। না।

প্রশ্ন। স্পেন্সীরিয়ান্।

উত্তর। কোনো অংশে না।

প্রশ্ন। সংশয়বাদী?

উত্তর। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—না।

প্রশ্ন। স্বমতাবলম্বী?

উত্তর। কোথায় চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, কোথায় খদ্যোত! না।

মতান্বেষী ব্যক্তি যদি দ্বিতীয়বার ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তবে দ্বিতীয়প্রকার উত্তর পাইবেন যথা,—

প্রশ্ন। সাংখ্যমতাবলম্বী?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। বৈদান্তিক?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। স্কাটিষ্ট্?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। সংশয়বাদী?

উত্তর। সংশয়ই জ্ঞানের প্রথম পৈঁঠে (Decentes)—হাঁ।

প্রশ্ন। স্বমতাবলম্বী?

উত্তর। অবশ্য! (অর্থাৎ [illegible] বটে—[illegible] ইতি পাঠো! অমত অন্যো [illegible]—কিন্তু [illegible]!)

উপরি-উক্ত এই-মুখা প্রশ্নোত্তর কেহ পাঠক কি ভাবে গ্রহণ করেন বলিতে পারি না—B. A. মহোদয় হয় তো বলিবেন "Contradiction in terms", তর্কবাগীশ মহাশয় হয় তো বলিবেন "[illegible]", বন্ধুলোকে হয় তো বলিবে, "বুঝিতে পারিলাম না", শত্রুলোকে বলিবে "আর বিলম্ব নাই!" ইত্যাদি। অতএব এই দুই প্রশ্নোত্তরের একটু টীকা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। প্রথম প্রশ্নোত্তরে "না" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা নহি" অর্থাৎ "তুমি যাহা বলিতেছ আমি সর্ব্বাংশে তাহা নহি!" দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরে "হাঁ" শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, "তুমি যতটা ভাবিতেছ ততটা নহে,—কিন্তু কতকপরিমাণে তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা বটে।" কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই—যাঁহারা বলিয়া গমন শুনিয়া একজন বাহিরে চশমা-চক্ষু এবং অন্তরে দিব্য-চক্ষু J. A. মহাত্মা হয়তো আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া বলিবেন "ওহো! Dialectic?" ইহাতেও উত্তর পূর্ব্বকং না এবং হাঁ দুইই। আমাদের এক বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা অক্ষর "এ" এবং ইংরাজি অক্ষর "E" জোড়া দিয়া যদি "ঐ" গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার সঙ্গে পারস্য অক্ষরে "লেহ্" এবং চীন-দেশীয় অক্ষরে "টিক্" জোড়া দিয়া "এক্সলেকটিক্" গড়িয়া তোলা যায়, তবে তাহার সঙ্গে ব্যাঙ কি হইল—তাহা সকল দেশের সকল লোক একত্র জোটবদ্ধ হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেও কেহই তাহার অক্ষিসন্ধি খুঁজিয়া পাইবে না।—এরূপ [illegible] পাঁচমেলা [illegible] আবির্ভাব-বিশেষকে যদি

কাল প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইলেই তাহা স্থগিত হয় এবং তখন হইতে বুদ্ধাব্দ বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত হয়। ১৪৮ অঞ্জনাব্দে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৪৮ অঞ্জনাব্দে পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দ ৫৪৩ ছিল, এবং যেহেতু বুদ্ধ ৮০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার জন্মবৎসর সেইজন্য পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দ ৬২৩ বলিয়া ধার্য্য করা যাইতে পারে।

কানিংহাম সাহেব এই গণনাতে ৬৬বৎসর ভুল আছে ইহা স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধ ৫৫৮ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মত যে সর্ব্বসম্মত তাহা বলিতে পারি না। সেইজন্য যে অব্দ সিংহলদেশে বরাবর প্রচলিত আছে তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম। বোধ হয়, সময়ক্রমে নূতন আলোক আসিয়া সন্দেহ-তিমির দূর করিয়া দিবে।

বৌদ্ধদিগের মতে যেদিন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, সেইদিন তাঁহার পত্নী যশোধরার জন্ম হয়, সেইদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং প্রিয় অশ্ব কণ্টিক জন্মলাভ করে, এবং সেইদিন উরুবেল জঙ্গলে বোধিদ্রুম বলিয়া প্রসিদ্ধ অশ্বত্থবৃক্ষও অঙ্কুরিত হয়।

বুদ্ধের জন্মসংবাদ কপিলবস্তু এবং ব্যাঘ্রপুরে প্রেরিত হইল। উভয় স্থান হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া তাঁহাকে পিতৃসদনে লইয়া গেল। ঘোর আনন্দের কোলাহল চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। প্রজাদিগের আনন্দিত হইবার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ শুদ্ধোদন অতিশয় সৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাহার পর, মায়াদেবী একজন সতীসাধ্বী, পতিব্রতা রমণী বলিয়া প্রজারা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। তাহার উপর আবার এত অধিকবয়সে তাঁহাদিগের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে, ইহা দেখিয়া যে, সকলের আনন্দোচ্ছ্বাস হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

জন্মের পঞ্চ দিবস পরে নবজাত সন্তানের নামকরণ হইল। শুদ্ধোদন এইজন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজবাটীর একটি ঘর নানা সুগন্ধদ্রব্যে পূর্ণ এবং পুষ্পমালায় চারিদিক সুশোভিত হইল। সেই দিন দুগ্ধ, চিনি এবং মধু মিশ্রিত করিয়া শিশু ও আগন্তুকসকলের জন্য পরমান্ন প্রস্তুত হইল। এক শত আশীজন অধ্যাপক সেইদিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়া অবশেষে পুত্রের লক্ষণসকল নিরূপণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আটজন জ্যোতিষী ছিলেন—তাঁহারা হাত দেখিয়াও গণনা করিতে পারিতেন। সাতজন একমত হইয়া বলিলেন যে, যদি এই শিশু মনুষ্য-সমাজে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া ধরায় সমুদায় দেশকে একছত্রে আনয়ন করিতে পারিবেন, আর যদি সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কালক্রমে তিনি একজন বুদ্ধ হইবেন। অবশিষ্ট এক-জন অধ্যাপক হাত দেখিয়া বলিলেন—"না! এই শিশু কখন জনসমাজে থাকিতে পারিবেন না। ইনি নিশ্চয়ই জীবনবন্ধন কাটিয়া বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইবেন।" শিশু জীবগণের মুক্তির কারণ হইবেন, তাঁহার পুণ্যে বিশ্বের গতি হইবে, এইকারণে তাঁহাকে সিদ্ধার্থ নাম প্রদত্ত হইল।

কিন্তু সংসারে অমিশ্রিত সম্ভোগ কখন থাকে না। শিশু জন্মিবার সাতদিন পরে তাঁহার জননী মায়াদেবীর কাল হইল। মহৎ লোকের জননী মহতী হন—একথা ইতিহাসে এক-প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে। মায়াদেবী যেরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ছিলেন, তাহাতে একথার আরও একটি অধিক প্রমাণ পাওয়া গেল। বৌদ্ধেরা বলেন যে, মায়াদেবী পৃথিবী হইতে চলিয়া

গেলে তুষিত-স্বর্গের অধিবাসিনী হন এবং সঞ্চিত পুণ্য-রাশির বলে তাঁহাকে আর পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই।

মায়াদেবীর ভগ্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁহার সপত্নী ছিলেন। যখন সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন, তখন তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই মহা-প্রজাপতি গৌতমী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভিক্ষুকী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের বাল্যকালের কথা ইতিহাস মধ্যে অধিক পাওয়া যায় না। সকলেই বলেন যে, শৈশবাবস্থা হইতে তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব যেন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবে চরিত্রে অঙ্কিত ছিল। ইহাও কথিত আছে যে, যখন তাঁহার পিতা মঙ্গলার্থ তাঁহাকে কপিলবস্তুর দেবমন্দিরে লইয়া যান, তখন শিশুকে দেখিয়াই মন্দি-রস্থ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিসকল সজীব হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া সিদ্ধার্থকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিল। সেই দেবতাদিগের নাম-গুলিও ললিতবিস্তর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। নামগুলি এই—শিব, স্কন্দ, নারায়ণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্রবণ, শক্র এবং লোকপালগণ। এ গল্পটি সত্য না হউক, কিন্তু ইহা হইতে আমরা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার জানিতে পারিতেছি। তখন প্রতিমূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত ছিল—পৌরাণিক দেবদেবীর আধিপত্য ছিল না। প্রতিমূর্ত্তি-পূজা এদেশে কোন সময়ে ছিল না, ইহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের অনুভব এই যে, আর্য্যজাতির জন্মের সঙ্গে ইহারও সৃষ্টি হয় এবং এমন কোন সময় ছিল না যখন ভারতবাসীরা একেবারে একেশ্বরবাদী ছিল। সাধারণ লোকদিগের জন্য প্রতি-মূর্ত্তির অভাব সর্ব্বপ্রথম হইতেই লক্ষিত হয় এবং বিশুদ্ধ একেশ্বর-বাদ কেবল ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে ভার-

তের পুস্তকসমূহ পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারা যায় যে, প্রতিমূর্ত্তি-পূজা সকলসময়ে একপ্রকারের ছিল না। বৈদিক সময়ের প্রতিমূর্ত্তি একপ্রকার এবং পৌরাণিক প্রতিমূর্ত্তি আর একপ্রকার। বুদ্ধের সময় বৈদিক দেবদেবীর পূজা হইত। মহামতি সুপ্রসিদ্ধ Burnouf নেপালের বৌদ্ধসাহিত্য পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দিব্য অবদান গ্রন্থে কৃষ্ণের নাম একবারও উল্লিখিত নাই। তিনি এবং মহাত্মা কোলব্রুক উভয়েই এই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ভারতে কৃষ্ণপূজা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিল না, তাঁহার অনেক পরে হইয়াছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, আমরা কৃষ্ণের বিষয় বলিতেছি না, কৃষ্ণপূজার বিষয় বলিতেছি। মহাভারত বুদ্ধের অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন বুদ্ধের জন্ম হয় তখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণের কথা তখনকার লোকেরা সকলেই জানিত। কিন্তু কথা হইতেছে যে, কৃষ্ণপূজা কি তখন প্রচলিত ছিল? বোধ হয়, না। নিদেন ইহা বলা যাইতে পারে যে, তখন দেশের কোন কোন ভাগে কৃষ্ণপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সমুদায় ভারতের দেবদেবীর মধ্যে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে পূজিত হইতেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধসূত্রগুলি বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই লিখিত হয়। সে সকলে কৃষ্ণের নাম নাই—অন্যান্য দেবদেবীর নাম আছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থ এখন যে ভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহা বোধ হয় খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে লিখিত হয়। তাহাতেও কৃষ্ণপ্রতিমূর্ত্তির নাম নাই। কিন্তু ললিতবিস্তরে মহাভারতের কথা পাওয়া যায়

এবং তাহার একাদশ অধ্যায়ে একজন বুদ্ধের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে বলিতেছেন ঃ—এই যুবার অঙ্গ বৈশ্রবণ অপেক্ষা সুন্দর এবং উজ্জ্বল। ইনি কি রাহু? ইহা কি বজ্রধারী ইন্দ্রের দেহ, না সূর্য্যের, না চন্দ্রের? ইনি কি সর্ব্বশক্তিমান কামদেব, না রুদ্র, না কৃষ্ণ?" * এখানে আমরা কৃষ্ণের নাম পাইতেছি। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ললিতবিস্তর গ্রন্থ বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন কণিষ্ক বলিয়া একজন প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধ রাজা ভারতের মধ্যদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সভা † হয় এবং সেই সভাতে অনেকগুলি পুস্তক সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে ললিতবিস্তর একখানি। আমরা যে ললিতবিস্তর পাঠ করি ইহা তাহাই। কণিষ্ক খ্রীঃ অব্দ ১০ সালে ভারতের রাজা হন।

অনার্য্য ব্রাহ্মণ।

আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন ভারতবর্ষের অপর জাতিমাত্রই আর্য্যেতর—হয় সম্পূর্ণ অনার্য্য এবং শূদ্রপদবাচ্য, নয় আর্য্য-শোণিতের সহিত অনার্য্য-শোণিতের মিশ্রণফল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনকার দিনে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণই একমাত্র অবশিষ্ট ভারত-

---

* Lalita vistara by Foucaux.

† আমার অশোকচরিত গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের চারিটি সভার বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

বর্বীয় আর্য্যসন্তান।—কিন্তু যখন শুনা যায় যে, এখানেও সংশয় মিটে নাই, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এত বিজাতীয় শ্রেণীবিভাগ এবং পরস্পরের জাতিগৌরবের প্রতি এমনি অবিশ্বাস যে, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতেও লজ্জা বোধ করে, এবং আকারে প্রকারে, চালচলনে, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক সামান্য অনুষ্ঠানটিতে পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একেবারে আর্য্য অনার্য্য প্রভেদ, তখন আমাদের পূর্ব্ববিশ্বাসকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়।

হণ্টার সাহেব তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণের একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহলপ্রান্ত অবধি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই জাতিবিভাগের যাবতীয় দৃষ্টান্ত এবং তৎসংক্রান্ত কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, হিমালয়ের পাদমূলে চম্বা নামক প্রদেশে গাড়ী নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা মেষ চরাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। রাখালদিগের সহিত ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে কিছুই প্রভেদ নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়, সন্ধ্যাকালে ধেনু চরাইয়া ঘরে ফিরে। হণ্টার সাহেব ইহাদিগকে—বিশেষতঃ গাড়ী স্ত্রীলোকদিগকে—বিশেষ সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আরও একটু দক্ষিণে কাংরা উপত্যকায় ব্রাহ্মণেরা হল চালনা করে। সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দেখে এবং আপনাদিগের স্বজাতি বলিয়া আমল দেন না। স্থানীয় ব্রাহ্মণবংশাবলীর মধ্যেও ইহাদের কোনও উল্লেখ নাই।

সিমলা পাহাড়ে ব্রাহ্মণেরা রাখাল, কৃষক, কুলি এবং মজুরের কাজ করিয়া থাকে। একটু দূরবর্ত্তী স্থানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে

বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা গৌরবের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়, এবং পিতৃগণ কন্যাদিগকে অসৎ উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিতে লজ্জা-বোধ করে না। হণ্টার সাহেবের একজন ব্রাহ্মণ খানসামা ছিল—সে যে সকল কাজ করিত, সাহেবের একজন গোয়ালা চাকর সে সকল কাজ স্পর্শ করা তাহার জাতির অনুপযুক্ত মনে করিত।

গাতিয়ালায় অনেক ব্রাহ্মণ-মজুর আছে। ইহাদের কেহ কেহ পাল্কীবেহারার কাজ করিয়া খায়।

দক্ষিণে আসিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে একদল ব্রাহ্মণ-কৃষক দেখা যায়। ইহাদের নাম তগা। কিম্বদন্তী এই যে, ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া ইহাদের এই নাম—তগা ত্যাগের অপভ্রংশ। কিন্তু স্যর হেনরি ইলিয়ট্ সাহেব বলেন, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ একজন শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হয়েন। সেই অবধি ইহারা এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুসা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। এবং তাহাদের এক স্বতন্ত্র বর্ণভেদ-প্রণালী আছে।

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে হলচালক ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এবং শুনা যায় যে, একজন প্রবলপ্রতাপ ভূপতি দেব-পূজাকালে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে গলায় পৈতা দিয়া বিস্তর ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করেন। ইহাদের অনেকে একসময় অযোধ্যায় গিয়া বসতি করে। কিন্তু সেখানকার ব্রাহ্মণসমাজ ইহাদিগকে গ্রহণ করে নাই।

অযোধ্যার সওয়ালাখী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ও এইরূপ রাজ-অনুগ্রহের ফল। রাজা রাম বঘেল নামক নরপতি একবার অনেক ব্রাহ্মণ লইয়া ধুমধাম সহকারে এক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন;

লওয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ সহজে মিলিল না। রাজা হুকুম দিলেন সওয়া লক্ষ সামান্য প্রজার গলায় পৈতা দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হউক্। রাজাজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল এবং রাজসভা ব্রাহ্মণে ভরিয়া গেল।—গল্প আছে, কৃষ্ণও নাকি একবার এইরূপে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে বিশ্বামিত্রকে তবু তপস্যা করিতে হইয়াছিল। ইদানীং রাজপ্রসাদই যথেষ্ট।

বারাণসীর সন্নিহিত প্রদেশে ভুঁইহার ব্রাহ্মণদিগের জাতি সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ আছে। তাহারা বহুদিন অবধি কৃষি-কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এবং দেশীয় রাজশাসনে তাহাদিগকে কর দিতে হইত না।

এমনও দু'একটি বিবরণ শুনা যায় যে, এক প্রদেশের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। সেকালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া যদি ইহা সম্ভব হয় বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও হয় ব্রাহ্মণেরা নয় সেখানকার ক্ষত্রিয়েরা বর্ণশঙ্কর।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের হীনতার সকল কারণ আমরা জানি না। অনেকে অনুমান করেন যে, দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত বিবাহাদিতে তাঁহাদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়াই ইহার কারণ।

উড়িষ্যায়ও দুই জাতীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এক জাতীয়কে দেখিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয়, অপর জাতি চাষ করে, মজুরী করে, নারিকেল বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে এবং

তাহাদের আকারপ্রকারে ব্রহ্মণ্যের কণামাত্র আভাসও পাওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মণ্যের আরও দুর্দ্দশা। প্রবাদ আছে, পরশুরাম একবার ধীবরদিগকে জালের দড়ির পৈতা পরাইয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আগত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন না। মালাবারে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ উপাধিধারীদিগের মধ্যে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন কনিষ্ঠদিগের বিবাহ নিষেধ। কিন্তু কনিষ্ঠেরা নায়ার কন্যাদিগের সহিত সহবাসে সন্তুষ্ট থাকে—এবং এইরূপে বিধি রক্ষিত হয়।

নায়ার ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এবং বিধিব্যবস্থায় তাহাদিগের অনার্য্য মূল সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। পুত্রের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ভাগিনেয় বিষয়ের অধিকারী।

দাক্ষিণাত্যে চোল ব্রাহ্মণেরা যে কত জাতির সম্মিশ্রণ বলা যায় না। এবং মদুরার কর্ম্মকারেরা অবধি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

এমন কি, সমুদ্রপারে সিংহলেও এই ব্রাহ্মণীকরণের তরঙ্গ পহুঁছিয়াছিল বোধ হয়। মদুরার রাজা উত্তর হইতে একবার আটচল্লিশ সহস্র অনার্য্যকে স্বরাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরেরা কৃষিকার্য্য করিত। এবং সিংহলে যদিও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, কিন্তু সেখানেও চাষী ব্রাহ্মণ নামেই ইহারা পরিচিত।

ব্রহ্মণ্যের এই সকল শাখাপ্রশাখা আলোচনা করিয়া হণ্টার সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজ আসিয়া যেমন জাতিভেদটা আইনবদ্ধ হইয়াছে পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ইহার মধ্যে মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। এবং সেই সকল ছিদ্রপথ দিয়া কালে কালে

অনেক সম্পূর্ণ বিজাতীয় শোণিত ব্রাহ্মণবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এবং অনেক স্থলে সম্পূর্ণ এক হইলেও ব্রাহ্মণ এবং আর্য্য সর্ব্বত্র একার্থবাচক নহে।

প্রসঙ্গ-কথা।

(সমুদ্রযাত্রা।)

বাঙ্গলা দেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ, না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া কোন কথা নহে। কারণ, যাহা অন্যহিসাবে ভাল অথবা যাহাতে কোন মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভাল না হইতে পারে একথা স্বীকার করিতে আমাদের কোন লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য্য আমাদের পক্ষে ভাল এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক্ না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকলসময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যেসকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি-সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না— তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্যের নিয়ামক কে? শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে? লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষতঃ যে লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রাম গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে ত আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরাজের আইনেও বাহির হইতে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজ-সংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্ব্বকালে তাঁহারা সে কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরাজ আমাদের সমাজকে যে অবস্থায় হাতে পাইয়াছে ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোন নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন্‌টা বৈধ, কোন্‌টা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোন সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট জড়-কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে

আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণ-পথে তিলার্দ্ধ-মাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি করেন? তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র-প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ, তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।

তাঁহাদের আর একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্যসময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করিয়া বর্ত্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহু প্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার কোন বাধা ছিল না। বর্ত্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে, ইহার কোন উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশে আর এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

আমাদের কি নিজের কোন শক্তি নাই? আমাদের সমাজে যদি কোন দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতি-পথের ব্যাঘাতস্বরূপ আপন পাষাণ মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে

আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে বহু প্রাচীনকালে তাহার কোন নিষেধ-বিধি ছিল কি না? যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল—আর যদি দৈবাৎ অনুস্বরবিসর্গ-বিশিষ্ট একটা বচনার্দ্ধ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনই নিরুপায় যে সমাজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য্য করিয়া বহন করিব, এমন কি, তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব? দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়?

আমরা কি নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না—পূর্ব্বে কি ছিল এবং এখন কি আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব? আমাদের শুভাশুভ জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট, একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণ সংহিতা আগম নিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্ভ্রান্ত হইতে হইবে—সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্কলোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোন দেশে প্রচলিত আছে কি?

আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, যে লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সঙ্গতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা, মাদ্রাজ সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের জাতি লইয়া কোন কথা উঠিতেছে

না, এদিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসঙ্গত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্যপান করিতেছে, কেহ সেদিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড় সশঙ্কিত! কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবারও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড়-পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে ত মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণমাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্ত্তমান লোকাচারের অসঙ্গতি দোষ দেখান হয়। বলা হয়, একদিকে আমরা বাধ্য হইয়া অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্যদিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াক্কড়! কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি কাহাকে সে কথাগুলা বলা হইতেছে! শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে? সে নিজেও এমন মহা অপরাধ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি?

সমাজের মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বিনা

যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রার উপকার আছে, মনুর যে নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চির-কালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক, দেশে বিদেশে গিয়া জ্ঞান অর্জ্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোন প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না, যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন—তবে আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না, তবে কোন শ্লোকখণ্ড আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোন লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাঁধও ভাঙ্গিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশীদিন কেহ ভয় করিবে না। যে সমাজ মিথ্যাকে কপটতাকে মার্জ্জনা করে, অর্দ্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া-শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোন নৈতিক কারণ, কোন যৌক্তিক সঙ্গতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্ব্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড

বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড় দুরূহ হইত।

যাঁহারা শুভবুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্ব্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোন যুক্তি নাই—সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে, সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙ্গিতে গেলে আর একটা ভাঙ্গিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের বন্ধন ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রীশিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে?

সমুদ্রপার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্ত্তমান সমাজ রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোন প্রকার স্বাধীনতার কোন অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল স্তব্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে

হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোন ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্য্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত, পল্লবিত বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোন ছিদ্র রাখিতে চাহে না; আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যেখানেই কালক্রমে একটি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে সেখানেই পুনর্ব্বার নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড়-অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত।

স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজ-শিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়-সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে-চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবন-চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।

সমুদ্রপার হইয়া নূতন দেশে, নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শলাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধন মুক্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যে সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনও কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ। বাহ্যতঃ ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ও সমুদ্রপার হওয়া কিছুই নহে কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়াই যথার্থ লোকাচার-বিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়! আমরা সমুদ্রপার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্যজাতিকে সমুদ্রপার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরাজি শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্ব্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্ব্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কি? আমরা যেন ইংলণ্ডে না গেলাম কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা যেই ত ভাঙ্গিয়াছে। আজ যে এত বাক্‌চাতুরী, এত শাস্ত্র-সন্ধানের ধূম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে ত তাহার কোন আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে,

সে দিকে কোন দৃকপাত নাই। অতি বড় পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরাজি শিখাইতেছে। এমন কি মাতৃভাষা শিখাইতেছে না। এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষা প্রস্তাব উঠিতেছে তখন স্বদেশের লোকেই ত তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরাণীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাশ করিতেই হইবে। পাশ না করিলে চাকরী চুলায় যাক্, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার মর্য্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এম্‌নি বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কি ভ্রম, একি দুরাশা! ইংরাজি শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরাণীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকীটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না! এ কি কখনো সম্ভব হয়! দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে, পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরাজি শিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাকরি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ নির্ভর হইবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙ্গালী সমুদ্রপার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

সমালোচনা।

কঙ্কাবতী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম-পথে পরিচালনা করিতে ওয়পনা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম-বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগ-শয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোন অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু

এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্ত্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্ত-গম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্দ্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে "অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়াণ্ডার্‌ল্যাণ্ড্" নামক একটি ইংরাজি গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট-সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্ত্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এইসমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালকবালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্পলোকই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা

জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলে-মানুষী মনে করি ; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষী আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধূলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষের পলকপাত ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষী বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার ত কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি-উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, লেখারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকলপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতালাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্য্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। তাহাদের সমস্ত সাহিত্যেই এই তরুণতার আভাস পাওয়া যায়। চার্লস্ ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকদের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত—তাহারা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত—হইল কি ? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল ? ইহার তাৎপর্য্য কি, লক্ষ্য

কি? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙোমুল্লুকনিবাসী শ্রীমান্ ঘ্যাঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্ত্তা আমাদের এই দুইঠেঙোমুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতি কোটি সুগম্ভীর কাঠের পুঁতুলের মধ্যে যদি কোন দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানব-হৃদয় জলধির বিচিত্র উত্থানপতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্দ্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ বহন করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

সাধনা।

দান প্রতিদান।

বড় গিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল। বিশেষতঃ কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বূলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্য পরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়ন-গৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল যাহা ইতিপূর্ব্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণ ঝঙ্কার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল। রাধাগোবিন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা

তে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদু গম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক। স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্ত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। রাধাগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন "শোন নাই কি?"

রাধাগোবিন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বৌঠাকরুণ একটা কথাও ত মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়া পরায় কাজ কি?"

"বাঁচিতে ত হইবে।"

"মরণ হইলেই ভাল হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধাগোবিন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধাগোবিন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড় গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষতঃ শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোটবৌয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিষটা নিতান্ত এক-

যোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটবৌকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধাগোবিন্দের পরামর্শের প্রতি বেশী নির্ভর করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্ম্মের সমস্ত ভার রাধাগোবিন্দের উপরেই ছিল। বড় গিন্নির সর্ব্বদাই সন্দেহ রাধাগোবিন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধাগোবিন্দের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধাগোবিন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই ত।" রাধাগোবিন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না।" শশিভূষণ সভয়ে সস্নেহে কহিলেন "কেন ভাই?" রাধাগোবিন্দ গত সন্ধ্যাকালে বড় গৃহিণীর আক্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন। শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন "এই! এ ত নূতন কথা নহে। ও ত পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই মুটো

কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কথা আমাকেও ত মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া ত সংসারত্যাগ করিতে পারি না।" রাধা কহিলেন "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কি করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।" শশিভূষণ কহিলেন "তুমি গেলে আমার কিসেই শান্তি!" আর অধিক কথা হইল না। রাধাগোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড় গৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে; সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাগোবিন্দকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধাগোবিন্দ যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ত আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাৎতাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসীর নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি! জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু

এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন-প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ, এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে গবর্মেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারীসম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত। একদিন খবর আসিল শশিভূষণের একমাত্র জমিদারী পরগণা এনাৎসাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে। রাধাগোবিন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন "আমারই দোষ!" শশিভূষণ কহিলেন "তোমার কিসের দোষ! তুমি ত খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাতে পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কি করিতে পার?"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোন ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোন কাজকর্ম্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্ত্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন। প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধাগোবিন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্ব্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই-

সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধাগোবিন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধাগোবিন্দ পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী সহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধাগোবিন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোন গর্ব্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোন একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল; বোধ করি, দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোন একটা বিষয়ে বড় গিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনে মত কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্ব্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল; এবং রাত্রে রাধাগোবিন্দ কি কি যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না। বড় গিন্নির দাসীর মত হইয়া রহিল;—শুনা যায়, রাধাগোবিন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই—অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্প-

ভির মিলনসাধন করাইয়া দেন ; এবং বলেন,"ছোটবৌ ত সে দিন আসিয়াছে,আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্য্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে ? ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ কর।"

রাধাগোবিন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নিয়ম অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড় গিন্নির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধাগোবিন্দের চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধাগোবিন্দ এপাশ-ওপাশ করিতেছে।

রাধাগোবিন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত,"তোমার কোন ভাবনা নাই দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশী দিন দেরীও নাই।"

বাস্তবিক বেশী দিন দেরীও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারীর কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজনা দিতে হইত—এক পয়সা মুনফা পাইত না। রাধাগোবিন্দ বৎসরের মধ্যে দুই একবার লাঠিয়াল লইয়া লুঠপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত।

প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসা-জীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত, এবং রাধা-গোবিন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্ব্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা-মাম্‌লা করিয়া বারবার অকৃতকার্য্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধাগোবিন্দ সেই পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনর্ব্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতি-মধ্যে প্রায় দশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্ব্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মান-সিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্দ্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কি জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধা-গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল ভাই?" রাধাগোবিন্দ বলিলেন "অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি!"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোট বড় সকলেই খাইয়া গেল, ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখীকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্য্যে তিন চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড় শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধাগোবিন্দ কহিলেন "দাদা, তোমার অবর্ত্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।" শশিভূষণ কহিলেন "ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব!" রাধাগোবিন্দ কহিলেন "সবই ত তোমার!" শশিভূষণ উত্তর দিলেন "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।" রাধাগোবিন্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। রাধাগোবিন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা দু'টি ধরিয়া কহিল "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর ত সময় নাই।" শশিভূষণ কোন উত্তর করিলেন না—রাধাগোবিন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল। "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে ত হয় ত তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ

ছিল, তুমি ধনী আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালই করিয়াছিলে। কিন্তু যে জন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে? দয়াময় হরি!" বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রাধাগোবিন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল "দাদা, মাপ করিলে ত।" শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন "ভাই, তবে শোন। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।" রাধাগোবিন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে কহিল—"দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়োনা।"

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধাগোবিন্দের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধাগোবিন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা।

দ্বাপরযুগে অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহভেদ করিবার সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নির্গমনের পথ বাহির করিতে পারেন নাই, কলিযুগে ইংরাজি শিক্ষায় নব্যবঙ্গেরও কতকটা সেই দশা—আমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, কিন্তু সেই জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করিবার পথ খুঁজিয়া পাই না। ইংরাজি শিক্ষাও আবার শুধু জ্ঞানটুকুমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, স্বদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া দিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষায় কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া তাহাতে নূতনলব্ধ জ্ঞান ব্যক্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। হইয়াছে যেন নাবালকের বিষয়প্রাপ্তির মত, অল্প স্বল্প ভোগ করা চলে কিন্তু দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নাই।

অনেকে সেইজন্য মনে করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষাটাকে কেবলমাত্র ঘরকন্নার কাজে লাগাইয়া, সাহিত্য এবং জ্ঞানালোচনার ভাষা ইংরাজি করিলেই কোন গোল থাকে না। তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার ভাব ব্যক্ত করিবার আর আবশ্যকই থাকে না। এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত অল্পে অল্পে ইংরাজি ভাষায় দেশ ছাইয়া ফেলে। এইরূপে প্রাদেশিক ভাষার বিলোপে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যসাধনের পথও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে।

বাস্তবিক যদি ইহা সম্ভবপর হয়, হউক্;—শিশু বঙ্গভাষাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিস্রোত রোধ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতিকে বাদ দিয়া না হয়, তাহা

হইলে বোধ করি, সাধারণপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিতজনবোধ্য বিদেশীয় ভাষা অবলম্বনে বিশেষ সুবিধা হয় না। কারণ, শিক্ষাবলে সমাজের এক অংশ যে ভাবে গঠিত হইতে থাকে, বিদেশী ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া অপর অংশে সে ভাবের প্রবাহ সহজে পঁহুছে না; এইরূপে ভাষাভেদে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবপ্রবাহসঞ্চার বন্ধ হইয়া গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সমগ্র সমাজদেহের সম্যক পুষ্টিসাধনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

প্রাচীন ভারতে বিস্তৃত শূদ্রসমাজ যে ব্রাহ্মণজনোচিত জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল, সে কেবল মনুর বিধানগুণে নহে, কিন্তু সংস্কৃতভাষার দুর্ভেদ্য দুর্গে জ্ঞানের বিজন অবরোধই তাহার প্রধান কারণ। সমভাষায় যে ভাব অনুশীলিত হয়, শিক্ষিতদের হৃদয়শিখর হইতে নামিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিঃশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং সম্যক্ আয়ত্ত না হইলেও সাধারণের উপর তাহার একটা মোটামুটি প্রভাব থাকিয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত তখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা; রাজসভায় পণ্ডিতেরা বসিয়া তাহার আলোচনা করিতেন, চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা মিলিয়া অধ্যাপকের নিকট তাহার ব্যাকরণ শিক্ষা করিত; এখন যেমন ইংরাজি না জানিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয় না, তখন সেইরূপ সংস্কৃত না শিখিলে সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। সাধারণ লোকের সংস্কৃতভাষার সহিত সুতরাং বড় একটা সংস্পর্শ ছিল না। তাহারা জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত ভাষায় তুচ্ছপ্রসঙ্গের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব আসিয়া যখন দেশের সর্ব্বসাধারণকে বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন, সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে পালির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফল হইল যে, ব্রাহ্মণশাসনের সংস্কৃত বেড়া কাজে লাগিল না, এবং দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভাব বায়ুতাড়িত বহ্নিশিখার ন্যায় হুহুশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চৈতন্যও যখন বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন, প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতশাস্ত্র রচনা না করিয়া বঙ্গসন্তানকে তিনি তাহার মাতৃভাষায় আহ্বান করিলেন—নির্জ্জীব বঙ্গসমাজও আলোড়িত হইয়া উঠিল। এবং নবদ্বীপের সমস্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য সে বৈষ্ণবপ্রেমের প্রবাহ রোধ করিতে পারিল না।

কেবলমাত্র শিক্ষিতবোধ্য ভাষা যতই সম্পূর্ণ এবং সম্ভ্রান্ত হউক্ না কেন, প্রেমের সহজ ভাষার নিকট তাহা চিরদিনই নিষ্ফল। প্রেমের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা—মাতৃস্তন্যের সহিত প্রতিদিন যাহা পান করিয়া পিতৃপিতামহক্রমে আমরা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছি।

বাঙ্গলা লেখকেরাও তাই বুদ্ধ এবং চৈতন্যের পদানুসরণ করিয়া স্বদেশীয় ভাষার মধ্য দিয়া একটা নূতন জীবনপ্রবাহ আনিয়া বঙ্গসমাজের সর্ব্বাঙ্গে একটা স্পন্দন সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যে এখন অল্পে অল্পে আমাদের বিদেশীয়াভিন্ন জাতীয়তা অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য জীবনকে এবং জীবন সাহিত্যকে প্রতিদিন নিঃশব্দে গড়িয়া তুলিতেছে। এবং পরস্পরের সহায়তায় উভয়েরই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারে যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার বিনাশ-

সম্ভাবনা কল্পনা করেন, তাঁহাদের সেই বহুযত্নপোষিত আশার বিরুদ্ধে এক প্রধান উদাহরণ এই নব্য বঙ্গসাহিত্য। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যখন গ্রাম্য বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে উপেক্ষা করিতেন, ইংরাজিশিক্ষিতেরাই তখন বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া এই বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করেন এবং সেই ইংরাজি-শিক্ষিতেরাই এপর্য্যন্ত অবিশ্রাম যত্নে ইহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

শুধু বাঙ্গলা দেশ বলিয়া নহে, ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ইংরাজিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সেইখানেই ইংরাজিশিক্ষিতদের যত্নে সাহিত্যবদ্ধ হইয়া প্রাদেশিক ভাষার স্থায়িত্বলাভ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটি হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে ইংরাজি শিক্ষার বাতাসে সাহিত্যের নব নব অঙ্কুর উদ্গত হইয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গলা দেশেই ইংরাজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই-জন্য বঙ্গসাহিত্যই অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বত্রই যদি ইংরাজির শুভাগমনে দেশীয় সাহিত্যের এইরূপ অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষাকেই প্রাদে-শিক ভাষার উন্নতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিকও তাহাই। ইংরাজি শিক্ষায় মানবহৃদয়ে ভাবপ্রকাশ ও জ্ঞানবিস্তারের যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ইহা তাহারই অনিবার্য্য ফল। নহিলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুদূর যশোবিস্তার, রাজসম্মান বা অর্থাগমের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না; এবং দেশের লোকেও ইংরাজি লেখককে যেরূপ সম্মানে পথ ছাড়িয়া দেয়, বাঙ্গলা লেখককে দেখিলে তাদৃশ সসঙ্কোচ সম্ভ্রম অনুভব করে না।

মনে করা যাক্ একসময় ইংরাজি ভাষাই দেশের বালবৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে প্রচলিত হইবে, কিন্তু সে দিন যে বহুদূরে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে দেশের যে বৃহৎ অংশ ইংরাজি না জানে তাহাদের কি গতি হইবে? তাহারা কি জ্ঞানলাভের জন্য সেই দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহারা কখনই আপন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি এতকাল উদাসীন হইয়া থাকিবেন না; তাঁহারা নিজে যাহা বুঝিতেছেন অন্য লোককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই চেষ্টাতেই দেশীয় সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিবে এবং পরিপুষ্ট হইবে। এইরূপে দেশীয় সাহিত্যের যতই পরিণতি হইতে থাকিবে, বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের আশা ততই সুদূর-পরাহত হইবে। সংক্ষেপে বলিলে ইহা একটি স্বতোবিরোধী বচনের মত শুনিতে হইবে;—আমরা যত ইংরাজি শিখিব ততই দেশী সাহিত্য বিস্তৃত হইবে, এবং দেশী সাহিত্য যতই বিস্তৃত হইবে ততই ভবিষ্যতে ইংরাজি ভাষা ব্যাপ্তির ব্যাঘাত করিবে।

আরও, ইংরাজিকেই যদি কাহারও আদেশানুসারে আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেই কি সাহিত্য সেই মহামহিমের আদেশ পালন করিবে? সে আশা দুরাশা মাত্র। ইংরাজি সাহিত্যের কোথাও আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিবে না। তোতাপাখীর মত আমরা সে সাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে সাহিত্য স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অন্তরের উত্তাপে আপনি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রত্যেক কথার সহিত আমাদের জীবনের যেমন এক চিরন্তন নিগূঢ় যোগ থাকিয়া যায়, পরিপূর্ণ ইংরাজি সাহি-

ত্যের সহিত আমাদের জীবনের সেরূপ অবিচ্ছেদ্য যোগ সাধিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের জাতীয়তা বিকাশের ফল নহে, এবং দেশে, কালে, সকল বিষয়েই তাহা আমাদের সুখদুঃখের বাহির, সুতরাং স্বদেশীয় সাহিত্যের মত আমাদের জীবনগঠনে ইহার প্রভাবও তেমন অমোঘ নহে।

ইহা কেবলমাত্র কল্পনা নহে। ফরাসী ভাষায় সাহিত্যরচনা যখন জর্ম্মণদেশের প্রথা ছিল, তখনকার জর্ম্মণির সাহিত্য শুনা যায়, কেবলমাত্র ফরাসী সাহিত্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র—তাহার মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, জর্ম্মণ বল নাই, কেবল কতকগুলি পরিপাটি অনুকরণ এবং নির্ভুল ব্যাকরণলীলা। কিন্তু জর্ম্মণেরা যখন দেশীয় ভাষায় সাহিত্যানুশীলন সুরু করিল, তখন জর্ম্মণির গৌরবে য়ুরোপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এখন এই ভারতবর্ষের দূরপ্রান্তেও জর্ম্মণ কবির গাথা শিক্ষিতজনের চিত্তহরণ করে।

ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিলেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইংরাজি এদেশের সর্ব্বসাধারণের ভাষা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফ্রান্স এবং স্পেন যখন রোমক শাসনের অধীন ছিল, তখন উক্ত দেশের ভদ্রসমাজের রোমীয় আচার ব্যবহারের সহিত লাটিন ভাষাও প্রচলিত ছিল, এবং রোমকেরা কখনও তত্তৎ দেশের ভাষার উন্নতিসাধনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু ফ্রান্স এবং স্পেনের ভাষা লাটিন হইল না—জাতীয় জীবনবিকাশের সহিত ধীরে ধীরে জাতীয় সাহিত্য মুকুলিত হইয়া উঠিল। গ্রীস যখন রোমের অধীনতা স্বীকার করে, তখন তাহার পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই, লাটিন ভাষা এবং লাটিন সাহিত্যই সর্ব্বত্র প্রবল এবং তৎকালীন

গ্রীক লেখকেরা লাটিন লেখকদিগের তুলনায় অতি হীন, তথাপি লাটিন গ্রীকের স্থান অধিকার করিতে পারিল না। তাহার পরেও বহুবৎসরের তুরস্কশাসন গ্রীসকে নির্বীর্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। এই শতাব্দীকালমাত্র গ্রীস আপন লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত দারুণ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও পরাধীন গ্রীস আপন মাতৃভাষাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য যদিও গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে, তথাপি সে দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিবে, কারণ, দেশের মাটির মধ্যে তাহার শিকড় আছে। স্কুল কালেজে একমাত্র ইংরাজিতেই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, তাহার ফলে বঙ্গসন্তানের জীবনে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে না। কিন্তু দেশের ভাষা বাঙ্গলাই থাকিয়া যায়। বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় ভাষণপ্রসঙ্গে কিম্বা পত্রব্যবহারে বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিলেও বাড়িতে আসিয়া মা,বোন,স্ত্রী কন্যার সহিত ইংরাজিতে স্নেহপ্রীতির আদান প্রদান চলে না। এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজিনবীশের বাঙ্গলা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও সাধিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভরসাও সেইখানে। বঙ্গসাহিত্য আমাদের অন্তঃপুরেই প্রতিদিন জীবনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দেশের সর্ব্বত্র তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ডায়ারি।

সমীরণ এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন, তিনি বলিলেন—ইংরাজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেস্‌ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে, ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যাণ্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশবিজড়িত ভগ্নমন্দিরের ন্যায় অ্যাণ্টনির উচ্চতা সর্ব্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। ল্যামার্ম্মূরের নায়িকা আপনার সকরুণ, সরল সুকুমার সৌন্দর্য্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌উডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্য্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ম্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যেও দেখ।—বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্ত্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর, সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কি?

সমীরণের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী

অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাণ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ক্ষিতি কহিলেন, তুমি বঙ্কিম বাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্য্যপ্রধান নহে। মানস জগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্য্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্য্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।

দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না—গ্রন্থটি ঠেলিয়া ফেলিয়া এবং ঔদাসীন্যের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল—কেন? দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্য্যেই বিকশিত হয় নাই? এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা এমন অধ্যবসায় উক্ত উপন্যাসের কয় জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে? আনন্দমঠ ত কার্য্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ, জীবানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনামাত্র, যদি কাহারো চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্য্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরাণীতে কে কর্তৃত্বপদ লইয়াছে? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব? নহে।

সমীরণ কহিলেন; ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিষকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। সতরঞ্চ ফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান চক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ, তাহা নির্জীব কাষ্ঠমূর্ত্তির রঙ্গভূমি মাত্র। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড় সীধা জিনিষ নহে, তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্ম্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার কেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয়

ঝরিয়া দাও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত; কিন্তু জীবন যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়-বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো ত মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কি প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কি ভয়ঙ্কর!

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্য্যই স্ত্রীলোকের। কার্য্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জ্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যখন একাকী ঊর্দ্ধনেত্রে নিশীথ আকাশের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কি সুখ পাইত? কোন্‌ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে? যে জ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিবে না কোন্‌ নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে? যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্ম্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন্‌ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে? [illegible] যদি যথার্থ কার্য্যশীল হইত, তবে মনুষ্যসমাজের এমন উন্নতি হইত না—তবে একটি নূতন তত্ত্ব একটি নূতন জীব বাহির হইত না। নির্জ্জ-

নের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্ব্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জ্জনতার মধ্যে থাকে। কার্য্যবীর নেপোলিয়নও কখনই আপনার কার্য্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহা নির্জ্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন—তিনি সর্ব্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া তুমুল কার্য্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীষ্ম ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জন-সংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মত একক প্রাণী আর কে ছিল! তিনি কি কাজ করিতেছিলেন, না, ধ্যান করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝখানে কোন ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে, তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।

দীপ্তি কহিল, তোমার সমস্ত সৃষ্টিছাড়া কথা—কিছুই বুঝিবার যো নাই। মেয়েরা যে কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই?

ব্যোম কহিলেন—স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্ম্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জলন্ত অঙ্গার যেমন আপনার ভস্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তূপাকার কার্য্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে—সেই তাহার অন্তঃপুর—তাহার চারিদিকে কোন অবসর নাই। তাহাকে যদি ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্য্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সাধ্য [illegible] দ্রুতবেগে তেমন

তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে। পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্য্যের মাঝখানে একটা দীর্ঘ পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা বিকীর্ণ। রমণী যদি একবার বহ্নি-বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূধূ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্য্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য!

আমি কহিলাম আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈষৎরক্তিম এবং সহাস্য হইয়া উঠিল। দীপ্তি কহিল, এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশী করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং কহিলাম স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভাল-বাসে। দীপ্তি সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, কখনই না।

স্রোতস্বিনী মৃদুভাবে কহিল—সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমাদের কাছে অত্যন্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমাদের কাছে বড় বেশী মধুর।

স্রোতস্বিনী রমণী হইয়াও সত্যকথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমি কহিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং তাঁহাদের মধ্যে গীতিকবি বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্ন-

প্রিয়। শুনা যায়, টেনিস্‌ন্‌ যথেষ্ট জনাদরসত্ত্বেও লেশমাত্র অপ্রিয় সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন না। এরূপ উদাহরণ আরো অনেক আছে। আসল কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্য্যতা পরিমাণের একমাত্র উপায়। অন্য সমস্ত কার্য্যফলের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোন প্রমাণ নাই। সেইজন্য গায়ক প্রত্যেকবার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে। সেইজন্য অনাদর গুণীমাত্রের কাছে এত অধিক অপ্রীতিকর।

সমীরণ কহিলেন—কেবল তাহাই নয়, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্য্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব, স্তুতিবাদ শুদ্ধ যে তাহার পুরস্কার তাহা নহে, তাহার কার্য্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।

আমি কহিলাম, স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য্য আনন্দদান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেইজন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে। কেবল অহঙ্কার পরিতৃপ্তির জন্য নহে, তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। ত্রুটি অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্ম্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এইজন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড় ভয়ানক।

ক্ষিতি কহিলেন—তুমি যাহা বলিলে দিব্য কবিত্ব করিয়া বলিলে, শুনিতে বেশ লাগিল, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্য্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ। বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ কালে

তাহার স্থান নাই। উপস্থিতমত স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ, যাহার কর্ম্মের ফলাফল সকলসময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্ত্তমান কালের নিন্দাস্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে, সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা, লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং মান অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে তাহার প্রধান কারণ, জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সমুদায় লাভ লোকসান বর্ত্তমানে; হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা; এইজন্য তাহারা কিছু কষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়, এক কানাকড়ি ছাড়িতে চায় না।

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় বিশ্বহিতৈষিণী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী কহিলেন, বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য্য করি না বলিয়া আমাদের কার্য্যের গৌরব অল্প একথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী, স্নায়ু অস্থিচর্ম্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্ম্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্ম্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষদেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রীদেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্য্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জ্জন্ম লাভ করি তবে আমি যেন পুন-

যাঁর নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। যেন ভিখারী না হইয়া অন্নপূর্ণা হই। একবার ভাবিয়া দেখ, সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক, ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ; প্রতিমুহূর্ত্তে কর্ম্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে; প্রতিগৃহের রক্ষাকার্য্য কত অসীম প্রীতিসাধ্য; যদি কোন প্রসন্নমূর্ত্তি, প্রফুল্লমুখী, ধৈর্য্যময়ী লোকবৎসলা দেবী প্রতিদিবসের শিয়রে বসিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধস্পর্শ সিঞ্চন করেন, আপনার কার্য্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন, এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্য্যস্থল সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে? যদি সেই লক্ষ্মীমূর্ত্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।

ইহার পর আমরা সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই অকস্মাৎ নিস্তব্ধতায় স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কথা কি বলিতেছিলে—মাঝে হইতে অন্য তর্ক আসিয়া সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ক্ষিতি কহিলেন, তাহার প্রমাণ?

আমি কহিলাম, প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ ঘরে ঘরে। এ সকল প্রমাণকে ঠিক আদালতে সাক্ষ্যমঞ্চে আনিয়া দাঁড় করান যায় না, প্রমাণ অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে হয়।

পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোন কোন নদী দেখা যায়, যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূধূ করিতেছে—কেবল একপার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্র মধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে পড়ে। আমরা অকর্ম্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বামপার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন; সহস্র পদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেইদিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা, এবং যে দিকে আমরা, সেদিকে কেবল রুক্ষ চাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি। সমীর, তুমি কি বল?

সমীরণ স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া কহিলেন—অদ্যকার সভায় নিজেদের অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্ত্তিমতী বাধা বর্ত্তমান। আমি তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। [illegible] মধ্যে বাঙ্গালী পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, তিনি দেবতা। আমরা যে দেবতা নহি, তৃণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকামাত্র, সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট

প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ভাই? ঐ যে আমাদের মুগ্ধ নিশ্বস্ত ভক্তটি আপন হৃদয়-কুঞ্জের সমুদয় বিকশিত সুন্দর পুষ্পগুলি সোনার থালে সাজাইয়া আমাদের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, ও কোথায় ফিরাইয়া দিব? আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি আপন নিভৃত নিত্য প্রেমের নির্নিমেষ সন্ধ্যাদীপটি লইয়া আমাদের এই গৌরবহীন মুখের চতুর্দ্দিকে অনন্ত অতৃপ্তিভরে শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম তবে উহাদেরই বা কোথায় সুখ আর আমাদেরই বা কোথায় সম্মান! যখন ছোট ছিল তখন মাটির পুতুল লইয়া এম্‌নিভাবে খেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যখন বড় হইল তখন মানুষপুতুল লইয়া এম্‌নি ভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে—তখন যদি কেহ তাহার খেলার পুতুল ভাঙ্গিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না, এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙ্গিয়া দেয় তবে কি রমণী ব্যথিত হয় না? যেখানে মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেখানে মনুষ্যত্ব বিনা ছদ্মবেশে সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে, যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেখানে দেবত্বের আয়োজন করিতে হয়। পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামান্য মানবভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে? কিন্তু আমরা যে এক একটি দেবতা, সেইজন্য এমন সুন্দর সুকুমার হৃদয়গুলি লইয়া অনায়াসে আপনার পঙ্কিল চরণের পাদপীঠ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছি।

দীপ্তি কহিলেন, যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে সে মানুষ হইয়া

দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশী। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত! হায় হায়, বাঙ্গালীর মেয়ে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কি বা দেবতার শ্রী! কিবা দেবতার মাহাত্ম্য!

স্রোতস্বিনীর পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমরা উত্তরোত্তর সুর এমনি নিখাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্য্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে, আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না? তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কি? তা'ছাড়া আমাদের ত সকল গুণ নাই—হৃদয়-মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে ত তোমরা বড়।

আমি কহিলাম—মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড় ভাল করিলে, নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্যকথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেবি, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াইখানি মাত্র শ্লোক আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে, তোমরা যে সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্টভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের! আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর—প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। এই ত গেল দেবদেবীর কথা। বুদ্ধিবৃত্তিতে বাঙ্গলাদেশে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমার এই মত; এদেশে শিক্ষিত মেয়েরা শিক্ষিত পুরুষের অপেক্ষা যথার্থ সুশিক্ষিত হয় এই আমার ধারণা। আমাদের শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে এমন একটা মূঢ় অহমিকা আছে যে, তাহারা আপনাদের বাড়াবাড়িটা বুঝিতে পারে না, হয় ত কুড়ানো লেজ পুচ্ছে বাঁধিয়া আস্ফালন করিবার হাস্যজনকতা অনুভব করে না, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা কেমন সহজে শোভনভাবে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, কেমন সংযম ও সৌন্দর্য্যের সহিত সমস্ত আতিশয্য পরিহার করেন।

সমীরণ কহিলেন,—দেখনা, আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী কোট প্যাণ্ট্‌লুন্‌ পরিয়া বাহির হইয়াছেন এবং স্ত্রী সাড়ি পরিয়া তাহার পার্শ্বে আসীন। একজন পরের পরিচ্ছদে বড়াই করিয়া বেড়াইতেছেন, আর একজন নিজের পরিচ্ছদে কেমন একটি সংযত সম্ভ্রমে বিরাজ করিতেছেন। কেবল সাজসজ্জা নহে, উভয়ের মনের ভাবেরও সেই প্রভেদ। একজন আপনার নূতন শিক্ষাটা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না, সবসুদ্ধ কেমন কিম্ভূত কিমাকার হইয়া উঠে এবং অন্ধ অহঙ্কারে নিজে তাহা বুঝিতেও পারে না। আর একজন আপনার শিক্ষাটিকে কেমন আপনার ভূষণ করিয়া তুলিতে পারেন, কেমন আপনার কর্ত্তব্যের সঙ্গে,হৃদয়ের সঙ্গে, চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে পারেন। স্বামী যেখানে মচ্‌মচ্‌ গট্‌খট্‌ হুট্‌মুট্‌ করিয়া বেড়ায়, চতুর্দ্দিককে সাহেবি-ভাবে অবজ্ঞা করিয়া আপন প্রাধান্য প্রচার করে, স্ত্রী সেখানে কেমন বিনম্র মধুরভাবে চারিপার্শ্বের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রভেদ যে কেবলমাত্র স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক কমনীয়তাবশতঃ তাহা নহে, আমাদের নারীদের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা আছে। বঙ্গসাহিত্যে স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য, তাহার কারণ, বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য।

আমি কহিলাম, তাহার একটা কারণ বঙ্গদেশে পুরুষের কোন কাজ নাই। এদেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহ গঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে। আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তকতকে ষ্টীমনৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাইভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া

চলে, তেমনি আমাদের দেশের গৃহিণী, লোকলৌকিকতা আত্মীয় কুটুম্বিতাপরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী নামক একটি চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। অন্য দেশের পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড় বড় পুরুষোচিত কার্য্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশের পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত; কোন বৃহৎভাব, বৃহৎকার্য্য, বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার নিপীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্ব্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদের নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোন কর্ত্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্ত্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফলপুষ্পের মত কর্ত্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনি ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখনি তাহার কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়; তখনি তাহার চিন্তা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্য্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে; তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোন রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরব হ্রাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, আজ আমরা একটি নূতন শিক্ষা ও বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভিজা কাঠ জ্বলে না, মরিচাধরা চাকা চলে না; যত জ্বলে তার চেয়ে ধোঁয়া বেশী হয়, যত চলে তাহার চেয়ে

শব্দ বেশী করে। আজ তোমাদের উজ্জ্বলতা, তোমাদের সহজ সুন্দর গতিশক্তি দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইতেছি। আমরা চিরদিন অকর্ম্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি, কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি, তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আসিয়াছ। এইজন্য শিক্ষা তোমরা যত সহজে যত শীঘ্র গ্রহণ করিতে পার, আপনার আয়ত্ত করিতে পার, তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পার, আমরা তেমন পারি না। তাহার কারণ, চরিত্র বলিয়া তোমাদের একটা নিজের জিনিষ আছে, একটা পাত্র আছে। নিজের জিনিষ না থাকিলে পরের জিনিষ গ্রহণ করা যায় না, এবং গ্রহণ করিয়া আপনার করা যায় না। এইজন্য আমাদের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদের অনুরূপ শিক্ষিত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য এখনো আমাদের ভার তোমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে, আমাদের বাহ্যাড়ম্বর দূর করিতে, আমাদের আতিশয্য হ্রাস করিতে, আমাদের মিথ্যা দর্প চূর্ণ করিতে, আমাদের বিশ্বাস সজীব রাখিতে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশকালের সহিত আমাদের সামঞ্জস্যসাধন করাইয়া দিতে হইবে। এক কথায়, দেশের সমুদায় গাধাবোটগুলিকে এখনো তোমাদের জিম্মায় লইতে হইবে। ইহারা একটু একটু বাক্যবায়ুর পাল উড়াইতে শিখিয়াছে বলিয়া যে মস্ত হইয়াছে তাহা মনে করিয়ো না—ইহাদের মধ্যে একটা আত্মশক্তি, একটা আত্মসম্মান, একটা সুনিয়মিত তেজোরাশির আবশ্যক। গলায় সাহেবী "টাই" এবং পৃষ্ঠে সাহেবের থাবড়া আমাদের পক্ষে সম্মানকর নহে, কখনো মধুরস্বরে কখনো তীব্রকণ্ঠে এই শিক্ষা তোমরা না দিলে আর উপায় দেখি না। এই পোষা পশুর গলায়

চক্ষুচক্ষে শিকলটি কাটিয়া দাও এবং ইহার দীর্ঘ কর্ণটি ধরিয়া তন্মধ্যে এই মন্ত্রটি প্রবেশ করাইয়া দাও যে, অন্নব্যঞ্জন যেমন আহার করিবার পক্ষেই পবিত্র কিন্তু কপালে মাথায় লেপিয়া অন্নশালী বলিয়া পরিচয় দিবার পক্ষে অপবিত্র, শিক্ষা তেমনি গায়ে মাথায় মাখিবার নহে, জীর্ণ করিয়া মনের উন্নতিসাধন করিবার এবং কাজে খাটাইবার।

স্রোতস্বিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, যদি বুঝিতে পারিতাম আমাদের কিছু করিবার আছে এবং কি উপায়ে কি কর্ত্তব্যসাধন করা যায়, তাহা হইলে আর কিছু না হোক্ চেষ্টা করিতে পারিতাম।

আমি কহিলাম, আর ত কিছু করিতে হইবে না। যেমন আছ তেমনি থাক। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক্, সত্য, সরলতা, শ্রী যদি মূর্ত্তি গ্রহণ করে তবে তাহাকে কেমন দেখিতে হয়। যে গৃহে লক্ষ্মী আছে, সে গৃহে বিশৃঙ্খলা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই এইজন্য তাহার মধ্যে বড় বিশৃঙ্খলা, বড় বাড়াবাড়ি—তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্য্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মী স্থাপনা হয়, তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন, পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।

স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল।

সভাভঙ্গ।

গাহিছে কাশিনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর
সাতটি যেন পোষা পাখী।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন্ কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে
সঘনে বলে বাহা বাহা!

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
কাঠের মত বসি আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান
ভাল না লাগে তার কাছে
বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এতকাল যাপি',
বাদলে দিনে কত মেঘের গান,
হোলির দিনে কত কাফি!
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,
গেয়েছে বিজয়ার গান,

হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে
ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে
সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ভূপালী মূলতানী সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত
বিবাহ-উৎসব রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস
জলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নব বর সলাজ মুখে
পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে
সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল
ধরেছে সাহানার সুর ;—
সে সব দিন আর সে সব গান
হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে
নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
কাশির বৃথা মাথা নাড়া,

সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়
হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে
বিরাম মাগে কাশিনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ,
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখী লয়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিড়ালের খেলা!
সেকালে গান ছিল একালে হায়
গানের বড় অবহেলা!"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ
শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে
আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি'
ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
বৃহৎ সভাগৃহকোণে,

ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে
উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায়
দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা, বাহা বাহা!"—কহিছে কানে
"গলা ছাড়িয়া গান গাহ!"

সভার লোকে সবে অন্যমনা,
কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে' যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান"
ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে
"গরম আজি অতিশয়!"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ;
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান মাঝে ক্ষীণ তরি;
কেবল দেখা যায় তানপুরায়
আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর
উছসি উঠে নিজ সুখে

হেলার কলরব শিলার মত
চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ,
দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেল কি করিয়া!
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে
লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে,
সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হতে ধরিল গান
আবার ভুলি দিল ছাড়ি'।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে!
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল সুরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি
গাহিতে গিয়ে হা-হা করি'!

কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি,'

গানের সুতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি'
অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার পরে
রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে
বাল্য ক্রন্দন-গাথা।
নয়ন ছলছল প্রতাপ রায়
কর বুলায় তার দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই",
কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপজ্বালা' নয়ন-ভরা
ছাড়ি সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেল দু'টি প্রাচীন সখা
ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।

বয়স করযোড়ে কহিল "প্রভু,
মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক
ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা
কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়োনা নূতন শ্রোতা,
মিনতি তব পদে স্বামি!
একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে!

গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে!
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে!
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।

কৃষি-কথা।

সচরাচর এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আজিকাল লোকের ব্যয় যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে এক্ষণে কৃষিকার্য্য দ্বারা সুচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। একথা যে একবারে অসত্য বা অসার, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকেরা যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে যে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করা যায় এবং তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দরূপে যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, একথা অনেকে চিন্তা করেন না। অনেক ভদ্রসন্তানের হয় ত পৈতৃক জমীজমা আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জ্ঞাত নহেন—কোন্ জমীর কিরূপ উর্ব্বরাশক্তি আছে, কোন্ জমীতে কত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্

জমীতে কি প্রকারের সার কত পরিমাণে দেওয়া আবশ্যক,—এ সব তত্ত্ব তাঁহারা কিছুই রাখেন না। এক একজন কোরফা প্রজা বা জোতদারের হাতে সমস্ত জমীর ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা পরপদসেবনে রত আছেন। ইঁহাদের দেখাদেখি অনেক চাষার ছেলে চাষ আবাদ ত্যাগ করিয়া, দুই পাত ইংরাজি শিক্ষায় দোহাই দিয়া, চাকরীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কাজেই দিন দিন দেশে বহুপরিমাণে চাষের জমী পতিত থাকায় অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কৃষির অবনতি হইতেছে—দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। আর চৈতন্য না হইলে চলে না।

কোন কোন ভদ্রসন্তান কোনপ্রকারে চাকরী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, অবশেষে ভগ্নমনে চাষকার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা করেন না—উহার রীতি-মত তত্ত্বাবধারণও করেন না। কেবল অপরের উপর নির্ভর করিয়া অবশেষে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং "চাষ ভদ্রলোকের পোষায় না"—এই উপদেশ-বাক্য অসঙ্কুচিত মনে অপরকে প্রদান করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন। যিনি "ইস্‌ক্রু কপ্‌লিং" ও "এক্সেল বাক্সে"র হিসাব রাখিতে রাখিতে জীবনপাত করিলেন, তিনি হয় ত বলিতে পারিবেন না যে, তাঁহার বাড়িতে গাড়ির "ধুরা" বা লাঙ্গলের "ঈশ" কয়খানা আছে। যিনি দশটা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলকারখানার আপিসে ছোট-সাহেবের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, বা অপর আপিসে বড়-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাটাইলেন, তিনি কিন্তু নিজের জমীর আইলে যাইতে আলস্য ও লজ্জা বোধ করিবেন, রাখাল কৃষাণকে খাটাইতে অপমান বোধ করিবেন—ইহা অপেক্ষা আমাদের অধঃপতনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

ফলতঃ এরূপ থাকিলে আর চলিতেছে না। আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মনে যাহাতে কৃষির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পুনরায় উদ্দীপিত হয়, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের কৃষির প্রতি তাচ্ছল্যভাব দূর হয় এবং তাঁহারা কৃষি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।

বাণিজ্য ব্যবসা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে লাভ হইয়া থাকে এবং ইহাতে কোন সময়ে মূলধন বিনষ্ট হয় না। নদী বা সমুদ্রমধ্যে নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া একদিনে মহাজনকে পথের ভিখারী করিতে পারে। কিন্তু হাজার "গুখা" বা জলপ্লাবন হইলেও কৃষকের মূলধন জমীগুলি কোথাও যায় না। এইজন্য চাষারা বলে—"লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের এক কোণে।" অতএব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পক্ষে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তবে পূর্ব্বকালে আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লাভবান হইতেন, আমাদের সেরূপ করিলে চলিবেনা। পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের জমীর উর্ব্বরাশক্তি স্বভাবতই প্রবল ছিল। তখন কোনপ্রকারে জমীটা চষিয়া বীজ বপন করিলেই সকলপ্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। বৃষ্টির জন্য তখন লোককে এত ভাবিতে হইত না, জলপ্লাবনে দেশ একবারে উৎসন্ন যাইত না। তখন চারি পয়সায় এক জন মজুর পাওয়া যাইত, দশ টাকায় হাতীর মত গোরু পাওয়া যাইত। সুতরাং তখন কৃষিকার্য্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এক্ষণে জমীর উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া গিয়াছে; বর্ষার জন্য প্রায়ই লোককে ভাবনাযুক্ত থাকিতে হয়, প্রায় প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর বৃষ্টির অভাবে

শস্য নষ্ট হয়, লোকের মজুরী ও গবাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চারি পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে—কাজেই এক্ষণে আর চাষে সহজে লাভ হয় না। কিন্তু এত সব অসুবিধার মধ্যেও একটি মহান সুবিধা আছে। পূর্ব্বে যেমন অল্পব্যয়ে প্রচুর ফসল জন্মিত, ফসলের মূল্যও তেমনি শস্তা ছিল। এক্ষণে যেমন চাষে ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি ফসলের মূল্যও অতিশয় চড়িয়াছে—তাহাতে অল্প ফসল বিক্রয় করিলেই সকলপ্রকার খরচ পোষাইয়া যায়। তবেই চাষে একবারে লোকসান হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তথাপি এক্ষণে জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জলাভাব হইলে "পম্পিং এঞ্জিন" প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা শস্যরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল একটি বা দুইটি শস্যের চাষ করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করাইতে হইবে। তাহা হইলেই অল্পদিন মধ্যে প্রচুর লাভ হইবে এবং অবস্থার উন্নতি হইবে।

আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শস্যের চাষ-প্রণালী যথাসাধ্য বিবৃত করিব, ভরসা করি ইহা দ্বারা তাঁহারা কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। চাষ-আবাদের কথা বলিবার পূর্ব্বে জমী সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে তাহাই বলিতেছি।

বাঙ্গলা দেশের সকল জমীই প্রায় উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন। তন্মধ্যে কোন কোন জেলার কোন কোন বিশেষ জমীতে বিশেষ বিশেষ ফসল উত্তমরূপ জন্মে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার জমীতে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে; হুগলি, নদীয়া, যশহর প্রভৃতি জেলায় রবিখন্দ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। জমীর মৃত্তিকা নানারূপ আছে। তন্মধ্যে

আমাদের দেশে সচরাচর কৃষি সম্বন্ধে দুইপ্রকার মৃত্তিকার জমীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়—এক বেলে মাটির জমী, অর্থাৎ যে জমীর মৃত্তিকায় বালির অংশ বেশী। কোন কোন জেলার চাষারা এই মাটিকে "মেটেল" বা "মিটাল" মাটি বলে। দ্বিতীয়প্রকারের জমীর মাটিতে বালির ভাগ খুব কম, এই মাটিকে "এঁটেল" বা "আঁটালু" মাটি বলে। খাঁটি এঁটেল মাটির জমীতে কোন ফসলই জন্মে না। তাহার সহিত অন্যপ্রকার মৃত্তিকা বা সার যোগ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হয়। অতিরিক্ত বালি-মাটিও ভাল নহে, উহার সহিতও সার মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হয়। কোন্ জমীতে কিরূপ শস্য উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে বলিব।

প্রধানতঃ, এ দেশে চাষের জমী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—সেচা, অসেচা, জোল এবং দোকর্প। যে জমীতে পুষ্করিণী খালাদি হইতে জল উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা শস্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাকে সেচা জমী কহে, যাহাতে ঐ রূপ জল দিতে পারা যায় না, তাহাকে অসেচা জমী কহে। খাল জমী যাহাতে সচরাচর গ্রাম-ধোয়া জল গিয়া পড়ে, তাহাকে জোল জমী বলে। যে জমীতে এক বৎসরে দুইটি ফসল জন্মে সেই জমীর নাম দোকর্প। এইসকল জমী আবার চারি ভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ পার্সী শব্দে ঐ সকল শ্রেণীর নাম উল্লেখ হয়, যথা,—"আওয়েল," "দোয়েম", "ছোয়েম" এবং "চাহারেম" অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিবার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা ও অনুর্ব্বরতা বুঝিতে পারা যায় এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানতঃ জমীদারেরা খাজনার হার বেশী বা কম ধার্য্য করিয়া থাকেন।

যদি তোমার চাষ করিবার অভিপ্রায় হয়, আর পৈতৃক জমীজমা কিছু না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কিছু ভাল সেচা জমী বা জোল জমী সংগ্রহ করিবে। ইহাতে প্রথমে কিছু অর্থব্যয় হইবে বটে, কিন্তু অতি অল্পদিনেই ফসল হইতে সেই টাকা উঠিয়া যাইবে। তবে তোমাকে সে জন্য চেষ্টা, যত্ন এবং রীতিমত তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। কৃষি সম্বন্ধে চাষাদিগের একটি উপদেশ আছে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সে উপদেশ এই,—

"খাটে খাটায় দুনা পায়।
তার অর্দ্ধেক ছাতা মাথায়।
ঘরে বসে' পোছে বাত,
এবার যেমন তেমন আরবার হাবাত।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করে ও চাকরকে পরিশ্রম করায় সে প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইয়া থাকে, যে ব্যক্তি নিজে চাষে খাটে না কিন্তু নিয়ত ছাতা মাথায় দিয়া তদারক করে সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা কম লাভ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে মাঠে না গিয়া কেবল ঘর হইতে চাকরদিগকে শস্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, পরিণামে তাহাকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব কেবল জমী কিনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, উপযুক্তমত আবাদ করাইতে হইবে। কেমন করিয়া তাহা করিতে হয় বারান্তরে সে কথা বলিব।

স্বরলিপি।

ভূপালী—ঢিমাতেতালা।

আহা কি! চাঁদনী রাত,
হের লো সখি।
আহা কি! চাঁদনী রাত,
হের লো, আকাশ প্লাবিল—ভাসিল রে
বিমল চন্দ্র-করে;
আনন্দ উথলিল, বিহঙ্গেরা জাগিল
ভাবিয়ে প্রভাত;
—ঐ বুঝি বাজে বাঁশী
আসে শ্যামচাঁদ।
সব সখি মিলি একতানে
গাও লো মঙ্গল গান;
অনিল-হিল্লোলে মিশিবে সে তান
বাঁশীর সাথ॥

০ ১ ॥ ২
॥ ধপা ধা র্সা -া। ধা ধা পা -া। গা গা রা -গা।
॥ আহা কি চাঁ —। দি নী রা ত। হে র লো —।

৩
। -রা -া সা সা। ধপা ধা র্সা -া। ধা ধা পা -া।
। — — স খি। আহা কি চাঁ —। দি নী রা ত।

। গা গা রা -গা। -রা -া পা পা। ধা ধা পা -া।
। হে র লো —। — —আ কাশ। প্লা বি ল —।

। গা পা গা গা। রা গা রা গা। -রা সা সা সা।
। ভা সি ল রে। বি ম ল, চ। — ন্দ্র ক রে।

। সা -া সা সা। সা সা সা সা। -সা -রা -ন্‌া -সা।
আ — ন ন্দ। উ থ লি ল। — — — —।

। -ধ্‌া -না ধ্‌া -প্‌া। ধ্‌া সা সা রা। গা গা গা -া।
। — — — —। বি হ ঙ্গে রা। জা গি ল —।

। রা গা রা রা। সা -া -া -া। ধা -পা ধা ধা।
। ভা বি য়ে, প্র। ভা — — ত। ঐ — বু ঝি।

। ধা পা পা গা। পা গা পা পা। গা -রা -সা -া ॥
। বা জে বাঁ শী। আ সে, শ্যা ম। চাঁ — — দ ॥
২
। গা -া পা ধা। র্সা -া র্সা র্সা। র্সা -া -া ধা।
। স — ব, স। খি — মি লি। এ — — ক।

। র্রা -া র্সা -া। ধা র্সা র্সর্রা -া। র্রা -র্গা র্রা র্সা।
। তা — নে —। গা ও লো —। ম — ঙ্গ ল।

। র্সা -র্রা -না -র্সা। -ধা -না -ধা -পা। গা গা গা পা।
। গা — — —। — — — ন্‌। অ নি ল, হি।

। পা -া পা -া। পা পা পা না। ধা -া পা -া।
। লো — নে —। যি শি বে, সে। তা — — ল।

। পা -ধা পা পা। গা -রা -সা -া ॥ ॥
। বাঁ — শী র। সা — — থ ॥ ॥

ব্যাখ্যা।

১। পার্শ্ববর্ত্তী যুগল ছেদ আস্থায়ীর আরম্ভ হইতে পুনরাবৃত্তি করিবার চিহ্ন। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় ও থামিয়া অন্তরা প্রভৃতি অন্য কলি ধরিতে হয় সেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে।

উন্নতির যুগ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কালিদাস ও ভবভূতির যুগ আলোচনা করিয়াছি। সেই যুগে ভারতবর্ষে যেরূপ খ্যাতনামা কবি, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ লোকসকল আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেরূপ জগতে সচরাচর এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সেই যুগেই আরবদেশে মহম্মদ, পারস্য দেশে নওসরবান এবং রোমরাজ্যে প্রসিদ্ধনামা জষ্টিনিয়ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সে যুগটীকে মনুষ্যসমাজের একটী বিশেষ উন্নতির যুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মনুষ্যজাতির ইতিহাস সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ কয়েকটী বিশেষ উন্নতির যুগ লক্ষিত হয়। মনুষ্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর ক্রমশই উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, এই উন্নতির ফল যেন পাঁচ সাত শতাব্দীর পর এক একবার পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এবং যে যে কালে এই উন্নতির পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয় সেই কালকেই উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। সেই উন্নতির যুগগুলি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

১। খৃষ্টের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগতের মধ্যে কেবল চারিটী দেশে প্রকৃত সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল। নীল নদীকূলে প্রাচীন মিসরবাসীগণ মেম্ফিসনগর স্থাপন করিয়া এবং সুন্দর ও প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী-কূলবাসী প্রাচীন কাল্ডীয়গণও সেই প্রাচীনকালে জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। হোয়াংহো

কূলবাসী প্রাচীন চীনগণও সেইকালে যে প্রাচীন সভ্যতায় আলোক প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাতে পূর্ব্ব-আসিয়া আলোকময়। এবং সিন্ধুনদীকূলে প্রাচীন হিন্দুগণ সেইকালেই যে সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর ধর্ম্মগাথা রচনা করিয়াছিলেন, আর্য্য-জগতে তাহা অদ্যাপি সমাদৃত, এবং হিন্দুজগতে তাহা অদ্যাপি সনাতন ধর্ম্মের মূল। জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আজিও যে সভ্যতার আলোক প্রভা পাইতেছে তাহার প্রথম জ্যোতি, প্রথম বিস্ফুলিঙ্গ, প্রথম প্রদীপচতুষ্টয় এই চারিদেশে চারি জাতি দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছিল। একটী হেমেটিক্ জাতি, দ্বিতীয় সেমেটিক্ জাতি, তৃতীয় তুরাণীয় জাতি, চতুর্থ আর্য্যজাতি।

২। ইহার পর সাত কি আট শত বৎসরে কি ফললাভ হইল দেখা যাউক। অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৩০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত যে কাল অতিবাহিত হইয়াছিল সেই কালের জ্ঞানোন্নতি আলোচনা করা যাউক। এই যুগে সমস্ত সভ্যজগতে যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ভারত-বর্ষে কুরু ও পঞ্চাল, বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি অনেক সুসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতি গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে বাস করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণাদি সঙ্কলন করিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ উপনি-ষদ্ গ্রন্থগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন। চীনদেশে এইসময়ে যে "চাউ" রাজবংশ দেশের অধীশ্বর হইলেন, সে বংশ অদ্যাবধি চীন ইতিহাসে বিখ্যাত ও সম্মানিত। মিসরদেশে এই যুগে প্রসিদ্ধনামা সিসাষ্ট্রিস-বংশীয় রাজগণ দেশ শাসন করিতেন এবং কার্ণাক প্রভৃতি স্থানে যে বিস্ময়কর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ফর্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় হর্ম্ম্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-গণ তাহা জগতে অতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আসি-

রীয় রাজগণ এই সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিজয় বিস্তার করেন। হিটীয়গণ এই যুগে আসিয়া-মাইনর প্রদেশে যে নগরসমূহ নির্ম্মাণ করেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায়। গ্রীক এবং ট্রোজানগণ এই যুগে যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন তাহারই কাল্পনিক বর্ণনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদিপুস্তক হোমরের ইলিয়দ। ফিনিসীয়গণও এই যুগে ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আটলাণ্টিক সাগরে প্রথম বাণিজ্য বিস্তার করেন, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নগর স্থাপন করেন। এবং ইহুদীগণ এই যুগে প্রসিদ্ধনামা দায়ুদ রাজার অধীনে চারিদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সে দায়ুদের ধর্ম্ম-গাথাগুলি জগতে অদ্যাপি সমাদৃত।

৩। আর ছয় শত বৎসর অতিক্রম করিয়া দেখা যাউক। অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্বে ৬০০ হইতে ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই তিন শত বৎসরের কথা আলোচনা করা যাউক। এই যুগের উন্নতি, ধর্ম্ম-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা অতি বিস্ময়কর। এই যুগে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়, এবং গৌতম বুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস লইয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম সংগঠিত করিলেন, তাহা হইতে অদ্য জগতের লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। চীন-দেশে এই যুগে কনফিউশ্যাস্ যে ধর্ম্মশিক্ষা প্রচার করেন, তাহা অদ্যাপি জগতে সমাদৃত। গ্রীসদেশে এই যুগে পিথাগোরস ও সক্রেটিস এবং প্লেটো ও আরিষ্টটল দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া জগদ্বিখ্যাত হইলেন। হিরডোটস, থিউসিডিডিস ও জেনফন এই যুগে ইতিহাস রচনা করেন। পিণ্ডার, সফোক্লিস, ইস্কিলস, ইউরিপিডিস এই যুগে কাব্য রচনা করেন। ফিডিয়াস এই যুগে হর্ম্ম্য ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণে জগতে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ

করেন। পেরিক্লিস এই যুগে এথেন্‌স্‌ নগর শাসন করিয়া কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং প্রসিদ্ধনামা আলেক্‌জাণ্ডর এই যুগে সভ্যজগৎ জয় করিয়া গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করিলেন। তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর পরে অশোকরাজা জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। এই যুগের মধ্যে বাবিলনীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট নেবুকড্‌নেজার পশ্চিম আসিয়াতে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করেন, এবং বাবিলনে যে হর্ম্ম্য ও উদ্যানাদি প্রস্তুত করেন তাহা প্রাচীনকালে অমানুষিক বলিয়া বোধ হইত। মিসরবাসীগণ এই কালে ফিনিসীয়দিগের সাহায্যে সমস্ত আফ্রিকা অর্ণবপোত দ্বারা পরিক্রমণ করিলেন, এবং আপনাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির পুনঃসঙ্কলন করিলেন। পারসীক রাজা সাইরস এই যুগে পশ্চিম আসিয়াতে বহুবিস্তীর্ণ পারসীক রাজ্য স্থাপন করিলেন। সম্রাট দারায়স জেন্দাবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের পুনঃসঙ্কলন করিলেন, এবং ইহুদিগণ এই যুগে প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক (Old Testament) প্রথমে লিপিবদ্ধ করিলেন। আমরা আজকালের সভ্যতার বড় দর্প করি, আজকাল রেল হইয়াছে, জাহাজ হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষে বুদ্ধ, কনফিউশ্যস ও সক্রেটিসের যুগ অপেক্ষা মহত্তর যুগ কখন জগতে দৃষ্ট হইয়াছে কি না সন্দেহ।

৪। তাহার চারি পাঁচ শত বৎসর পরের যুগ একবার আলোচনা করা যাউক। খৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে ও কিছু পরে সভ্যতার কি কি ফললাভ হইয়াছিল দেখা যাউক। এই সময়ে ভারতবর্ষে ও মিসরদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক আলোচনা হইয়াছিল, এবং যে অষ্টাদশ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত অদ্যাপি রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তাহার প্রারম্ভ এই যুগে। কাশ্মীরদেশে এই যুগে কণিষ্ক রাজা শকাব্দের আরম্ভ করেন,

এবং মালবদেশে এই যুগে সম্বৎ আরম্ভ হয়। বীরপ্রসবিনী রোমনগরী এই কালে বহুবীরসমাকীর্ণ ছিল। জুলিয়স সিজার, পম্পী, এণ্টনী, অগষ্টস সিজার প্রভৃতি যোদ্ধাগণ ইতিহাসে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। সিসিরো বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয় এবং ভর্জিল ও হোরেস কাব্যে অদ্বিতীয়। এবং এই যুগে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে শান্তি প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অদ্য ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্ম।

৫। খৃষ্টের পর পাঁচ শত হইতে আট শত বৎসর পর্য্যন্ত যে যুগ তাহাকে আমরা উন্নতির পঞ্চম যুগ বলি। ভারতবর্ষে এটী কবি কালিদাস ও ভবভূতির যুগ। পারস্যদেশে মহাবলপরাক্রান্ত ও ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নওসরবান্ এই যুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং রাজ্যবিস্তার ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধনামা জষ্টিনিয়ন এই যুগে রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্কলিত রোমক রাজনীতি অদ্যাপি অধীত হইতেছে। আরবদেশে এই যুগে ধর্ম্মাত্মা মহম্মদ যে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, অচিরে তাহা সিন্ধুনদীর তীর হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। এই যুগের শেষভাগে বাগ্‌দাদে হারুন অল রসীদ, স্পেনে আব্দুর রহমান, এবং ফ্রান্সে শার্লমান নামক পরাক্রান্ত সম্রাটগণ সভ্যতা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতিসাধন করিয়া আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

৬। ইহার প্রায় সাত আট শত বৎসর পরে আর একটী উন্নতির যুগ আবির্ভূত হইল। ভারতবর্ষে তখন প্রসিদ্ধনামা আকবর শাসন করিতেন এবং চৈতন্য প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ইউরোপে লুথর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার করিলেন, কলম্বস্ আমে-

রিকা আবিষ্কার করিলেন, কোপর্নিকাস ও গালিলিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিলেন, বেকন ও ডেকার্ট্ বিজ্ঞানালোচনা করিলেন, ইংলণ্ডের কবিশ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়র প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হেতু জনসমাজে জ্ঞানবিস্তারের অনেক সুবিধা ঘটিল।

৭। তাহার তিন চারি শত বৎসর পর আর একটী উন্নতির যুগ আবির্ভূত হইয়াছে। এই যুগে বল্টেয়র ও রুসোর পুস্তকাবলী পাঠে ইউরোপীয় সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইল, ও ফরাসী বিপ্লবে জগৎ বিপর্য্যস্ত হইল। ওয়াসিংটন আমেরিকা স্বাধীন করিলেন, নেপোলিয়ন যুদ্ধবিদ্যায় অমানুষিক শক্তি প্রদর্শনে ইউরোপকে স্তম্ভিত করিলেন। বিজ্ঞানালোচনায় নিউটন, লাপ্লাস, কিউবিয়ে ও ডারউইন; সাহিত্যে গেটে, শিলর, বাইরণ ও ভিক্টর হিউগো, এবং দর্শনে হিউম, কাণ্ট ও হেগেল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। গ্রীকগণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন, গারিবল্ডী ইতালি স্বাধীন করিলেন, বিস্মার্ক জর্ম্মণিকে একীভূত করিলেন, সমস্ত জগতে মানব-স্বাধীনতার মহামন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, যিনি এই যুগ কয়েকটীর বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন তিনি মনুষ্যের প্রকৃত ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে; এবং ক্রমশঃ যে উন্নতি লাভ করা যায় তাহা এক একটী বিশেষ যুগে যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে। পথভ্রমণের সময় যেরূপ মধ্যে মধ্যে মাইল-প্রস্তর দৃষ্টে কতদূর ভ্রমণ করা হইল তাহা জানা যায়, সেই-রূপ প্রত্যেক পাঁচ কি ছয় কি আট শতাব্দীর পর এক একটী

বিশেষ উন্নতির যুগে মনুষ্যসমাজের উন্নতি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এবং সেইগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে মনুষ্য-সমাজের উন্নতির সমস্ত ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়।

যে সাতটী যুগের উল্লেখ করা গেল, হিন্দুগণ তাহার এক একটী হিন্দু নাম দিতে পারেন। প্রথম যুগটী বৈদিক যুগ; দ্বিতীয়টী মহাভারতীয় যুগ; তৃতীয়টী গৌতম বুদ্ধের যুগ; চতুর্থটী কণিষ্ক রাজার যুগ; পঞ্চমটী কবি কালিদাসের যুগ; ষষ্ঠ চৈতন্য ও নানকের যুগ; সপ্তম রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। প্রতি যুগে ভারতবর্ষে যে মহাত্মা ধর্ম্মোপদেষ্টা ও কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষের সনাতন গৌরবের এবং ভবিষ্যৎ আশার হেতুস্থল।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি কথাটাই সাংখ্যের কথা। সাংখ্য-দর্শনই অভিব্যক্তিবাদের আদিগুরু। এ বিষয়ে কাহারো যদি কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে, তবে সাংখ্যকারিকার গোড়ার একটি সূত্র দেখিলেই তাঁহার সে সন্দেহ ভাঙিয়া যাইবে। সে সূত্র এই;—

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ বিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।

দেখ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুইটি শব্দ জুড়িয়া ব্যক্তাব্যক্ত এই একটি শব্দ রচনা করা হইয়াছে, এবং প্রকৃতি-শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ যমক-শব্দটি বসাইয়া প্রকৃতির অর্থ খুলিয়া দেওয়া হই-

রাছে ;—ইসারায় বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ব্যক্তাব্যক্তের উপরেই প্রতিষ্ঠায়মান।

প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রবর্ত্তক কে? এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? এ দুই প্রশ্ন যদিচ প্রথমেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে সহসা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রকৃতি হইতে কোন্ কোন্ সামগ্রী অভিব্যক্ত হয় এবং তাহা কিরূপ প্রণালীতে অভিব্যক্ত হয় তাহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গোড়ার কথা দুইটি ;—মূল উপাদানের অবিনশ্বরতা এবং মূল-ক্রিয়ার চিরস্থিতি। অবিনশ্বরতা এবং চিরস্থিতি এ দুই শব্দের ভাবার্থ একই। কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক—যদিচ আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সে কথাটি এখনো পর্য্যন্ত রীতিমত আমল পায় নাই। সে কথাটি কি শব্দে ব্যক্ত করিলে ঠিক্ হয় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আপাততঃ তাহাকে বলা যাক্ মনোবীজ বা অন্তঃকরণ-বীজ। আদিম জীবপঙ্ক যদিচ জড়-পিণ্ড মাত্র কিন্তু তাহারও ভিতরে মনোবীজ জাগিতেছে ; সে মনোবীজ সুদূর ভবিষ্যতে এক না এক সময়ে অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত পুষ্পিত এবং ফলিত হইয়া উঠিবে—তাহা যখন হইবে তখন তাহাকে মনোবীজ না বলিয়া বলিব—মন বা অন্তঃকরণ।

উপাদানের অনশ্বরতা এবং শক্তিক্রিয়ার চিরস্থায়ীত্ব এই দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি "মনোবীজের আবহমানতা" এই তত্ত্বটি জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির মূল অবয়ব তিনটি—মূল উপাদান, মূলশক্তি এবং মনোবীজ।

প্রকৃতির এই তিনটি মূল অবয়ব সাংখ্য-দর্শনে তম, রজ এবং সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইহা ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে, তবে কি না মোটামুটি রকমে। ইহার সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত এইরূপ;—

আমাদের দেশের পণ্ডিত-সম্প্রদায় সত্ত্বরজস্তমোগুণকে প্রকৃতির পরাকাষ্ঠা মূল অবয়ব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন—ভালই, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা এরূপ করেন কেন—সত্ত্বরজস্তমোগুণের গোড়ার বৃত্তান্ত কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা এরূপ ভাবেন কেন যে, "বৃক্ষের মূল শিকড়, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, শিকড়ের মূল কি একথা পাগলের কথা!" তাঁহাদের জানা উচিত যে, "শিকড়ের মূল অজিজ্ঞাস্য" একথা এক হিসাবে সত্য হইলেও আর এক হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিকড়েরও মূল আছে; শিকড়ের মূল—বীজ। অতঃপর আমরা দেখাইতেছি যে, শিকড়ের মূল যেমন বীজ—সত্ত্বরজস্তমোগুণের গোড়ার বৃত্তান্ত তেমনি প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত ভাব।

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, দৃশ্যমান বস্তু সকলের অব্যক্তভাব ঘটাইবার কর্ত্তা কে? তবে তাহার উত্তর, অন্ধকার—তমঃ। ব্যক্তভাব ঘটাইবার কর্ত্তা কে? আলোক।

আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী কে? রঞ্জন—রঙ—রজ। গেটের রঞ্জনতত্ত্বের গোড়ার সিদ্ধান্ত এই যে,—colour arises through the reciprocal action of light and darkness আলো অন্ধকারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে রঙ উৎপন্ন হয়। পুরাণ তন্ত্রাদিতে রূপকচ্ছলে সত্ত্বগুণে সাদা রঙ, তমোগুণে কালো রঙ এবং রজোগুণে লাল রঙ আরোপিত হইয়া থাকে। লাল রঙই রঙ; সাদা কালো আলো-অন্ধকারেরই সামিল; এদুটাকে কেবল বলপূর্ব্বক রঙের কোটায় স্থান দেওয়া হইয়া

থাকে। লোকের সহজ বুদ্ধিও তাহাই বলে; তার সাক্ষী—রাঙা এবং রঙ দুয়ের মূল-অর্থ একই;

যথা; ভঞ্জন—ভঙ্গ—ভাঙা।

রঞ্জন—রঙ্গ—রাঙা = রঙ।

মানিলাম, তমঃ = অন্ধকার,

রজঃ = রঙ।

কিন্তু সত্ত্ব-শব্দের তো ওরূপ কোনো চাক্ষুষ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! ঐমন কথা বলিও না! খুঁজিলে না পাওয়া যায় এমন বস্তুই নাই; অন্ধকার একপ্রকার অসত্তা এটা স্থির; যথা :—

অন্ধকার দেখা = কিছুই না দেখা।

অতএব অন্ধকার = কিছুই না = অসত্তা।

তবেই হইতেছে যে,

অন্ধকারের বিপরীত = অসত্তার বিপরীত
অন্ধকারের বিপরীত = আলো
অসত্তার বিপরীত = সত্তা

এই হিসাবে

আলো = সত্তা = সত্ত্ব (যেমন প্রভুতা = প্রভুত্ব)।

সত্ত্বশব্দ হইতে আঁলো-অর্থ আমি যে বলপূর্ব্বক নিঙড়াইয়া বাহির করিতেছি (যেমন সশার বীচি হইতে কোনো কোনো মহাপুরুষ সূর্য্যরশ্মি বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন) এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না; সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টই রহিয়াছে যে, "প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাৎ"—সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্ম্মী, রজোগুণ প্রবৃত্তি-ধর্ম্মী, তমোগুণ নিয়ম-ধর্ম্মী অর্থাৎ বন্ধন-ধর্ম্মী; (নিয়ম

শব্দে এখানে প্রতিরোধকারিতা—resistance)। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে,

অভিব্যক্তির মূল—আলো,

অনভিব্যক্তির মূল অন্ধকার,

এবং অনভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তিতে উপসংক্রমণ লাল রঙ—(প্রত্যূষে যেমন দেখা যায় অন্ধকার হইতে আলোকে উপসংক্রমণ করিবার সোপান পূর্ব্ব-দিকের রক্তিম রাগ)।

এই তিনের ভাব সত্ত্বরজস্তমোগুণের ললাটে স্পষ্টাকারে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে।

রূপকচ্ছলেই বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্বরজস্তমোগুণ= আলো, রঙ, অন্ধকার। কিন্তু আসল কথা এই যে, তমোগুণ= নিশ্চেষ্ট জড় (matter with its inertia); রজোগুণ=চেষ্টা (activity); এবং সত্ত্বগুণ=মন।

প্রকৃতি জড় হইতে মনের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে—ইহা সকলেরই জানা কথা। আগে জীব—পরে জড় নহে, কিন্তু আগে জড় পরে জীব, প্রকৃতির বীজমন্ত্র।

প্রকৃতি জড় হইতে মনের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, এই কথাটিকে রূপকের পরিচ্ছদে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, প্রকৃতি অন্ধকার হইতে আলোকে ক্রমশই পদনিক্ষেপ করিতেছে। আর, জড় হইতে জীবে পৌঁছিবার যে চেষ্টা সেইটি লাল রঙ—(রাত্রি হইতে দিবালোকে পৌঁছিবার চেষ্টা যেমন পূর্ব্বদিকের রক্তিম রাগ)।

অতঃপর রূপক বাদ দিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণের মুখ্য ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যা'ক্।

(১) প্রকৃতির চেষ্টা অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার দিকে।

(২) যে কোনো চেষ্টা হউক্ না কেন, যতক্ষণ তাহা চেষ্টা-মাত্র থাকে ততক্ষণ তাহা দুঃখেরই নামান্তর—চেষ্টা ফলবতী হইলেই তাহা সুখে পরিণত হয়।

(৩) প্রকৃতির চেষ্টা যেহেতু ব্যক্ত হইবার দিকে এই জন্য ব্যক্ত হইতে পারিলেই তাহার চেষ্টা ফলবতী হয়—চেষ্টা ফলবতী হইলেই সুখের উৎপত্তি হয়। এই জন্য সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক এবং সুখাত্মক উভয়-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঐরূপ কারণে তমোগুণ অন্ধকার নিশ্চেষ্টতা এবং বিষাদের মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত ভাবের উপরেই সত্ত্বরজস্তমোগুণের মূল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রকাশ সত্ত্বগুণ, অপ্রকাশ তমোগুণ, এবং প্রকাশ-চেষ্টা রজোগুণ।

আবার, অপ্রকাশের সহিত অসত্তার যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, প্রকাশের সহিত সত্তার সেইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; এইজন্য প্রকাশগুণ এবং সত্ত্বগুণ দুয়ের ভাবার্থ একই।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিসম্ভূত জগৎ দুয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো প্রভেদ নাই; কাজেই প্রকৃতি-সম্ভূত জগৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে—ভিন্ন যখন নহে তখন তাহাও (অর্থাৎ প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থসকলও) প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য। ব্যক্ত প্রকৃতিও প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রকৃতিও প্রকৃতি, এবং উভয়ই সত্ত্বরজস্তমোগুণের সম্মিশ্র; প্রভেদ কেবল এই যে, অব্যক্ত প্রকৃতি অথবা মূল প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা, ব্যক্ত প্রকৃতি (যাহার আর এক নাম বিকৃতি) তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের বৈষম্যাবস্থা। আমরা সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছি যে, জগতের মূল

উপাদান (Matter) মূলশক্তি (Force) এবং মনোবীজ অভিব্যক্তি-রাজ্যের অন্তঃপাতী নহে—কেননা তাহারা জগতের গোড়ার বস্তু—দৃশ্যমান জগতের কোনো পরিবর্ত্তনেই তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জগতের মূলস্থানে ঐ তিনটি বস্তু (উপাদান, শক্তি এবং মনোবীজ) তিন নহে, কিন্তু এক। মনে কর যেন একই জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে তিনটি রশ্মিধারা বিনির্গত হইয়াছে যথা—

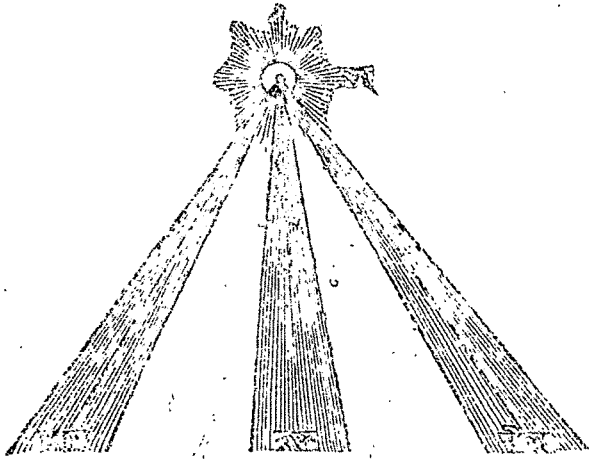

ল চিহ্নিত স্থানে ঐ তিনটি রশ্মিধারা সাম্যাবস্থায় পরিণত হইয়াছে—অর্থাৎ তিনের মধ্যে কোনো প্রভেদই লক্ষিত হইতেছে না। এ একটা মোটামুটি দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতির অভিব্যক্তির গোড়ায় জগতের মূল উপাদান, মূল ক্রিয়া এবং মনোবীজ, তিনই অভেদ-ভাবে একীভূত-ভাবে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। এবং প্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে—ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে উপাদান

এবং শক্তি উভয়ে গোড়ায় এক—আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা বলিতেছি, উপাদান, শক্তি এবং মনোবীজ তিনই গোড়ায় এক—অব্যক্ত প্রকৃতি। ত্রিগুণ-সম্বন্ধে আরো গোটা দুই কথা বলিবার আছে তাহা পরে বলিব।

পঁহু।

পঁহু শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যাউক। পদরত্নাবলী নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—"চৈতন্যদেব জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেন না তখন সে ধর্ম্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌনসম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত। জয়দেব তাহাই গীত করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যে সকল মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী; জয়দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্য যে সকল মহাজনের গ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না।

"এমন বলিতেছি না যে, চৈতন্যের পূর্ব্বেকার বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মধুররসসর্ব্বস্ব—শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যাদির তখন নামগন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে, মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি যে, অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। অন্য রসের যে প্রয়োজন তাহাও তত অনুভূত হয় নাই। আমরা বলিয়াছি গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন

এবং তাহাই তাঁহারা গীত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা অন্য রসের বড় আলোচনা করেন নাই।”

সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে অর্থে পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস তাহা হইতে কিছু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন। এইজন্য আমার নিবেদন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঁধু অর্থে এবং গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসাদি প্রভু অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে দাস্যভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের প্রাধান্য অধিক। এজন্য গোবিন্দদাসের রচনায় যেখানে পঁহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও প্রভু বা Lord অর্থের কঠোরতা সখ্যভাবে কিছু কোমল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের Lord সম্বোধন অপেক্ষা বৈষ্ণবধর্ম্মের পঁহু সম্বোধনে মধুর ভাব অধিক প্রকাশ পায়।

আর একটী কথা। বিদ্যাপতি কোথায়ও আপনার ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণকে পঁহু শব্দে সম্বোধন করেন নাই। চৈতন্যের পরবর্ত্তী কবিগণ আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে পঁহু শব্দে সম্বোধন কখন কখন করিয়াছেন—সেখানে দাস্যভাবে প্রভু সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে বা সখ্যভাবে বঁধু সম্বোধন হইয়া থাকিবে। চৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনাদিগকে দাস শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এজন্য প্রভু অর্থে পঁহুশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অনুমান করা তত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু বিদ্যাপতি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে রাধার বা রাধার সখীর মুখে ঐ শব্দটী আরোপ করিয়াছেন। হিন্দু স্ত্রীর পতিভক্তিতে দাস্যভাব থাকিলেও মধুররসসর্ব্বস্ব পরকীয়াপ্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত। রাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা নিঃস্বার্থ মধুরভাবে। রাধা কৃষ্ণকে “প্রভু” বলিয়া সম্বোধন করিবেন বোধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীশ বাবু

দেখাইয়াছেন, গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে যেখানে যেখানে পঁহু শব্দ পাওয়া যায়—এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। দেখিবেন—বিদ্যাপতি নিজে কখন শ্রীকৃষ্ণকে পঁহু শব্দে সম্বোধন করেন নাই। এবং যেখানে যেখানে পঁহু শব্দের প্রয়োগ আছে সেখানে বঁধু শব্দ ব্যবহার করিলে অর্থের ব্যত্যয় হয় না।

"ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর
কত রূপে মিনতি করল পঁহু মোর
লাগল কুদিন করলু হাম মান
অবহুঁনা নিকসয়ে কঠিন পরাণ"
"নিজ পঁহু পরিহরি আইলি কমলমুখী"
"নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
সির লেলি ঘোবট নারী
লগলগ পঁহুকে চলইতি সজনি গে
সকুচল অঙ্কম নারী"
"সুন্দরি চললিহি পঁহু ঘরনা
চহুদিশি সখি সভ কর ধরি না"
"কহিঅ ন পারিঅ পঁহু মুখ ভাষা
সমুখ নিহারি দুহু মন হাসা"
"গুণ অবগুণ পঁহু একো ন বুঝলহি
রাহু গরাসল চন্দা"
"জে কিছু পঁহু দেল আঁচর ঝাঁপি লেলি
সখি সভ কর উপহাসে"
"সুমরি সমাগম সুপঁহুক পাসা"

"বোলল বোল সুপহু নিরবাহে"
"পঁহু উঠি পরদেশ গেল"
"হসি পঁহু উতর না দেলরে"
"করব মৈঁ পঁহুক উদেসরে"
"এহি অবসর পঁহু মিলন জেহন সুখ"
"অপন অপন পঁহু সবহু জেমাওলি"
"মন দৈ রুসি রহল পঁহু সোই"
"জৌ হম জনিতহুঁ এ হন নিঠুর পঁহু"
ইত্যাদি।

এ সকল উক্তি রাধার বা রাধার সখীর, এবং সর্ব্বত্র পহুঁস্থানে বঁধু ব্যবহার করা যাইতে পারে, "পুনঃ" বা "ভণে" ব্যবহার করিতে হয় না, প্রভু শব্দও প্রযোজ্য নহে। এখন দেখা যাউক দীনেন্দ্র বাবু ও আপনি যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন সেখানে বঁধু বা প্রভু অর্থ হইতে পারে কি না।

গোরা পঁহু বিরলে বসিয়া=বঁধু
পরশিতে বিহসি ঠেলই পঁহু পাণি=বঁধুর
ধরি পঁহু হাসি আলিঙ্গন দেল=বঁধু
দাস অনন্ত পঁহু না পাওল ওর=বঁধু বা প্রভু
যৈছন চতুর শঠের পঁহু=বঁধু
পঁহু মোর শ্রীনিবাস=প্রভু
কহ রাধামোহন পঁহুক বলিহারী=বঁধুর
পঁহুক প্রতাপ মন্ত্র করু যাপে=বঁধুর
পঁহুক চরণ যুগ সারথী করবি=প্রভুর
গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর=বঁধু
গোবিন্দদাস পঁহু জগ মনমোহন=বঁধু

রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ=বঁধু
নরোত্তম দাস পঁহু নাগর কান=বঁধু

নটবর, মনমোহন, রসিকনাথ ও নাগর কানুকে প্রভু অপেক্ষা বঁধু বলাই ভাল।

রাধামোহন পঁহু দুঁহু অতি নিরূপন=বঁধু
রাধামোহন পঁহু তুয়া পায়ে নিবেদয়ে=প্রভু

হে প্রভু! রাধামোহন তোমার পায়ে নিবেদন করিতেছে।

গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্নে বেলি অবসান ভৈগেলি=বঁধু

হে গোবিন্দদাসের বঁধু বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।

সব কয়টী পদে পঁহুস্থানে প্রভু বা বঁধু বসান যাইতে পারে। কষ্টকল্পনার আবশ্যক হয় না। ভণে বা পুনঃ অর্থ কোথায়ও আবশ্যক হয় না। রাধামোহন হইতে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ অনেক দূরে। সখ্যভাব অপেক্ষা দাস্যভাবসাধন সহজতর। সাধনার দুরূহত্ব হেতু ও তান্ত্রিকদিগের সংসর্গবশতঃ ক্রমে দাস্যভাব বৈষ্ণবসমাজে অধিক হইয়া পড়িয়াছে। এবং মধুর ভাব অন্তর্হিত হইতেছে।

এখন দেখা যাউক শব্দশাস্ত্র হইতে পঁহুশব্দের কোন ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় কি না। গতবারে আমি বলিয়াছিলাম বঁধু শব্দ হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এটী আমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছিল। বন্ধুশব্দের "ব" বর্গীয় "ব"। বর্গীয় "ব" "প"রে অপভ্রংশ হয় না। মাননীয় গ্রিয়ার্সন সাহেব আমার এ ভ্রমটী দেখাইয়া দিয়াছেন। বার্ত্তা হইতে পাতা এবং বর্ত্তিকা হইতে পলিতা হইয়াছে আমি গতবারে দেখাইয়াছিলাম। সে দুইটী অন্তঃস্থ "ব"। যদি সংস্কৃত কোন শব্দ হইতে পঁহু শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে প্রভু হইতে হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ

হয় ইহা তৎসম বা তদ্ভব সংস্কৃত শব্দ নহে। ইহা একটী দেশজ শব্দ এবং এই শব্দের রূপান্তর পাঁহোন শব্দ অদ্যাপি কুটুম্ব বা আত্মীয় অর্থে বিহারে প্রচলিত রহিয়াছে।

পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় আমি দেখিয়াছি ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং ও র বাঙ্গালায় চন্দ্রবিন্দুর আকারে পরিণত হয় এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়।

অঙ্গ বস্ত্র=আঁগোস্তর, আগোছা; অগ্রণী=আঁগোরী, অঙ্গুরী=আঁগুরী, অঙ্গৈঠী, আঁগটী; অঙ্গার=আঁগার, আঙার; শ্রাবণ=সাঙন, অন্তর=আঁতর, কাঞ্চন=কাঁচর, কাঁচল; কণ্ঠ=কাঁত, কান্তি=কাঁতি, স্কন্ধ=কাঁধ, কম্প=কাঁপ, অগ্র=আঁগ, কুণ্ড=কুঁড়, কুঞ্জ=কুঁজ, কুঞ্জী=কুঁজি, পুঞ্জী=পুঁজি, কুন্দ=কুঁদ, খণ্ড=খাঁড়া, চন্দ=চাঁদ, নিদ্রা=নোন্দ, নীঁদ; বক্র=বঙ্ক, বাঁকা; আম্র=আঁব, অক্ষি=আঁখ, অঙ্গুল=আঁগুল, অঙ্কুর=আঁকুর, অঙ্গন=আঁগন, হংস=হাঁস, বেত্র=বেঁত, মহিষ=ভৈঁস, অন্ধকার=আঁধিয়ার, সিংহ=সাঁ, অঙ্ক=আঁক, আঁকা; অশ্রু=আঁশু, আঁস; ছন্দ=ছাঁদ, গ্রাম=গাঁব, ভ্রমর=ভঁঅর, পঞ্চ=পাঁচ, অগ্নি=আঁগ, মুদ্রা=মুঁদনা, অক্ষর=আঁখর, অঙ্কুস=আঁকসী, কক্ষ=কাঁখ, পক্ষ=পাঁখ, পঙ্ক=পাঁক, কুণ্ঠী=কুঁড়ী, কর্কট=কাঁকড়া, কঙ্কর=কাঁকর, আঁকরা; বংশ=বাঁশ, তন্তু=তাঁত, যন্ত্র=জাঁতা, ফন্দ=ফাঁদ, দন্ত=দাঁত অঞ্চল=আঁচল, আঁচলা, আঁচরা; বণ্টন=বাঁটা, পঞ্জর=পাঁজর, অঞ্জলি=আঁজুরী, কুমার=কুঁঅর, উজ্জ্বল=উজারা, ইজোরা; আঞ্জীর=আঁজীর, মঞ্জন=মাঁজন, অস্তি=আঁছিয়া, আচ্ছা; আচমন=আঁচান, আকর্ষ=আঁচর, আঁচড়।

নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি "হ" য়ে পরিণত হয় দেখিতে পাইয়াছি। ক, খ, জ, ঝ, ত, থ, ধ, প, ব, ভ, ম, য, শ, ষ, স, ক্ষ। যথা—

কোকিল=কোহিল, কোক=কোহ, মুখ=মুহ, সখী=সহী, নখ=নহ, রেখা=রেহা, রজনী=রহনী, মুগ্ধ=মোহ, ভ্রাতৃ=ভাহি, চত=চহ, নাথ=নাহ, পাথর=পাহন, দধি=দহি, পরিধান=পহিরণ, বধির=বহির, বিধি=বিহি, গোধী=

গোহী, গোপ=গোহ, বাপে=বাহে, ধাব=ধাহে, শোভন=শোহন, গভীর=গহীর, সুভাবন=সোহায়ন, ছায়=ছাহ, কেশরী=কেহরী, দশ=দহ, পুষ্প=পুহপ, মাস=মাহ, দোসর=দোহর, দক্ষিণ=দহিন, সাক্ষ=সাহ।

প্রত্যুত্তর।

পঁহু শব্দ বন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা আপনি স্বীকার করেন, তথাপি উক্ত শব্দ যে প্রভুশব্দমূলক তাহা আপনার সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু পঁহু যে তৎসম বা তদ্ভব সংস্কৃত শব্দ নহে পরন্তু দেশজ শব্দ আপনার এরূপ অনুমানের পক্ষে কোন উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল আপনি বলিয়াছেন—"মধুররসসর্ব্বস্ব পরকীয়াপ্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত।" কিন্তু এই একমাত্র যুক্তি আমার নিকট যথেষ্ট প্রবল বোধ হয় না, কারণ, বৈষ্ণবপদাবলীর অনেক স্থানেই রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী ও কৃষ্ণ আপনাকে রাধিকার দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পদাবলীতে স্থানে স্থানে "পঁহু" শব্দ প্রভু অথবা বঁধু ছাড়াও অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

রাধামোহন দাস রাধিকার বিরহবর্ণনা করিতেছেন ;—

প্রেমগজ দলন সহই না পারই জীবইতে করই ধিকার।
অন্তরগত তুহুঁ নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।
অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জর ছটপট জলজ শয়ান।
রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবাণ।

অর্থাৎ শ্যামকে সম্বোধন করিয়া দূতী কহিতেছে—প্রেম-

গজের দলন সহিতে না পারিয়া রাধিকা বাঁচিয়া থাকা ধিক্কারযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তর্গত তোমাকে নির্গত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তোমার অস্থির নয়নশরঘাতে বিষম জরাতুর হইয়া বিরহিনী পদ্মশয়ন অবলম্বন করিয়াছেন। রাধামোহন কহিতেছেন যাহাকে পঞ্চবাণ লাগে তাহার পক্ষে এরূপ আচরণ কিছুই অপরূপ নহে।

এস্থলে পঁহুশব্দের কি অর্থ হইতেছে? "রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন" এরূপ অর্থ অসংগত। কারণ, কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক। "রাধামোহন কহিতেছেন হে প্রভু" এরূপ অর্থও এস্থলে ঠিক খাটে না, কারণ, সেরূপ অর্থ হইলে পঁহু শব্দ পরে বসিত—তাহা হইলে কবি সম্ভবতঃ "রাধামোহন কহে অপরূপ নহে পঁহু" এইরূপ শব্দবিন্যাস ব্যবহার করিতেন।

যুগলমূর্ত্তি বর্ণনায় গোবিন্দদাস কহিতেছেন।

ও নব পদুমিনী সাজ,
ইহ মত্ত মধুকর রাজ।
ও মুখ চন্দ উজোর,
ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

এখানে ভণিতার অর্থ "অরুণের নিকট চাঁদ দেখিয়া গোবিন্দদাসের ধাঁদা লাগিয়াছে।" গোবিন্দদাসের প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে একথা বলা যায় না, কারণ, তিনিই বর্ণনার বিষয়। এখানে "পঁহু" সম্বোধন পদ নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

শ্যামের সেবা সমাপনান্তে রাধিকা সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন—

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।

নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়ান।
ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয়কার।
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়
গোবিন্দদাস পহুঁ এহ রস গায়।

এখানেও পঁহু অর্থে প্রভু অথবা বঁধু অসঙ্গত।

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।
গোধন গরজত বড়ই গভীর
ঘন ঘন দোহন করত বড়ুবীর।
গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ
মুটকি মুটকি ভরি রাখত চারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

এখানে "গোবিন্দদাসের প্রভু নিরীক্ষণ করিতেছেন" এরূপ অর্থ হয় না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি দোহনে নিযুক্ত।

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী,
গায়ত গোবিন্দদাস পহুঁ॥

এখানে গোবিন্দদাসের প্রভু গান গাহিতেছেন ঠিক হয় না, কারণ, তাঁহার মুখে মোহন মুরলী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ॥

শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখচন্দ।

* * * * *

গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীজন
গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন
বেলি অবসান ভৈ গেলি।

এই পদে কেবল রাধিকার গৃহের কথা হইতেছে; তিনি ক্রমে ক্রমে গৃহকার্য্য এবং ভোজনাদি সমাধা করিলেন এবং সন্ধ্যা হইল—কবি ইহাই দর্শন এবং বর্ণনা করিতেছেন, এখানে শ্যাম কোথায় যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, "হে গোবিন্দদাসের বঁধু বেলা গেল সন্ধ্যা হল।"

আমি কেবল নির্দ্দেশ করিতে চাহি যে, গোবিন্দদাসের এবং দুই একস্থলে রাধামোহন দাসের পদাবলীতে পঁহু, পহুঁ বা পহু, প্রভু ও বঁধু অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কি অর্থে হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতির নোটে অক্ষয় বাবু এক স্থলে "পহু" অর্থে "পুনঃ" লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্থ নিতান্ত অনুমানমূলক না মনে করিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পুনঃ অর্থ সঙ্গত হয়। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে "ভণে" অর্থ না করিয়া "পুনঃ" অর্থ করিলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন "গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন" ইত্যাদি।—

এই কারণে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া আছি। ভণহুঁ এবং পুনহুঁ এই দুই শব্দ হইতেই যদি "পঁহু"র উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে স্থানভেদে এই দুই অর্থই স্বীকার করিয়া লওয়া

যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর কোন বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে "পহুঁ" শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোন দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি; আপনি মিথিলা-প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোন পুঁথিতে পাইয়াছেন? গ্রিয়ার্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও "পঁহু" দেখি নাই, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই।

"ভারতবর্ষে।"*

দুই বৎসর হইল শেভ্রিয়োঁ নামক একজন ফরাসিস্ পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান ও তথাকার অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, রীতিনীতি

---

*Dans L' Inde—Par André Chevrillon.

পরিদর্শন করিয়া তাঁহার মনে যখন যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহা অতি সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ অতীব মনোরম। তাঁহার বর্ণনাশক্তি চমৎকার। তাহাতে চিত্রকরের নিপুণতা লক্ষিত হয়। দুই একটা সামান্য আঁচড় দিয়া এক একটা ছবি কেমন জলন্তরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা কবিত্বরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার আর একটি প্রধান গুণ এই, বিদেশীয় আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির সমালোচনায় তাঁহার লেখায় কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় না। তিনি যতদূর পারিয়াছেন, ভিতর পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া সহৃদয়ভাবে ও উদারভাবে সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এরূপ উদারতা বোধ হয় ফ্ররাসীদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। ইংরাজ পর্য্যটকদিগের লেখায় এরূপ ভাব সচরাচর দেখা যায় না।

দার্জিলিঙ্গের ইংরাজ সমাজের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"এই 'অ্যাসেম্ব্লি-রুম্স্'-এ সন্ধ্যাকালে নৃত্য হয়—সেই সময়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে রসালাপ চলে এবং সেই রসালাপ পরিণামে বিবাহে পর্য্যবসিত হয়। ..... এই দেখ সৈনিকের দল—রাঙ্গা-মুখ, ব্যায়াম-গঠিত সবল শরীর, চুল পমেটমলিপ্ত, উহারা বারিকে জেণ্টল-ম্যানের মত বাস করে—ছড়ি হাতে, অবৈতনিকের ভাবে, বিজেতৃভাবে সদর্পে পায়চালি করে। এই দেখ ভদ্র 'বোর্ডিং হাউস্'। দিনান্ত ভোজনের উপলক্ষ্যে সবাই কাল কোর্ত্তা পরিয়াছে। বাড়ির কর্ত্রী ভোজনের আরম্ভে দস্তুরমত প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছেন এবং মাংসর পাৎলা পাৎলা চাক্‌লা কাটিয়া ও চাপ্‌-চাপ্ 'পুডিং'-এর টুক্‌রা সকলের পাতে শিষ্টতা সহকারে চালান করিতেছেন। গৃহস্বামী, যাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলি-

নেই হয় অথচ যাঁহার না থাকাটাও ভাল দেখায় না—তিনি গৃহের সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই যেন অধিষ্ঠিত। ভোজন-কালে শান্তভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল—সে কথাবার্ত্তা সুশিক্ষিত, শান্ত ও সামাজিক লোকদিগেরই উপযুক্ত। আহারের পর বৈঠকখানায় যাওয়া গেল। একটি যুবতী মহিলা পিয়ানো বাজাইতে বসিলেন। কতকগুলি প্রেমের গান ও স্বদেশের গৌরব-সূচক গান বাজান হইল। পরদিনে কোথায় ভ্রমণ করা যাইবে স্থির করিয়া মজ্‌লিস্ ভঙ্গ হইল। ইহার সহিত টন্‌কিন ও ট্যুনিস্ প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের তুলনা করিয়া দেখ। ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা প্রায়ই অবিবাহিত। তাহাদের যেন সময় কাটে না—প্রবাসের কষ্ট তাহারা কি তীব্ররূপেই অনুভব করে। এখানে ইংরাজেরা যেন ইংলণ্ডেই রহিয়াছে। শুধু যে তাহাদের অনুষ্ঠান, তাহাদের অভ্যাস, তাহাদের জাতীয় সংস্কার এখানে আনয়ন করিয়াছে তাহা নহে, নিজ জন্মস্থানের বহি-র্দৃশ্য ও সাজসজ্জা পর্য্যন্ত যেন এখানে উঠাইয়া আনিয়াছে। ভিন্ন দেশের সংস্পর্শে তাহাদের স্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। আসল কথা, ইংরাজেরা যেরূপ দুর্গম্য এমন কোন জাতিই নহে—নূতন অবস্থার সহিত আপনাদিগকে উপযোগী করিয়া লইতে উহারা নিতান্ত অক্ষম। আপনাদের যে ছাঁচ, যে ব্যক্তিগত ভাব তাহা কিছুতেই তাহারা ছাড়িতে পারে না। ইহা হইতেই তাহাদের এত নৈতিক বল। কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় সংস্কার থাকাতেই তাহাদের ইচ্ছায় এত বল, কিন্তু আবার এই কারণেই তাহাদের সহানুভূতি ও বুদ্ধির বিকাশ সীমাবদ্ধ। ইহারা এদে-শীয় লোকদিগকে একেবারেই বুঝে না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করে না। নিজ সভ্যতার উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এদে-

শীয় লোকদিগকে অর্দ্ধ-অসভ্য 'পৌত্তলিক' বলিয়া নিরীক্ষণ করে। এই 'পৌত্তলিক' শব্দটি কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি পার্সী সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে উহারা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ... ... এদেশীয় লোকের মধ্যে উহারা কেবল কুলি কিম্বা খানসামার মূর্ত্তিই দেখিতে পায়—উহারা মনে করে এদেশীয় লোকেরা মোট বহিতে, জুতা সাফ করিবার পক্ষেই ভাল। দেশের সম্বন্ধেও উহাদের এই ভাব। উহারা এই দেশকেও কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান—কৃষিক্ষেত্ররূপেই দর্শন করে।"

কলিকাতা দেখিয়া তাঁহার প্রথম সংস্কার কিরূপ হইয়াছিল তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—"কলিকাতায় তিনদিন। লোকের জনতায় হতবুদ্ধি ও গ্রীষ্মের তাপে প্রপীড়িত হইয়া কিছুই দেখি নাই। কেবল একটা সাদা রং-এর অনুভব মনের উপর ভাসিতেছিল। আলো সাদা, বাড়িসকল সাদা, সাদা কাপড়-পরা লোকের স্রোত রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। .....দোকান, আফিস, ব্যাঙ্ক, গাড়ি-ঘোড়া, দেয়ালেমারা বিজ্ঞাপনের সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় যেন হলবর্ণে, লণ্ডন কিম্বা প্যারিসনগরের এক্স্‌চেঞ্জের নিকটে আছি। প্রভেদ এই, বড় বড় কাল কোর্ত্তা-পরা, নলাকার টুপিপরা য়ুরোপীয়ের বদলে সাদা ধুতি-পরা, ক্ষুদ্র, শীর্ণ, সুকুমার স্ত্রীসুলভ মুখশ্রীসম্পন্ন বাঙ্গালীদিগের কলরব। ইহারা সিংহলবাসীদিগের মত অলস ও নিদ্রালু নহে, পরন্তু কর্ম্ম-শীল, চটুল, দ্রুতগামী ও জীবন-উদ্যমে পরিপূর্ণ। পেন্‌সিল-বিক্রেতার 'হকার' হইতে ফিটেনে ঠেয়ান-দেওয়া স্থূলদেহ বাবু পর্য্যন্ত সবাই অর্থের চেষ্টায় ফিরিতেছে। দেখিয়া বেশ অনুভব হয়, কলিকাতা নগর একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান—পৃথিবীর একটি মহা বিপণি।

আসিয়া ও লণ্ডনের এই সংমিশ্রন বড়ই অদ্ভুত। এক এক সময়ে মনে হয় যেন লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে হাইড্ পার্কের নিকটে আছি। সেইরকম বড় বড় সোজা রাস্তা, সেইরকম উত্তুঙ্গ প্রাসাদ, সেইরকম গ্রীসীয় স্তম্ভযুক্ত গাড়িবারাণ্ডা, সেইরকম বিস্তৃত পদচারণ-পথ, সেইরকম রেল-ঘেরা চৌকোণা নগরাঙ্গন—রাস্তার কোণে কোণে প্রতিষ্ঠিত সেইরকম ইংরাজি প্রস্তরমূর্ত্তি।"

গ্রন্থকার এক স্থানে ইংরাজের সহিত হিন্দুর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন:—"ইংরাজেরা এরূপ দুর্ণম্য ও কঠিন যে, বিশ কোটি হিন্দুদিগের মধ্যে হারাইয়া গিয়াও উহাদের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; পক্ষান্তরে হিন্দুরা লক্ষ ইংরাজের সংস্পর্শেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার দেশীয় লোকেরা ইংরাজিতে গ্রন্থ লিখিতেছে, সংবাদপত্র চালাইতেছে দেখিলাম; শুধু যে তাহাদের ইংরাজি চমৎকার তাহা নহে—তাহাতে ইংরাজি ধরণ-ধারণ ভাব-ভক্তি, ইংরাজি ধরণের ভাবনা, ইংরাজি ধরণের অনুভব সমস্তই বজায় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হয় যেন লণ্ডনের কোন উৎকৃষ্ট সমালোচনী পত্রিকার সম্পাদক কোন পাদ্রির লেখনী হইতে নিঃসৃত। এরূপ কতকগুলি ছাঁচ-গ্রাহী আর্টিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিজত্বসম্পন্ন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত কিছুকাল কথা কহিয়াই, তাহার ধরণ-ধারণ হাব-ভাব কথার অবিকল নকল তুলিতে পারে। কারলাইল ইঙ্গ-স্যাক্সন জাতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—উহারা 'পাষাণ-গঠিত জাতি'। পাষাণ-গঠিত জাতিই বটে; হিন্দুর কর্দ্দম-ছাঁচে স্বকীয় পাষাণ-মূর্ত্তির ছাপ বসাইয়া উহারা নিজে অবিকৃত রহিয়াছে অথচ আপনাদিগের প্রত্যেক খোঁচ-খাঁচ সেই হিন্দুর সুনম্য ছাঁচে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।"

ভারতবর্ষের কতিপয় প্রধান নগরের স্বরূপ-লক্ষণ গ্রন্থকার কেমন বেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কলিকাতা ইংরাজের ভারতবর্ষ; বারাণসী ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ; আগ্রা মোগলদিগের ভারতবর্ষ, আর জয়পুর রাজাদিগের ভারতবর্ষ—উপন্যাসের ভারতবর্ষ।"

ইলোরা-গুহায় মহাদেবের মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন;—"সংহার-শক্তি ও সৃজন-শক্তি ব্রাহ্মণদিগের মতে একই শক্তির বিভিন্ন আকারমাত্র; তাঁহাদের সংহারের ও সৃজনের দেবতা পৃথক্ নহে, একই। ইহাই ব্রাহ্মণদের মহা নূতনত্ব। অন্যান্য জাতি মনুষ্যভাবে দেবতাকে দেখিতে গিয়া—ভালমন্দ, সুন্দর কুৎসিত এইরূপ বিভিন্ন পৃথক পৃথক্ আপেক্ষিক লক্ষণে আপনাদিগের দেবতাদিগকে লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা অসীমের দিক দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট দেবও নাই দানবও নাই পরন্তু এক নিরপেক্ষ অসীম শক্তি বর্ত্তমান—তিনিই সৃজন করেন, তিনিই সংহার করেন—তিনি একমাত্র 'তৎসৎ'। আরও যথাযথ রূপে বলিতে গেলে, হিন্দুদিগের নিকট মৃত্যু একটি পরিবর্ত্তন মাত্র;—যে পরিবর্ত্তনের সমগ্র শ্রেণীপরম্পরাই জীবন। তাঁহারা যাহা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানও তাহাই বলে। জীবন-বিশিষ্ট জীব-বিশেষ এক একটি আকারমাত্র—উপাদান-পুঞ্জীকরণের বিভিন্ন প্রণালী মাত্র। আমাদের দেহের কোষাণু লইয়াই আমাদের সমগ্র দেহ—সেই কোষাণু-সমূহ ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছে—তাহাতেই আমরা জীবিত আছি।.....সমস্ত জগৎ মহাসাগরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাতে অসংখ্য তর-

স্রের হিল্লোল বহিতেছে; এই প্রত্যেক তরঙ্গ যাহা উঠিতেছে ও পড়িতেছে উহা এক একটি জীবনস্বরূপ, যাহার আরম্ভ ও শেষ আমরা দেখিতে পাই। তরঙ্গসকল যেমন ফেণোচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অমনি এক দুর্দ্দম্য শক্তি আসিয়া উহাদিগকে পুনর্ব্বার আলোকের দিকে ঊর্দ্ধে উঠাইতেছে। কিন্তু কে না দেখিতে পায়, এই নৃত্যশীল তরঙ্গসকল এক একটি আকার মাত্র, কারণ, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদের উপাদান ভিন্ন হইয়া যাইতেছে—তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক আর কিছুই নহে—তাহাদের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় সাধারণ শক্তি আছে তাহাই কেবল বাস্তবিক—তাহাই সমস্ত সাগরকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। কোন জীববিশেষ এই মহাশক্তির ক্ষণিক বিকাশমাত্র। সে জীব পরিবর্ত্তিত হউক, বিকৃত হউক, মৃত্যুমুখে পতিত হউক—সেই শক্তির তাহাতে কিছুমাত্র আইসে যায় না। সেই একই শিবশক্তি যাহা জগতের আদিম নৈহারিক অবস্থায় কাজ করিয়াছিল তাহা আজও সূর্য্যে গ্রহনক্ষত্রে বিকাশিত হইয়া আমাদের ভূলোকে মহাদেশরূপে, সমুদ্ররূপে, পর্ব্বতরূপে, জীবরূপে, মনুষ্যরূপে, সমাজরূপে, নগররূপে বিকীর্ণ হইতেছে। সেই একই শিবশক্তি, দৃশ্যমান গতিকে আণবিক গতিতে পরিণত করিয়া কালসহকারে গ্রহের উপর গ্রহের পতন সংঘটন করিয়া, পরিণামে আপনার সেই অনির্দ্দেশ্য আদিম শক্তিতে ফিরিয়া যাইতেছে—যাহা হইতে সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্র, সমুদ্র, মহাদেশ, উদ্ভিজ্জ, সমস্ত জীবপুঞ্জ পুনর্ব্বার নিঃসৃত হইতে পারে। কে বলিতে পারে, এক সৌরজগৎ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে আর এক সৌরজগতের উপর পড়িয়া কালে সমস্ত সৃষ্টিই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। হিন্দুর প্রজ্ঞা-চক্ষু এই সম্ভাবনীয় নিয়মের একটু আভাস

পাইয়াছে—কারণ, তাঁহারা বলেন, কত অসংখ্য যুগে ব্রহ্মার এক-দিন হয়। সেই কালের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হইয়া, বিকশিত হইয়া, জীব সৃষ্টি করিয়া, সচেতন হইয়া, পুনর্ব্বার আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়া নির্গুণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই শক্তির রূপক হিন্দুরা আর কিরূপে কল্পনা করিতে পারে—তাই তাহারা শিবকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রলয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করে।"

গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাশ্রয়ী ও সর্ব্বসহিষ্ণু উদারভাব ও উহার গঠনপ্রণালী ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি এক স্থানে এইরূপ বলেনঃ—"কলিকাতায় একজন ইংরাজ আমার নিকট আক্ষেপ করিতেছিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে তেমন সফলতা হইতেছে না।..... ব্রাহ্মণেরা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কৌতূহলসহকারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের কথা শ্রবণ করে। উহাদের ধর্ম্ম এরূপ বহুভাবাত্মক ও বহুমতাত্মক যে উহাকে একটি পদার্থ মনে করিয়া ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। ইংরাজ মিশনরিরা মুসলমানদিগকে ধর্ম্মের তর্কে যেরূপ পরাস্ত করিতে পারে বলিয়া অভিমান করে হিন্দুদিগকে সেরূপ পরাস্ত করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় প্রচারকেরা যতই কেন প্রতিবন্ধক আনয়ন করুন না, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের গতিরোধ হওয়া দূরে থাক্, হিন্দুধর্ম্মের জীবনীশক্তি ও উপযোগিনী শক্তি এত বলবতী যে, সেইসকল প্রতিবন্ধককে অনায়াসে আত্মসাৎ ও পরিপাক করিয়া সে আপনার কায়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাঁহারা তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে খৃষ্টকেও প্রবিষ্ট করাইতে পারেন যদি খৃষ্টানেরা এই কথাটি মাত্র স্বীকার করেন যে, য়ুরোপীয়দিগের জন্য বিষ্ণু খৃষ্টের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইপ্রকারে, কলিকাতার আধুনিক ব্রাহ্মসম্প্রদায় স্বাধীন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকদিগের নৈতিক একেশ্বরবাদ

অবলম্বন করিয়াছেন। সৃষ্টি হইতে বিভিন্ন ঈশ্বরের অনন্ত অসীম ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, জগতের পিতৃবৎ শাসনপ্রণালী, আত্মা ও দেহের ভিন্নতা, পরকালের দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি সাধারণ দার্শনিক তত্ত্বসকল যাহা আজকাল ইংলণ্ডে প্রচলিত তাহা ঐ সম্প্রদায় আত্মস্থ করিয়াছে। পূর্ব্বকালেও হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া পরন্তু উহার সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের উপকরণগুলি আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র উহার সার রসটুকু লইয়া আপনার দেহ পরিপুষ্ট রাখিয়াছে। মাধুর্য্য, বিশ্বজনীন দয়াদাক্ষিণ্য, যাহা ইতরজীব পর্য্যন্ত প্রসারিত—সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা মনে হয় শাক্যসিংহের আত্মা এখনও ভারতভূমিতে বিরাজ করিতেছে। এইপ্রকারে ভারতের ধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে ও বৃদ্ধি লাভ করিতেছে—এই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা সুনম্য ও অবস্থানুগামী এবং ইহা এত জটিল, এত অসংলগ্ন ও পরিবর্ত্তনশীল উপকরণে গঠিত, উহার আকার গমনাভিমুখ, এত অনিশ্চিত যে উহাকে একটি ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় না। এক হিসাবে, উহাকে এক ধর্ম্ম বলিয়াও বলা যাইতে পারে, যেমন বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জলবায়ুবিশিষ্ট এই বিচিত্র ভৌগোলিক সমাবেশকে ভারতবর্ষ বলিতেছি কিম্বা এই বিচিত্র জাতির ও বর্ণের সম্মিলনকে আমরা হিন্দুজাতি বলিতেছি। এ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্যস্থল আছে। ভারতীয় ধর্ম্মের সূত্রস্থানে অদ্বৈতবাদ প্রথমে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়—তাহার পর ত্রিশ শতাব্দী কাল ধরিয়া, জিত, ও বিজেতাদের ধর্ম্মমত মিশ্রিত হইয়া গিয়া সেই অদ্বৈতবাদ একটু তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছে—আজিকার দিনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নৈতিক ও দার্শনিক মতের জাল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া এরূপ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে

যে, উহার শৃঙ্খল আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার। এইপ্রকার, ভারতের বিস্তীর্ণ কর্দ্দমময় গঙ্গানদীও বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর চির-প্রবাহী স্রোত ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়া রাশি রাশি উদ্ভিজ্জাবশেষের ভারে আক্রান্ত হইয়া বন, জঙ্গল, পুরাতন জনপদ, আধুনিক ইংরাজ নগর প্রভৃতির মধ্য দিয়া অনিশ্চিত গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে এবং বিস্তৃত ভূমি প্লাবিত করিয়া, উর্ব্বরা করিয়া, নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সাগরে মিলাইয়া গিয়াছে।" পাঠককে মূলগ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি—তাহাতে যে তিনি আমোদ ও উপদেশ একাধারে প্রাপ্ত হইবেন ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

প্রসঙ্গ-কথা।

(তিনখানি পত্র)।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অনারেব্‌ল্‌ জষ্টিস্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত "শিক্ষার হের-ফের" নামক প্রবন্ধের লেখক উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—প্রার্থনা করি তাঁহারা আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "পৌষমাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতিছত্রে

আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে তাঁহার "ক্ষীণস্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা "অসংখ্য বালক বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিম বাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কোন কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

গুরুদাস বাবু লিখিয়াছেন—"আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা (যথা, ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কএকজন সভ্য বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই (Calc. University minutes for 1891–92, pp. 56-58)। * * *

কি উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড় সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুইদিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে

রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভা সমিতির কার্য্য ও বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।"

আনন্দমোহন বাবু লিখিয়াছেন—"পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দর ভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয়সম্বন্ধীয়, ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।

এখন আলোচ্য প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্লিক্ ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে

আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, এই পরিবর্ত্তন সংসাধন পক্ষে আপনার সুন্দর প্রবন্ধটি বিশেষ সাহায্য করিবে এবং এই উদ্দেশে এই প্রবন্ধের বহুলরূপে প্রচার প্রার্থনীয়।"

উক্ত তিন পত্র হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ বাঙ্গালীর শিক্ষায় বাঙ্গলার কোন উপযোগিতা স্বীকার করেন না, এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য, আমাদের স্বদেশীয়েরা যে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু কিছু আশ্চর্য্যও আছে। আমরা কখনও কিছুতে আপত্তি করি নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি; দেশের উপর যখন যে কোন অমঙ্গলস্রোত আসিয়া পড়িয়াছে আমরা বিনা আপত্তিতে তাহার নিকট মস্তক নত করিয়া দিয়াছি; স্বদেশের কথা, ভবিষ্যতের কথা একমুহূর্ত্তের জন্য ভাবিও নাই। আজ আমরা ইংরাজের কল্যাণে যদি বা আপত্তি করিতে শিখিলাম, অভাগার অদৃষ্ট এমনি, অনেক সময় দেশের মঙ্গল প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বসি।

বোধ হয়, আপত্তি করিতেই একটা সুখ আছে। নতুবা, স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না একথা কে না বোঝে?

কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সহজ কথা না বুঝিলে তাহার মত কঠিন কথা আর নাই। কারণ, কঠিন কথা না বুঝিলে সহজ কথার সাহায্যে বুঝাইতে হয়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝিলে আর উপায় দেখা যায় না।

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরাজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরাজও যাইবে—কিন্তু ভাষা সেই বাঙ্গলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গলাই চলিবে; যাহা কিছু বাঙ্গলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরাজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশ্ব ঐ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বড় বড় সৌধবুদ্বুদের মত প্রতীয়মান হইবে।

ভালরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্বুদ বলিয়া বুঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোক-প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্পস্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোন মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃ-

ভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

এ সব কথা ইতিহাসে অনেকবার আলোচিত হইয়া গেছে, এবং অনেক ইংরাজ লেখকও এ কথা লিখিয়াছেন। জর্ম্মনীতে যত দিন না মাতৃভাষার আদর হইয়াছিল তত দিন তাহার যথার্থ আত্মাদর এবং আত্মোন্নতি হয় নাই। শিক্ষা-সভার যে সভ্যগণ মাতৃভাষার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন তাঁহারা এ সমস্ত উদাহরণ অবগত আছেন, সেইজন্যই কথাটা তাঁহাদের বুঝানো আরো কঠিন, কারণ, বুঝাইবার কিছু নাই।

আর একটা যুক্তি আছে। এতদিনকার ইংরাজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত মানসিক বিকাশ দেখা যায় না। তাঁহারা এমন একটা কিছু করেন নাই যাহাকে পৃথিবীর একটা নূতন উপার্জ্জন বলা যাইতে পারে, যাহাতে মনুষ্যজাতির একটা নূতন গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ ভাল ইংরাজি বলেন, কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করেন, কিন্তু ধাত্রীর অঞ্চল ছাড়িয়া কেহ এক পা হাঁটিতে পারেন না।

তাহার প্রধান কারণ, বিদেশী ভাষার ভার বড় গুরুতর। একজনের খোলষ আর একজনের স্কন্ধে চাপাইলে সে কখনই তাহা লইয়া বেশ স্বাধীন সহজভাবে চলিতে পারে না। আমাদের ভাবকে বিদেশী ভাষার বোঝা কাঁধে লইয়া চলিতে হয়,

প্রতিপদে পদস্খলনের ভয়ে তাহাকে বড় সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, কোন মতে মান বাঁচাইয়া বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু ততটুকু করাই এত কঠিন যে, সেইটুকু সুসম্পন্ন করিলেই পরম একটা গৌরব অনুভব করা যায়—সেটাকে খুব একটা মহৎ ফললাভ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্য দেশে একটা বড় কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল তাহা যে কিছুই নহে এ কথা লোককে বোঝানো বড় শক্ত। এইজন্য মুখুয্যের ছেলেকে গড়গড় শব্দে ইংরাজি বক্তৃতা করিতে শুনিলে বাঁড়ুয্যের ছেলেকেও সেই চূড়ান্ত গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার বাপের প্রবৃত্তি হয় না। তখন যদি তাহাকে বুঝাইতে বসা যায় যে, বার্ক্, ব্রাইট্, গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের ভাষার সহিত প্রচুর পরিমাণে পানা পুকুরের জল মিশাইয়া একটি বঙ্গশাবক যে বহুকষ্টে অথবা অল্পায়াসে গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর কথা বলিয়া গেল উহাতে কোন কাজই হইল না, উহা না আমাদের দেশের অন্তঃকরণে স্থায়ী হইল, না বিলাতী সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল—কেবল নিষ্ফল শিলাবৃষ্টির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী চট্‌পট্ শব্দের করতালি আকর্ষণ করিয়া শস্যবীজহীন পথকর্দ্দমের সহিত মিশাইয়া গেল; উহা অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টারও সহস্রগুণ সফলতা আছে; তবে এ সব কথা বাঁড়ুয্যের কর্ণে স্থান লাভ করে না; মুখুয্যের ছেলের ইংরাজি ফাঁকা আওয়াজের কাছে স্বদেশের সমস্ত দাবী তাহার নিকট এতই ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়!

বুঝাইবার পক্ষে আর একটা বড় বাধা আছে। অনেকে এমন কথা মনে করেন, আমরাও ত আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি—কই, আমাদের মানসিক ঔৎকর্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে ত কখন তিলমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না। বুঝিতে পড়িতে কহিতে বলিতে আমরা ত বড় কম নহি।

সে কথা অস্বীকার করিয়া কাজ নাই। তাঁহাদিগকে বলা যাক্ আপনারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। কিন্তু আরও ঢের বেশী হইতে পারিতেন। এখনি যদি আপিসের কাজ সুশৃঙ্খলমত নির্ব্বাহ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেছেন, বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম করিতে না হইলে না জানি কি হইতেন এবং কি করিতেন! তাঁহাদিগকে আরো বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। আপনারা যে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আপনাদেরই বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, শিক্ষাপ্রণালীর নহে। কিন্তু দেশের সকলেই ত আপনাদের মত হইতে পারে না!

শিক্ষায় স্বদেশী ভাষা অবলম্বন করিলে কেন যে মনের বিশেষ উন্নতি হয় সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান সভ্যজাতিরা দেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করে তাহারা প্রথম হইতেই ধারণা করিবার, চিন্তা করিবার অবসর পায়। আরম্ভ হইতেই তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে। কেবল যে কতকগুলা মুখস্থ জ্ঞান অর্জ্জন হয় তাহা নহে, মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

এক জন এণ্ট্রেন্স-ক্লাসের ছোকরা কতটুকুই বা বুঝিতে পারে

কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে। সে দশ বারো বৎসর কাল খেলাধূলো ভুলিয়া প্রাণপণ করিয়া অতি যৎসামান্য ইংরাজি শিখে, তাহাতে তাহার মানসিক দৈন্য কিছুই দূর হয় না। নিজে কিছু বুঝিয়া উঠা, কিছু ভাবিয়া বলা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কারণ, সকলি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কথার মানে দেখিতে দেখিতে, "কী" মুখস্থ করিতে করিতে হতভাগ্য হয়রান্ হইয়া গিয়াছে; এপর্য্যন্ত মনের মধ্যে একটি ভাব রীতিমত ধারণা করিবার অবকাশ তাহার হয় নাই।

কেবল তাহাই নহে। যেমন আহার করিয়া বলসঞ্চয়পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া পুনশ্চ তাহা কিয়দংশ ব্যয় না করিলে ক্ষুধা হয় না, পরিপাক হয় না, সে আহার সম্যক্‌রূপ কাজে লাগে না— তেমনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে, আলোচনা করিতে না পারিলে সে শিক্ষা অপরিপক্ক অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মনের সহিত মেশে না। য়ুরোপে ছাত্রেরা যেটুকু যখন শেখে সেটুকু তখনি প্রকাশ করিতে পারে। লেখায় না হোক্, কথায়। কিন্তু আমরা বহুকাল পর্য্যন্ত মূক। বলিবার কোন বিষয়ও পাই না, বলিবার একটা ভাষাও নাই। কথার মানে বুঝিতে এত কাল লাগে যে, ভাব বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়, কেবল ভাষা রচনা করিতে এতদিন কাটিয়া যায় যে, ভাব প্রকাশ করিতে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়।

কোন কোন ইংরাজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া, কলার কাঁদি

পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না। ঢেঁকির কাষ্ঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা নাড়িয়া সুচারুরূপে ধান ভানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলে না। এজন্য অন্য যে খুসি আক্ষেপ করুক, কিন্তু যে ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জ্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে সে কেন বিস্মিত হয়? মানুষের মনকে যদি মনরূপে বাড়িতে দিতে তবেইত মধ্যে মধ্যে ওরিজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত, কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া কেবল শেখা-কথা আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি, জর্ম্মণি যখন ফরাসী শিখিত, তখন কি সে ফরাসী ভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল? জর্ম্মণ-রচিত কোন্ ফরাসী গ্রন্থ ফরাসী সাহিত্যে স্থায়ী সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে? ফ্রেঞ্চ এবং জর্ম্মণদের ভাষা, ভাব, দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্ম্মকর্ম্মের যতটা ঐক্য আছে আমাদের সহিত ইংরাজের কি তাহার শতাংশ আছে? আমরা সেই ইংরাজি শিখিয়া সেই ইংরাজি ভাষায় ইংরাজ অধ্যাপকের নিকট ওরিজিন্যালিটি দেখাইব? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারিনা বলিয়া ধিক্কার দাও কেন?

সে যাই হোক্, কথাটা সত্য যে, আমাদের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির স্ফূর্ত্তি হয় না—এবং তাহার প্রধান কারণ সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই।

অবশ্য, ওরিজিন্যালিটি না থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়, কারণ

উহা বাড়ার ভাগ মাত্র। কিন্তু একটা কাজ সমাধা করিতে ঠিক যতটা শক্তির আবশ্যক তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হাতে রাখিতেই হয়। দুইশ জনকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলে ন্যূনপক্ষে আড়াইশ জনের মত আয়োজন করিতে হয়। সমাজের সকল বিভাগে যখন এই বাড়্‌তি ভাগ, এই ওরিজিন্যালিটি, এই প্রতিভা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায়, সমাজের সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব ওরিজিন্যালিটি সমাজের সচ্ছলতা ও জীবনীশক্তির একটা লক্ষণ।

পরন্তু আমাদের শিক্ষায় আমাদের অত্যাবশ্যকটুকুই ভাল করিয়া চলেনা ওরিজিন্যালিটির অভাবই তাহার প্রধান প্রমাণ। যেখানে বড়লোক আছে সেখানে ছোট কাজ রীতিমত চলিতেছে। যতক্ষণ অপর্য্যাপ্ত না হয় ততক্ষণ সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না।

দেশী ভাষায় যদি আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম তবে সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইত। আমরা তাহার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ সঞ্চরণ করিতে পারিতাম, তাহার মধ্যে বাস করিতে পারিতাম এবং ক্রীড়া করিতেও পারিতাম। তাহার মধ্যে কাজও পাইতাম অবকাশও পাইতাম, সেও আমাকে গঠন করিত আমিও তাহাকে গঠন করিতাম। শিক্ষা এবং মনের মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক চলাচল থাকিত।

এখন কথা হইতে পারে বাঙ্গালায় এত বই কোথায়? তবে সেই কথাই হোক্। বাঙ্গালায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা

তরা যাক্। সিণ্ডিকেট-সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন তবে দরিদ্র বাঙ্গালী একাজে এখনি নিযুক্ত হয়। ম্যাক্‌মিলান্ সাহেবকে অনেককাল অন্ন যোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিলে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় ত তর্জ্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হোক্, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।

কিন্তু বোধ করি প্রধান আপত্তি এই যে,শিশুকাল হইতে সমস্ত শিক্ষা ইংরাজি ভাষায় নির্ব্বাহ না হইলে বাঙ্গালীর ছেলে ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে পারিবে না।

চোর মনে করে যত অধিক পরিমাণে লইব তত শীঘ্র শীঘ্র চুরি শেষ হইবে। থলির মুখ সঙ্কীর্ণ; তাহার মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়; বহুলোভে দুই মুঠা ভরিয়া যখন হাত বাহির করিতে চায় তখন হাত বাহির হয় না, অবশেষে মুঠা হইতে অধিকাংশ চৌর্য্য সামগ্রী যখন পড়িয়া যায় তখন হাত বাহির হইয়া আসে।

আমাদের শিক্ষা-থলির প্রবেশপথও বড় সঙ্কীর্ণ, কারণ, সে থলি বিদেশী ভাষা। তাহার মধ্যে দুই মুঠা ভরিয়া আমরা লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন হাত টানিয়া লই তাহাতে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? বোঝা ভারি করা সহজ, বহন করাই শক্ত।

সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম। শিক্ষার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করাই শিক্ষার একটি প্রধান বাধা, সেই ছাঁচটি একবার গড়িয়া লইতে পারিলে অনেক কঠিন শিক্ষা সহজ হইয়া আসে। ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কি অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়! কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অ্যাবষ্ট্রাক্ট শব্দগুলি ছেলেদের পক্ষে কত কঠিন সকলেই জানেন; উপর্য্যুপরি সহজ উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণ দুই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে? তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম, অবশেষে একবার ব্যাকরণজ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষা শিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

অতএব, শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও পরীক্ষ

মনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্পসময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

বাল্যকাল হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক্ কিন্তু বাঙ্গলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাঙ্গলা শিক্ষা ইংরাজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাঙ্গালায় শিখাইয়া ইংরাজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরাজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়। বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।

সকলেই জানেন আজকাল আমাদের ছাত্রেরা যে পরিমাণে অনেক বিষয় শেখে সেই পরিমাণে ইংরাজি অল্প শেখে। তাহার প্রধান কারণ, আগাগোড়া মুখস্থ করিতে গিয়া ইংরাজি বুঝিবার এবং রচনা করিবার সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাঙ্গলায় পাইতাম তবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরাজি ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।

বঙ্কিম বাবুর ক্ষীণস্বর যাঁহাদের শ্রুতিগম্য হয় নাই, আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না, হইলেও কোন ফলের প্রত্যাশা করি না। কিন্তু যে পাঠকগণ অনুগ্রহ অথবা অনুরাগবশতঃ আমাদের বাঙ্গলা কাগজ পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ ভরসা রাখি। তাঁহারা যদি দেশের মঙ্গলের

জন্য কথাটা [illegible] করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন, এবং ঘরে ঘরে আপন আপন সন্তানকে মাতৃস্তন্যের ন্যায় মাতৃভাষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে কালক্রমে দেশের যে শ্রী ও উন্নতি হইবে সভাসমিতিতে সহস্র বৎসর ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াও সেরূপ হইবে না। কেবল ভয় হয় এই জন্য যে, বাঙ্গালী স্থায়ী গৌরব অপেক্ষা ক্ষণিক অহঙ্কার-তৃপ্তি অধিক ভালবাসে, ভবিষ্যৎ কার্য্যসিদ্ধির অপেক্ষা উপস্থিত করতালির জন্য অধিক লালায়িত এবং দেশের বৃহৎ কল্যাণ অপেক্ষা আশু ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভন গুরুতর; তাহা ছাড়া মুখে যেমনই গর্ব্ব করি, আত্মশক্তি, আত্মভাষা এবং কোন আপনার জিনিষের প্রতিই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস নাই; মনে স্থির করিয়া বসিয়া আছি যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সমস্ত উন্নতি সাধন করিয়া দিবে, আমরা কেবল দরখাস্ত করিব, ইংরাজিভাষা-তেই আমাদের সমস্ত জাতীয় শিক্ষা সাধন করিবে, আমরা কেবল অভিধান ধরিয়া মুখস্থ করিয়া গেলেই হইবে।

"সাহিত্য"-পাঠকদের প্রতি।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে "হিং টিং ছট্" নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথ বাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় "সাহিত্য" পত্রের কোন লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবাদ "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই,

তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে, সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

এতৎ প্রসঙ্গে এইস্থলে জানাইতেছি, যে, চন্দ্রনাথ বাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে, নিতান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান না করিলে ও তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের একটি বৃহৎসম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোন প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথ বাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধনা।

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র।

ভূগর্ভের নিম্নস্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পূর্ব্বতন যুগের কঙ্কালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ রহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান আক্রমণের বন্যা এত দূর-প্রান্ত অবধি আসিয়া প্রায় পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীর হইতে মুসলমান সেনাকে দুই চারিবার এমন বিফল-মনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড়-বন-জঙ্গলসমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র তাহার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং প্রাচীন কীর্ত্তিও দু'একটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মস্‌জিদের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই।

সেইজন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা

করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্ব্বতী, বিণায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন সূর্য্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী; নদীতীরে, গিরিশিখরে, সাগরবেলায়, যেখানে প্রকৃতি দেবী আপন সৌন্দর্য্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সেইখানেই নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন-স্তম্ভ, নয় প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।

ভারতবর্ষের বহুদূরপ্রান্ত হইতে বহুসহস্র যাত্রী—বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়—এই সকল প্রাচীন মন্দিরের দ্বারে আসিয়া নিত্য পুণ্য অর্জ্জন করিয়া যায়। বৈতরণী পার হইয়াই তাহারা মনে মনে যেন কোন্ পুণ্যলোকে উপনীত হয়—এখানে ব্রাহ্মণ নাই শূদ্র নাই, উচ্চ নাই নীচ নাই, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র গর্ব্ব এ রাজ্যের নহে।

সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার অবধি প্রসারিত। পথ বাহিয়া চিরন্তন মানবপ্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।

বালুহন্তা হইতে অদূরে দেখা যায়, বিজন ধাউলির পাহাড়ের শিরোদেশে প্রাচীন দেবমন্দিরের শ্যাম মুকুট। দেবতাহীন ব্রাহ্মণহীন মন্দিরে যাত্রী আর কেহ যায় না। পুরাতত্ত্বান্বেষী শুধু এই গিরিপাদমূলে দাঁড়াইয়া রাজা অশোকের পালি অনুশাসন পাঠ করিয়া আসেন, এবং প্রাচীনা দয়া নদী নিভৃত কল্লোলে

সেই পুরাতন দিনের কাহিনী কহিয়া যায়—যখন এই একাদশ অনুশাসন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত জনসমাজে জীবে অহিংসা এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিত।

আরও কিছুদূর গিয়া প্রাচীন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভুবনেশ্বর—আম্রকাননের মধ্য হইতে সমুচ্চ চূড়া উঠিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈব মতের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ভুবনেশ্বর তাহারই সাক্ষীস্বরূপে দাঁড়াইয়া। কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজা ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ-প্রদেশে ভুবনেশ্বরের দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নব রস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাসকলা পাষাণে চির-মুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন; এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতিদিবসকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীর দল খণ্ডগিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

আরও যোজনপথ অতিক্রম করিলে, সত্যবাদীতে বসিয়া নিরীহ সাক্ষীগোপাল পুরুষোত্তমযাত্রীর সংখ্যা গণিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। জগন্নাথদেবের প্রাপ্য অংশ হইতে তিনিও যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন।

পুরীর পথপার্শ্বে দূরে নি
সারা পথ জুড়িয়া পাণ্ডার
করিয়া ফিরিতেছে এবং দূর
আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া
যাত্রীরও অন্ত নাই। শকটে
পথ দিয়া শত পশ্চিম-কুলর
স্নেহদৃষ্টি পথক্লিষ্ট পথিকজনে
দেয়।

পুরুষোত্তমে আসিয়া এই
বহুদিনের বহুযত্নপোষিত আ
অন্ধকার মধ্যে ক্ষীণ দীপালে
ও ভ্রাতা বলরামের সহিত সি
পঁহুছে না, সংসার রুদ্ধদ্বার;
আবেদন, নিরাশহৃদয়ের ব
দেবতার সিংহাসনতলে নি
নিবেদন করেন, দেবতা প্র
বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণে চণ্ড
উচ্চনীচ-ভেদ ঘুচাইয়া দেয়
রিত করে।

এই জগন্নাথের মাহাত্ম্য
শুধু ব্রাহ্মণের দেবতা নহেন,
অধিকার। তিনি বিষ্ণুর অ
সক; তাঁহার দুয়ারে দাঁড়া
জাতিভেদময় ভারতবর্ষে জ
আর কোথাও দেখা যায় না।

আসিয়া নাণকী, কবীরী, প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী নানা মতের নানা মুনি সেই একই জগন্নাথদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়েন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দেবতা অবধি জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্থানলাভ করিয়াছেন এবং সেই বিমলা দেবীর দেবভোগ সম্বন্ধেও ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই।

জগন্নাথের মাহাত্ম্যের কারণ ইহাই বটে। ইহার মধ্যে যে সর্ব্বগ্রাসী সামঞ্জস্যশক্তি আছে তাহাতেই সকল সম্প্রদায় এখানে আসিয়া মিলিত হয়। জগন্নাথ বৈষ্ণব বলিয়াই সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁহার মন্দিরে অনেক তন্ত্রাচারের বৈষ্ণবীকরণ হইয়াছে শুনা যায়। এবং ঘষা-জল ও মাসকলাই ভোগের ব্যবস্থা নাকি তান্ত্রিক কারণসলিল ও আমিষাশেরই বৈষ্ণব বিধান।

জগন্নাথদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা একবাক্যে জগন্নাথদেবের পরকে আপন করিবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কেমন দ্বিধাশূন্য মনে তিনি সুভদ্রা ও বলরামকে লইয়া বৌদ্ধ সংঘ-ধর্ম্ম-বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়, চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও বুদ্ধের দন্ত রথারোহণে মন্দির হইতে বাটিকান্তরে গিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহন করিয়া আসিত; জগন্নাথ অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাকে বুদ্ধের দন্তমর্য্যাদার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তিনি সাধারণের দেবতা—এবং উড়িষ্যার জনসাধারণের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জয় পরাজয়ে, পলায়নে প্রত্যাগমনে, সকলের সহিত তিনিও চিরদিন আপন গুরু দেব-অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। লোকরঞ্জনার্থে ভিন্ন মতের বিধি বিধান দুই চারিটা আত্মসাৎ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কিসের?

কিন্তু শুধু জগন্নাথ বলিয়া নহে—উৎকলভূখণ্ডের সর্ব্বত্র মত-বিরোধের মধ্যে একটা নির্ব্বিবাদ ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়। বৈষ্ণবের পক্ষে শিবের মন্দির নির্ম্মাণ উড়িষ্যায় একটা মহা পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণ্য। অথচ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে বৈষ্ণবে শৈবে অনেক সময় মুখ-দেখাদেখি নাই। কাশীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে অনেক ধনী বৈষ্ণব নৌকার সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দেন পাছে দৈবক্রমে বিশ্বেশ্বরের মহিমা নেত্রপথে পতিত হয়, এবং রাধাকৃষ্ণের নামমাত্র কর্ণগোচর হইলে অনেক ভক্ত শৈব আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন!

উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে শৈব দেবতা, শিবের মন্দিরে বৈষ্ণব নৃসিংহ। ভুবনেশ্বরে দোলযাত্রা সম্পাদিত হয়—তাহার প্রধান অনুষ্ঠান হরিহর-মূর্ত্তির দোলন। জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে শিবের পাণ্ডারা শ্রীকৃষ্ণের পূজাও করিয়া থাকে, এবং ভুবনেশ্বর শিব আপন মন্দিরে বিষ্ণু-অবতারের পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন না। কিম্বদন্তী শুনা যায় যে, বিষ্ণুর আদেশানুসারেই শিব ভুবনেশ্বরে বাস করেন; এবং এই কিম্বদন্তী স্মরণ রাখিয়া ভুবনেশ্বর-যাত্রীরা বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া প্রথমেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুদেবকে প্রণাম করিয়া আসে।

দেবতায় দেবতায় এইরূপ সদ্ভাব থাকায় বিভিন্ন মন্দিরের বিচিত্র অনুষ্ঠানসকলের মধ্যেও আদানপ্রদান চলে। প্রাবর্ণোৎসবে ভুবনেশ্বর গ্রীষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শীতবস্ত্র পরিধান করেন; পুরুষোত্তমে ইহারই অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দেহে শীতবস্ত্র উঠে; ভুবনেশ্বরের পুষ্যাযাত্রা, জগন্নাথদেবের অভিষেক; ভুবনেশ্বরে শয়ন-চতুর্দ্দশী, জগন্নাথে শয়ন-একাদশী; ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথ উভয়েরই সেই চন্দন-যাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি,

ভৈমী-একাদশী এবং গুণ্ডিচাশ্রম গমন ও মন্দিরে প্রত্যাগমন বিধি।

কণারকের সূর্য্যমন্দিরেও এই রথযাত্রার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কপিল-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অর্কক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রথযাত্রা দর্শন করিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ হয়। আরও, এখানে সকল দেবতার উপাসনাবিধি আছে এবং যে ব্যক্তি যে লোকে যাইতে চায় তাহারও বাধা নাই—কেবল দিন-ক্ষণ দেখিয়া দেবতাবিশেষকে ডাকিলেই হইল। অমুক দিন মহোদধিতে স্নান করিয়া যে রামেশ্বরকে পূজা করে, রামচন্দ্র তাহার অভীষ্টসাধনে সহায়তা করেন; মহেশ্বরের চরণে ভক্তিপূর্ব্বক নৈবেদ্য নিবেদন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়; বিখ্যাত অর্কবটমূলে বসিয়া যে ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি সদ্য প্রসন্ন হয়েন।

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে, এই অর্কক্ষেত্রে বিষ্ণুর পদ্ম পড়িয়াছিল; সেইজন্য ইহার আর এক নাম পদ্মক্ষেত্র। পুরাণ-রচয়িতা উড়িষ্যার চারিক্ষেত্রে বিষ্ণুর চারিটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন:—কণারকে পদ্ম, পুরীতে শঙ্খ, ভুবনেশ্বরে চক্র এবং যাজপুরে গদা। বিষ্ণুদেব গয়াসুরকে বধ করিয়া গয়ায় স্বীয় পদচিহ্ন এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আপন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রাখিয়া যান। তন্মধ্যে চক্রক্ষেত্র ও গদাক্ষেত্র হরপার্ব্বতীর গুলাকা। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও গোল উঠে নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের একটু বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল এবং হয়ত তাহারই ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। এক হইতে

পারে, বৌদ্ধ মতের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিয়া এক হইয়াছিল; আর এক হইতে পারে, সকল সম্প্রদায়ই যেখানে যতটুকু আবশ্যক বোধ করিয়াছে বৌদ্ধ মত ও অনুষ্ঠান হরণ করিয়া লইয়া আপন আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, এবং এইরূপে স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সংযত হইয়া আসিয়াছে।

যেমন করিয়াই হউক্, হয় বৌদ্ধধর্ম্মের ব্রাহ্মণীকরণে, নয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বৌদ্ধীকরণে, কিম্বা উভয়েরই সংযোগে, উড়িষ্যার যে হিন্দুধর্ম্ম একটা নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং পদ্মার প্লাবনে যেমন সমস্ত আল ভাঙ্গিয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমীর সীমানা মিশাইয়া যায়, এই ধর্ম্মবিপ্লবে সেইরূপ উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এলাকার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া গিয়া একসা হইয়া গিয়াছে—কতটুকু কাহার অধিকার নির্ণয় করা সুকঠিন।

মন্দিরে মন্দিরে পাষাণে খোদিত সহস্র আধা-মঙ্গোলীয় ছাঁচের বৌদ্ধ মূর্ত্তি। কোন কোন স্থলে হিন্দু দেবদেবীও যেন বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই হইয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। জগন্নাথের মূর্ত্তি, চক্র, রথযাত্রা, জাতিভেদবিহীনতা যখন বৌদ্ধ প্রভাবেরই অবশেষ, তখন মন্দিরের স্থাপত্যে কিম্বা ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? যোগাসীন শিব যখন বৌদ্ধ রথযাত্রা-উৎসবে বিচলিত হইয়া গুণ্ডিচাশ্রমে অবস্থিতির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য বৌদ্ধ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে ইহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শুষ্ক নীতিধর্ম্মের মধ্য হইতে এমন বিলাসকলা স্ফূর্ত্তি পাইল কিরূপে? উড়িষ্যার মন্দিরে যে সমস্ত চিত্র খোদিত হইয়াছে তাহা বিলাসভাবময় ত বটেই, এবং অনেকস্থলে বিলাস শ্লীলতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপন নগ্ন শৃঙ্গার-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

বৌদ্ধ স্থাপত্যে এই বিলাসপরায়ণতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই যাহা চোখে পড়ে তাহা এই যে, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন তাহার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়া চতুর্দ্দিকের পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং গ্রীকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় কল্পনাকে পাষাণে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষাও সম্ভবতঃ তখন সমধিক উদ্দীপিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, ভুবনেশ্বরের দেয়ালে কতকগুলি উন্নত-স্তনা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালা বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি য়ুরোপীয় যে, গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তির সন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণমধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়রযন্ত্রহস্তা নারীমূর্ত্তি দেখা যায় তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ!

ভারতবর্ষে যে তখন গ্রীকদিগের গতিবিধি ছিল তাহার স্বপক্ষে বিস্তর প্রমাণ আছে। রাজা অশোকের পালি প্রস্তর-লিপিতে গ্রীক অন্তিয়োকসের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় গ্রীকেরা অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নূতন ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার করিতেও বাহির হইয়াছিলেন ইতিহাসে এরূপ

বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং একদিকে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকী কল্পনা এবং অন্যদিকে গ্রীক সৌন্দর্য্যচর্চ্চা মিলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে যে তাহার শুষ্ক নীতি-সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে সাধারণের মনোরম করিয়া তুলিয়াছে ইহাতে সংশয়ের বিশেষ কিছুই নাই। এবং এইরূপে সাধারণের মনে মুদ্রিত হইয়াই যে তাহা কালক্রমে রূপান্তরিত আকারে সর্ব্বশরণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ইহাও নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না।

এমনি করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতে পরিপুষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে আবার পরিপুষ্ট করিয়াছে। আপনাকে সর্ব্বসাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পৌরাণিকতার সহায়তা গ্রহণ তাহার আবশ্যক হইয়াছিল, আবার আপনি যখন দেশান্তরিত হইল প্রাচীন পৌরাণিকতাকে আরও পৌরাণিক করিয়া দিয়া গেল। এখন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন কোন্ অবধি ব্রাহ্মণ্য এবং কোন্ অবধি বৌদ্ধ সীমা।

হিন্দুধর্ম্ম এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও ইহার গঠনকার্য্য শেষ হয় নাই। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে যেন ইহার আদিম অনুষ্ঠান হইতে চরম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত গায়ে গায়ে মিশিয়া পুঁটুলি পাকাইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া যেন কতকটা বুঝা যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, কর্ম্মফল, জ্ঞানমোক্ষ, ভক্তিমুক্তি, দর্শন এবং কাব্য চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া কেমন করিয়া মিশিয়াছে, এবং বুদ্ধি যাহার মধ্য দিয়া বাঁধা পথ বাহির করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে, আমাদের নিরক্ষর সাধারণের হৃদয়ে সেইসকল বিরোধী মতের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

সম্পাদক।

আমার স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম। তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভাল লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লাভ করিতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে একথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে এক দিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্ত্তব্য এটা আমি বেশী চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা তাহার কর্ত্তব্য এইটে সে বেশী অনুভব করিয়াছিল আমি ঠিক বুঝিতে পারিনা; কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্ম্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভাল; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মত এত বড় পুতুল সে ইতিপূর্ব্বে কখনো পায়

নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড় আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃষ্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়? মেয়েকে ত সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কি দশা হইবে?

উপার্জ্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোন কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভাল। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভাল বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারিনা। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম। প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, নাইতে যাবে না?" আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিসনে!" বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন্ সে অভিমান-বিস্ফারিত

হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই। দাসীকে ভাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক স্পর্শ করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে কোন কোন নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাদিগকে জাহান্নম নামক অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি। কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না; এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার এক-খানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম।

দিনকতক এম্‌নি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্ব্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মুচ্‌লেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী খুনী লাঠিয়ালদের

স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল, পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি। এই সময়টা ছিলাম ভাল। বেশ মোটা-সোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহির-গ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্ম্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম আর সমস্ত আহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা কুটির মত বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড় আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এম্‌নি উৎসাহের সহিত অরি-মিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এইজন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত। কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশতঃ এম্‌নি মজা করিয়া এত কূট-কৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্ম্মটা কি।

তাহার ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয় নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর প্রকাশ করেন না। সভাস্থলেও আমার কোন সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোন সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভাল সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিৎ কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হৌক, ভাষার বাহাদুরী আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশ জনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মত ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িত চিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতে-

ছিলাম। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলি ভাবিতেছি কি উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেইরকম ভাবের একটা মুখের মত জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না।

এমন সময় সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম, এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল "বাবা!", কোন উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায়

শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মত পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ্ দপ্ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ, পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

ধান্য।

(কৃষিকথা।)

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চাউল—বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। এজন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে ধান্যচাষের বিষয় লিখিব। ধান্যের আবাদ অতিশয় কঠিন এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ, এই শস্য উৎপন্ন

করিতে অনেক সময় লাগে। প্রায় বারো মাস ইহার চাষের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

প্রথমতঃ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে জমীসকল উত্তমরূপে চষিতে হয়। চাষারা বলে "চাষেই শাঁস", অর্থাৎ চাষ যত গভীর হইবে, জমীর মৃত্তিকায় যত বেশী ফাঁপ হইবে, ফসল ততই বেশী উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। চাষ সম্বন্ধে চাষাদিগের যে উপদেশ-বাক্য আছে,তাহা স্মরণ রাখার উপযুক্ত। তাহারা বলে—"শত চাষে 'তুলা', তার অর্দ্ধেক 'মূলা,' তার অর্দ্ধেক 'ধান,' বিনা চাষে 'পাণ'।" এই বচন দ্বারা যে কোনও ফসলের কোনও নির্দ্দিষ্ট বার চাষ দিতে হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। কোন্ ফসলে কত অধিক চাষ দিতে হয় ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যাইতেছে। সচরাচর ধান্যের জমী চারি পাঁচ বার চষিলেই বীজ বপন বা রোপণের উপযুক্ত হয়। এই কার্য্য পূর্ব্ব সনের মাঘ ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া পর সনের জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে সমাপ্ত করিতে পারিলেই ভাল হয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে জমী চষিতে পারিলে বিশেষ উপকার লাভ হইয়া থাকে,—চষা অবস্থায় জমীর অভ্যন্তরে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপ প্রবেশ করে। ঐ বায়ু ও উত্তাপ যত অধিক কাল প্রবেশ করে, জমীর উর্ব্বরাশক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। মাঘ মাসে জমী চষিতে পারিলে আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাস উহার অভ্যন্তরে বায়ু ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে। এইজন্য চাষারা বলে, "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে জমী চষিলে আর একটি উপকার হইয়া থাকে। এই সময়ে জমী চষিয়া দিলে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্তিকার সমুদয় ঘাসের গোড়া জলিয়া যায়, তাহাতে বর্ষাকালে জমীসকল পরিষ্কার হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে।

সকল ফসলের পক্ষেই ঘাস অতিশয় আপদ। বিশেষ ধানের জমীর ঘাস নষ্ট না হইলে কিছুমাত্র ফসল পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু কেবল জমী চষিলেই বেশী ফসল উৎপন্ন হয় না। চষিবার পূর্ব্বে জমীতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে হয়। বর্ষার পূর্ব্বে এই কার্য্য শেষ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশের কৃষকেরা ধান্যের জমীতে দুই প্রকারের সার দিয়া থাকে; এক পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক, দ্বিতীয়, গোহাল পরিষ্কার করিয়া যে সকল গোবর ও খড়ের অংশ একত্রে স্তূপাকারে রক্ষিত হয় তাহা। এই সার যথেষ্ট পরিমাণে জমীতে দেওয়া না হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় না। অনেক চাষা ইহা দেয় না বলিয়াই অল্প ফসল পাইয়া ক্ষুণ্ণ থাকে, আর অদৃষ্ট, দেবতা প্রভৃতির উপর দোষারোপ করে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, গোবর ধান্যের জমীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। চাষারা যে ইহা না জানে তাহা নহে। কিন্তু অনেক স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে গোবরের ঘুলি প্রস্তুত করিয়া উহার অভাব পূর্ণ করে। এই সকল লোকদিগের পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া গোবর সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। পাথুরিয়া কয়লার মূল্য অধিক নহে, আর অল্পতেই রন্ধন হয়। পল্লীগ্রামে ইহার ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। রেড়ির খইল গোবরের তুল্য সার। কিন্তু উহার মূল্য অধিক বলিয়া চাষারা ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাহারা ইহা বুঝে না যে, চোক কান বুজিয়া কিনিয়া এই সার জমীতে দিলে, যায় সুদ টাকাটা উঠিয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে ভেড়াওয়ালারা যে সকল ভেড়া কলিকাতায় লইয়া আসে, ঐ সকল ভেড়া রাত্রিকালে জমীতে রাখিলে উহাদের মল-

মূত্রের দ্বারা জমীর উর্ব্বরাশক্তি খুব বৃদ্ধি পায়। গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে কৃষি সম্বন্ধীয় যে বার্ষিক রিপোর্ট বাহির হয়, তৎপাঠে জানা যায় যে, অস্থিচূর্ণও ধান্যের জমীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সার পুষ্করিণীর পাঁক। কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জমীতে দিলে উত্তম ধান্য হইয়া থাকে। ইহা বিনা মূল্যে সহজে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালী দিন দিন এরূপ অলস হইয়া পড়িতেছে যে, এই সুলভ দ্রব্যও তাহারা জমীতে দিয়া জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পক্ষে উপযুক্ত চেষ্টা করে না। সাধে কি ঘরে ভাত থাকে না!

ধান্য কয়েক শ্রেণীর আছে; তন্মধ্যে "আশু" "আমন" "বোরো" ও "জলী" এই কয়টি প্রধান। আশু ধান্য আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা;—"ঝাঁটি"(ঝটি=শীঘ্র) ও"নেয়ালি"(নয়ালি=নূতন)। আমন ধান্যও কয়েক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে এই কয় শ্রেণী প্রধান; "নবানে" বা "নবান্নে", সাধারণ আমন ও "কনকচূর"। নবানে দুই প্রকারের। এক প্রকারের নবানে ধান্য কার্ত্তিক মাসে পাকে; উহাকে কার্ত্তিক শাল বলে,অপর প্রকারের নবানে অগ্রহায়ণ মাসে পাকে, ইহাকে সচরাচর নবানেই বলে। এই সকল ধান্যের নানা নাম আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম আমরা এই স্থলে লিখিলাম। আশু ধান্যের এই কয়টি নাম প্রচলিত আছে যথা;— "চাঁপাকুশি" "দুধকটকি" "কেলে" "ফাঁকড়ি" "লেবুরস" "সূর্য্যমণি" "আগুনমান" "মোল" ইত্যাদি। আমন ধান্যের মধ্যে মোটা ধান্যের এই কয়টি নাম প্রচলিত—"লোণা" "বনবোঁটা" "লতামূল" (সাদা ও লাল) "দুধকলমা" "কাঁটিকলমা" "কালি-কলমা" "জটাকলমা" "ডহন নাগরা" "বাঁশনাগরা" "রামশাল" "বিশাল" "ভবানীশাল" "ঝিঙ্গেশাল" "খেজুরকান্দী" "ময়ুর-

পাখা" "লক্ষ্মীবিলাস"। "খেজুরকান্দী" ধান ঠিক খেজুরের কান্দীর মত। "ময়ূরপাখা" ধান্যের দুইটি আগরা পাখারূপে বিরাজ করে, মধ্যে ধান থাকে। নবানে ধান সাধারণ আমন ধান অপেক্ষা সরু। নবানে ধান্যের মধ্যে এই কয়টি নাম প্রসিদ্ধ যথা;—"দাদখানি" "বেণাফুল" "গোপালভোগ" "লঘু" "পদ্মকিশোর" "ভাসামাণিক"। ইহা ছাড়া এক শ্রেণীর খাটি সরু আছে ইহার অনেক নাম। তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান, "বাঁশমতি" "আমীরভোগ" "কুমেদ" "শাহ আলম" "বালাম" "ধয়ের মউরি" "ঘিরসাপাতি" "রাঁধুনিপাগল" ইত্যাদি।

যেরূপ আমন ধান্যের আবাদ, আশু ধান্যের আবাদও তদ্রূপ। আমরা আমন ধান্যের কিরূপে আবাদ করিতে হয় তাহা বিস্তারিতরূপে বলিব। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, ধান্য দুইপ্রকারে আবাদ হয়; এক বপন দ্বারা, দ্বিতীয় রোপণ দ্বারা। অগ্রে বপনের কথা বলি।

সচরাচর বৈশাখের শেষে আশু ধান্য ও জ্যৈষ্ঠের শেষে আমন ধান্যের বীজ বপন, অর্থাৎ চষা জমীতে ছড়াইয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ধান্যের চারাসকল পরিপুষ্টি লাভ করে। আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে বর্ষা আরম্ভ হইলে জমীসকল জলপূর্ণ হয়, তখন এই সকল বোনা জমী লাঙ্গল দিয়া চষিয়া দিতে হয়। এই কার্য্যকে বর্দ্ধমান জেলায় কাড়াইয়া দেওয়া কহে। দুইবার এইরূপ কাড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবার নহে; একবার চষার অন্ততঃ পনের দিন পরে দ্বিতীয় বার চষিতে হয়। এই কার্য্য বর্ষার প্রথমে উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ চারাগাছগুলি একটু বড় হইলেই, সম্পন্ন করা আবশ্যক, নতুবা বোনা জমীর ধান ভাল হয় না।

প্রত্যেক বার চষার পর মই দ্বারা জমীটা সমান করিয়া দিতে হয়। বোনা জমী চষার প্রয়োজন এই যে, ধান গাছের গোড়াগুলি উপড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয় এবং অতিশয় ঘন চারাগুলিকে ফাঁক ফাঁক করিয়া দিতে হয়। মই দ্বারা আবার সেই সকল উপড়ান গাছগুলি পুনরায় বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন উহারা বর্দ্ধিততেজে ঝাড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে একটি একটি করিয়া ঘাস নিড়াইয়া অর্থাৎ উপড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যিনি এই কার্য্যে অবহেলা করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় ঠকিতে হয়।

আষাঢ় মাসের প্রথমেই সকল বৎসর বর্ষা আরম্ভ হয় না। কোন বার প্রথমে, কোন বার মাঝামাঝি সময়ে, কখনও বা শেষে বর্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। যে বৎসর আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে বর্ষা আরম্ভ হয়, সে বৎসর চাষাদের আনন্দের সীমা থাকে না। বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে চাষারা অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে নিয়ত আকাশের দিকে তাকাইয়া কালযাপন করে। উদ্বিগ্ন হইবার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু "মন্‌সুন" নামক বায়ুর বৃত্তান্ত বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত থাকিলে তাহাদিগকে অত উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই বায়ু পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে বহিতে থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দুই তিন দিন ঐ কোণ হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিলে, নিশ্চয় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সময়ে পশ্চিম দিকে মেঘ করিলে, বা জোরে পশ্চিম দিক হইতে বায়ু বহিলেও প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সময়ে পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু বহিলে ধান্য আবাদের আশা খুব কম জানিতে হইবে। কারণ, ওরূপ হইলে অতি অল্প পরিমাণেই বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে ভালরূপ চাষ করিতে পারা যায় না।

এই সময়ে পূর্ব্বদিকের বায়ু যে চাষের পক্ষে ইষ্টকর নহে, চাষারাও তাহা জ্ঞাত আছে, তাই তাহারা বলে—"আষাঢ় শ্রাবণ পূবে বায়, হাল ছেড়ে বাণিজ্যে যায়।" তেমনি আবার ভাদ্র আশ্বিন মাসে পূর্ব্বদিকের বাতাস না থাকিলে প্রচুর বৃষ্টি হয় না। তাহাতেই চাষারা বলে, "ভাদ্র আশ্বিন পূবে বা, গাছের আগায় মাছের ছা।" বর্ষাকালে ঈশান কোণের বায়ুও বৃষ্টি আনয়ন করে, সেই জন্য চাষারা বলে—"যদি বহে ঈশানে, লাঙ্গল কাঁধে নাচে কৃষাণে", অথবা "যদি বহে ঈশ্নে, ঘারে চেলা দিস্‌নে।" অর্থাৎ জমীর আল বাঁধিতে হইবে না, কেন না, প্রচুর বৃষ্টি হইবে, তাহাতে নিয়ত ভূমি-ভরা জল থাকিবে। ফলতঃ বাঙ্গালা দেশে দুই প্রকারের "মন্‌সুন্‌" বায়ু বহিয়া থাকে, একটির নাম "বেঙ্গল করেণ্ট", অপরের নাম "বোম্বাই করেণ্ট।" আরব্য উপসাগর হইতে বহিয়া আসিয়া যে বায়ু আমাদের দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক হইতে বহে, তাহাকে "বোম্বাই করেণ্ট" বলে। ইহার দ্বারা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টি আনীত হয়। আর যে বায়ু বঙ্গোপসাগর হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব বা পূর্ব্বদিক হইতে বহে, তাহাকে "বেঙ্গল করেণ্ট" বলে। তাহা ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে প্রচুর জল আনয়ন করে। এই সকল কথা ভাল করিয়া জানা থাকিলে চাষ সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিতে পারা যায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ষা আরম্ভ না হইলে ধান্য রোপণ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না। কিন্তু বর্ষার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্য বপনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে বীজ বপন করিয়া রাখিতে হয়। বর্দ্ধমান জেলায় এককাটা ভূমিতে পাকী চারি সের বীজ ছড়াইয়া রাখে। ঐ সকল বীজধান্য বড় হইলে উহাদের

চারাগুলি উপড়াইয়া অন্য জমীতে রোপণ করিতে হয়। যে জমীতে ঐরূপ বীজ বপন করা হয়, তাহাকে "বীজতলা" বলে। যিনি ভাল করিয়া চাষ করিতে চাহেন, তিনি যেন বীজতলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বৎসর বৎসর বীজতলায় খুব বেশী পরিমাণে গোবর, চোণা বা অন্য কোনপ্রকারের সার দেওয়া আবশ্যক এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ঐ সকল ভূমিখণ্ড উত্তমরূপ চষিয়া ঘাসশূন্য করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই উত্তম বীজ জন্মিবে। বীজ যত উত্তম হইবে, শস্য ততই ভাল হইবে। বরং ক্ষেত অনুর্ব্বর হইলেও চলে, কিন্তু বীজতলা অনুর্ব্বর হইলে চলে না।

"জল লাগিলে", অর্থাৎ বর্ষা আরম্ভ হইলে, যে সকল ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিতে হইবে ঐ সকল ক্ষেত্র উত্তমরূপ চষিতে হয়। এক একখানি জমী দুই তিন বার চষিয়া অন্ততঃ তিন দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। সেই সময় মধ্যে ঘাসগুলা পচিয়া যায় ও মাটিটা পচিয়া উঠে, তখন আর দুইটা চাষ দিয়া মই দ্বারা ঘাঁটিয়া কাদা করিতে হয়। এই সময়ে জমীতে বেশী জল রাখিতে নাই, ভূমি-ভরা জল থাকিলে চষা ভাল হয় না। কারণ, কোন্ স্থান চষা হইল, কোন্ স্থান হইল না, বেশী জল থাকিলে তাহা লক্ষ্য করা সুকঠিন। জমী কাদা করা হইলে বীজতলা হইতে বীজ উপড়াইয়া আনিয়া ঐ স্থানে রোপণ করিতে হয়। বীজ রোপণের এক সপ্তাহ পরে উহা শ্যামল মূর্ত্তি ধারণ করে এবং একমাস মধ্যে ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। তখন বায়ুহিল্লোলে মৃদুমন্দ দুলিয়া কৃষকের মনপ্রাণ শীতল করে।

প্রায় বোনা জমীর সঙ্গে সঙ্গেই রোয়া জমী নিড়াইয়া দিতে হয়। এই কার্য্য অতিশয় কষ্টকর ও ইহাতে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার

আবশ্যক। সকল কৃষকে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। কেবল ঘাস উপড়াইয়া দিলেই যদি নিড়ান শেষ হইত, তাহা হইলে তত গোল ছিল না। একপ্রকার ধানের গাছ আছে, তাহাকে "ঝোড়া" বলে, নিড়াইবার সময় এইসকল ঝোড়া ধানও উপড়াইয়া ফেলিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে ক্ষেত্র হইতে ধান্যসকল বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় কতকগুলি ধান পড়িয়া থাকে, সেইসকল ধান সহজে বিনষ্ট হয় না। এক বৎসর পরে যখন আবার জমী চষিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া হয়, তখন ঐ সকল ধান্য জল পাইয়া অঙ্কুরিত হয় এবং নূতন বপনকরা ধান্যের চারার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া অবশেষে চাষাকে বিষম ঠকাইয়া থাকে। রোয়া জমীতে প্রায় ঝোড়া থাকিতে পায় না, যদি থাকে আর কৃষক অবহেলা করিয়া তাহা নষ্ট না করে, তবে পরিণামে তাহাকে পরিতাপ করিতে হয়। এই ধানগাছ প্রকৃত ধানের গাছের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত বেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শস্য ধারণ করে। কিন্তু সে শস্য কৃষকের ভোগে লাগে না। যেমন পাকে অমনি ঝরিয়া পড়ে। এই জন্য ইহার নাম "ঝোড়া" বা "ঝড়া"। এই ঝোড়া অতিশয় ভ্রম-উৎপাদক, প্রায়ই আসল ধান ও ঝোড়া চেনা যায় না। চিনিতে পারিলেও অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে একটি একটি করিয়া উপড়াইয়া ফেলিতে হয়। অনেকে মায়া করিয়া, কেহ বা তাচ্ছল্য করিয়া উপড়ায় না। কেহ বা যাহা আসল ধান তাহা ঝোড়া মনে করিয়া উপড়াইয়া ফেলে, আর ঝোড়াকে ধান মনে করিয়া রাখিয়া দেয়। সকল অবস্থাতেই লোকসান অনিবার্য্য। ঝোড়া চিনিবার সহজ উপায় কিছু নাই। তবে কোন কোন ধান্যের অগ্রভাগে একটা কাল দাগ থাকে, ঝোড়ায়

ঐরূপ দাগ থাকে না। একখণ্ড জমীর মধ্যে ক্ষীণ নির্জ্জীব ধানের ভিতর যে ঝাড়টা খুব তেজাল দেখিবে, নিশ্চয় জানিবে সেটা ঝোড়া। ইহা অবশ্য সাধারণ নিয়ম নহে। ঝোড়ার আকৃতি সাধারণ ধান্য অপেক্ষা বিভিন্ন। অভিজ্ঞতা দ্বারা ঐ বিভিন্নতা লক্ষিত হইতে পারে।

ভদ্রলোকের ছেলেরা যেন এই নিড়ান বা ঘাস-তোলা কার্য্যে বেতনভোগী কৃষাণদিগকে বিশ্বাস না করেন। ঘাস তোলা অতিশয় কষ্টকর ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং কৃষাণেরা প্রায়ই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে চাষারা বলে, "বামুন বৈদ্যের চাষ, ভিতে তক্‌তক্ মাঝে ঘাস।" অর্থাৎ ভদ্র লোকেরা প্রায়ই আসিয়া জমীর ভিতায়, অর্থাৎ কিনারায়, ঘাস আছে কি না, জমীখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিয়া থাকেন। মধ্যে ঘাস আছে কি না, তাহা জমীতে নামিয়া দেখেন না; সুতরাং মাঝের ঘাস দুষ্টবুদ্ধি অলস মুনিষেরা তোলে না। তাহাতে বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে। যাঁহার অবস্থা ভাল, তিনি যেন অপর লোক দ্বারা জমীর মধ্যস্থল পরীক্ষা করান। আর যাঁহার সেরূপ অবস্থা নহে, তাঁহার স্বয়ং জমীতে নামিয়া দেখাই উচিত।

ঘাস নানা প্রকার আছে; তন্মধ্যে এই কয়টি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—"চেঁচড়া" "পাতি" "শ্যামা" "মলঞ্চা" "দূর্ব্বা" "বাবুই" "শ্যামনা" "কেঁচুড়ে"। সকল ঘাসের মধ্যে চেঁচড়া, পাতি ও বাবুই অতিশয় কঠিন গোড়াবিশিষ্ট ও অনিষ্টকর, সহজে উহাদিগকে উপড়ান যায় না। সেইজন্য পরিশ্রমকাতর মুনিষেরা এই সকল ঘাসের মাথা ছিঁড়িয়া ভূমি পরিষ্কার করে; কিন্তু যে দিন ইহারা ঐরূপ নিড়াইয়া

যায়, তাহার পর দিনই আবার ঐ সকল ঘাস বাড়িয়া উঠে। সুতরাং যাহাতে গোড়া উপড়ান হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ক্ষেত্র নিড়ান হইয়া গেলেই প্রায় প্রধান পাট শেষ হইয়া গেল। ইহার পর রোয়া জমীতে আর কোন পাট নাই। কিন্তু বোনা জমীতে আর একটি পাট বাকী থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় তাহাকে "গাছান" কহে। পূর্ব্বে যে "কাড়ান," অর্থাৎ বোনা জমী লাঙ্গল দিয়া চষার কথা বলিয়াছি, ঐ কার্য্য করিবার সময় কোন কোন স্থান অতিরিক্ত ফাঁক হইয়া যায়। বিশেষতঃ বীজ বপনের সময় সমান ভাবে ক্ষেত্রের সকল স্থানে বীজ পতিত হয় না, তজ্জন্য কোন কোন স্থান ফাঁক থাকিয়া যায়। সেই সকল ফাঁক এক্ষণে ক্ষেত্রের অপর স্থান হইতে কোদালে করিয়া ধান্যের ঝাড় কাটিয়া আনিয়া বুজাইয়া দিতে হয়, এই কার্য্যের নাম "গাছান" অর্থাৎ গাছ দিয়া সাজান।

নিড়ান, গাছান প্রভৃতি শেষ করিতে করিতে ভাদ্র মাস শেষ হইয়া যায়। এই ভাদ্র মাসে সচরাচর জমীতে খইল ও গোবর দিতে হয়। তৎপূর্ব্বে দিতে পারিলে ক্ষতি নাই কিন্তু প্রায়ই সময়াভাবে দেওয়া ঘটে না। বিশেষ এই সময়ে কোন্ জমীতে ভাল ফসল হইবে, আর কোন্ জমীতে হইবে না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহা বুঝিবার একটি সহজ উপায় আছে। যে ক্ষেত্রে নামিবা মাত্র তাহার জল ঘোলা হইয়া কাল বর্ণ ধারণ করে এবং মৃত্তিকায় পা বসিয়া যায়, জানিতে হইবে উহার মৃত্তিকা খুব পচিয়াছে, উহাতে নিশ্চয়ই ভাল ফসল হইবে, আর যে ক্ষেত্রের জলের রঙ স্বচ্ছ থাকে এবং যার মৃত্তিকায় পা বসে না, তাহাতে উত্তম ফসলের আশা নাই—অবিলম্বে তাহাতে

হয় গোবর, না হয় রেড়ির খইল, ছড়াইয়া দিবে। গোবর অপেক্ষাও রেড়ির খইলে শীঘ্র ফল হইয়া থাকে।

এক্ষণে কি পরিমাণে গোবর বা খইল জমীতে দিতে হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। প্রত্যেক বিঘা জমীতে রেড়ির খইল দুই মন অভাবে এক মন দিলেই বেশ ভাল ফসল হয়। আর গোবর প্রত্যেক বিঘায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ ঝুড়ী দিলেই যথেষ্ট। বর্দ্ধমান সহরে গবর্ণমেণ্টের যে কৃষিবিভাগ আছে, উহার রিপোর্টে সার দেওয়া সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ও আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা করিলাম। এই স্থলে আমরা অপরাপর সারের পরিমাণও উল্লেখ করিতেছি। খড়কুটা গোবরের কুচি প্রভৃতি গোহালের আবর্জ্জনা দ্বারা যে সার প্রস্তুত হয়, সেই সার প্রত্যেক বিঘায় পাঁচ গাড়ি (গোরুর গাড়ি) করিয়া দেওয়া উচিত এবং পাঁক মাটি প্রত্যেক বিঘায় দশ গাড়ি করিয়া দিতে হয়। মোট কথা জমীখণ্ডের প্রত্যেক স্থানে কিছু কিছু সার পড়া আবশ্যক।

যেমন একটি ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে, তাহাকে নানা-প্রকার রোগের হস্ত হইতে সময়ে সময়ে মুক্ত করিতে হয়, সেইরূপ এই ধানগাছগুলিকে পালন করিতে হইলে, ইহাদের রোগের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেননা, মানুষের ন্যায় সকল জীবিত পদার্থই সময়ে সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ধানের অনেক রোগ আছে, ভাদ্র মাসেই প্রায় সেই রোগগুলি দেখা যায়। যদি তুমি দেখিতে পাও যে, তোমার ক্ষেত্রের সবুজ বর্ণের ধানগাছগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিতেছে, তাহা হইলে জানিবে যে, ধানে লোণা ধরিয়াছে। অচিরাৎ তাহার প্রতিকার না করিলে কিছুই শস্য জন্মিবে না। দুই উপায়ে লোণা নষ্ট

হয়—এক জমীর জল কাটিয়া দিয়া জমীকে শুষ্ক করা; অপর, লোণা স্থানে খানিকটা ক্ষারী লবণ ছড়াইয়া দেওয়া। সেচা জমী ভিন্ন অপর জমীর জল কাটিয়া দিতে নাই। কারণ, ভাদ্র মাসে প্রায়ই খুব কম বৃষ্টি হইয়া থাকে, একবার ভূমি শুখাইয়া গেলে শীঘ্র যদি বৃষ্টি না হয় লোকসান অনিবার্য্য। লবণ ছিটাইয়া দিলে অতি অল্পদিন মধ্যেই ধানগাছের রঙ পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্ব্বার গাছসকল সতেজে পরিবর্দ্ধিত হয়। "ধ্বসা" ধানের একটি রোগ। এই রোগ হইলে একপ্রকার শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র কীটে গাছগুলি কাটিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেইজন্যই বোধ হয়, এই রোগের নাম ধ্বসা বা ধ্বংসা। অতিরিক্ত বাদল হইলেই কোন কোন জমীতে এই রোগ দেখা দেয়। জমীর জল কাটিয়া দিয়া জমীকে খুব রৌদ্র খাওয়াইতে পারিলে পোকাগুলা মরিয়া যায়। কিন্তু বর্ষার অবস্থা বুঝিয়া জল কাটা আবশ্যক। শেওলা একটা প্রধান রোগ। যে জমীতে শেওলা জন্মে, তাহার ধান ঝাড় বাঁধিতে পারে না। শেওলা জন্মিবামাত্র জল কাটিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আকন্দ গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল জমীতে ফেলিয়া দিলেও ধ্বসা এবং শেওলা নিবারিত হয়। জমীতে "গোঁড়া" জন্মিলেও ধান হয় না। ইহা একপ্রকার ঘাস, ইহা একবার জন্মিলে আর সহজে বিনষ্ট হয় না। এবং প্রায়ই যে স্থানে জন্মে সে স্থানের ধানগাছ নষ্ট করিয়া ফেলে। জন্মিবামাত্র এই ঘাস উপড়াইয়া দিতে হয়, তাহাতেও একবারে সব যায় না। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগ আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু, যেরূপ একজন বলিষ্ঠ-দেহ ব্যক্তির সহজে কোন পীড়া হয় না, হইলেও তাহাকে সহজে কাবু করিতে পারে না, সেইরূপ কোন উর্ব্বরা-শক্তিবিশিষ্ট জমীতে কোন রোগ জন্মিলেও সহজে তাহার ধান-

গাছের কে
তেজেই সব
যাহাতে বৃ
যদি ক
চাষের সমু
বৃহৎ বৃহৎ
সার্থক হই
আনন্দে স্ব
গায়ে দিয়া
আনন্দে সে
কিন্তু,
মাস মধ্যে
বিভ্রাট।
মাথায় হাত
সেচার যন্ত্র
অসেচা জ
সকল দাঁড়
স্ত্রীপুরুষের
যায় না।
করিয়া দি
"পোড়া
যিনি একা
কোন গান
"ছোট-মা
মেঘে পান

যিনি যত সতর্ক, যিনি যেরূপ অধ্যবসায়ী ও উদ্যোগী এই সময়ে তিনি সেইরূপ গুণের পরিচয় দিয়া থাকেন—অপরে এক বিঘা জমী সেচিয়া লইতে না লইতে, তিনি তিন বিঘা সেচিয়া লন। জমী শুখাইতেছে, ফাটিতেছে, তিনি কিন্তু সহজে হটিবার পাত্র নহেন। নদী হইতে বহুকষ্টে বহুপরিশ্রমে বহুব্যয়ে জল তুলিয়া হয়ত তিনি অনেক জমী বাঁচাইলেন এবং অনেকের অপেক্ষা তিনি বেশী ফসল পাইলেন। ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, চাষ বল, আর চাকরীই বল, যত্ন ও অধ্যবসায় ভিন্ন কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যায় না।

আশ্বিন মাসের শেষেই ধান্যের থোড় হয়। এই সময়ে ক্ষেত্র যাহাতে জলপূর্ণ থাকে সে দিকে দৃষ্টি থাকা চাই, কারণ, এ সময়ে ধান অনেক জল শোষে। কার্ত্তিক মাসের ১৪ই। ১৫ই ধান্যের শীষসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে ঝড়ের বড় আশঙ্কা হইয়া থাকে। ঝড় হইলে ধানের ফুল ঝরিয়া যায়, তাহাতে আগরা জন্মিয়া থাকে। অল্প বাতাসে এই ফুল দুই তিন বার ঝরিলে তত আশঙ্কা নাই, কারণ,উহা অনেক বার জন্মে। ধান্যের সকল শীষে চাউল জন্মিয়া পাকিতে প্রায় এক মাস লাগে। সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসের ১৪ই।১৫ই মধ্যে প্রায় সকলপ্রকার আমন ধান্য পাকিয়া যায়। আশু ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে পাকে। কোন কোন জেলায় এই ধান্য আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে, কোন জেলায় ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকিয়া থাকে। কনকচূর সকল ধান অপেক্ষা বিলম্বে পাকে। এই ধান্য সাধারণ মোটা আমন ধান্য অপেক্ষা মূল্যবান। ইহার চাউলের ব্যবহার কম, ধানে উৎকৃষ্ট খই হয়, সেই জন্য ময়রাগণ আদর করিয়া কেনে।

সচরাচর অগ্রহায়ণ মাসের ১৭ই।১৮ই হইতে আমন ধান্য

কাটিতে আরম্ভ করিতে হয় এবং পৌষ মাসের ৮ই।১০ই মধ্যে এই কার্য্য শেষ করিয়া ফেলা আবশ্যক। পাকা ধান্য কাটিতে যতই বিলম্ব করিবে ততই লোকসান হইবে—ধান্যসকল ঝরিয়া পড়িবে। এই সময়ে কেবল বেতনভোগী কৃষাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে, অপর মুনিষ নিয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ধান্য কাটা হইলেই উহা বাটীতে সত্বর আনা আবশ্যক, মাঠে পড়িয়া থাকিলে, হয় ইন্দুর, না হয় পক্ষীতে, নষ্ট করিবে।

মাঘ মাস মধ্যে ধান্যগুলি ঝাড়াই করিয়া গোলা বা মড়াইয়ে রাখিবে—তখন তুমি এই ফসলসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলে। পরে প্রয়োজনমত চাউল তৈয়ার করাইয়া মহাতৃপ্তির সহিত অন্ন ভোজন করিয়া মহাসুখ বোধ করিবে। অশেষ যত্নচেষ্টালব্ধ এই চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিয়া তোমার যতটুকু আনন্দ বোধ হইবে, কেনা চাউলের অন্ন ভোজনে কখনই সেরূপ আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ হয় না।

যেরূপ আশু ও আমন ধান্যের চাষ, বোরো ও জলী ধান্যের চাষও প্রায় তদ্রূপ, একটু আধটু বা বিভিন্নতা আছে, তাহাতে বিস্তারিতরূপে লিখিবার কিছু নাই। সামান্য অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা শিক্ষা হইতে পারে।

স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে,
মন-ভৃঙ্গ আকুল লোভে, ধায় তাহারি পানে।

মরতে কি মরণে—কোথায় আছি জানিনে,
সুদূর মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে।

৩৬*

১	২	৩
র্সা -া মা -া।	ধপজ্ঞপা -ধনা -জ্ঞধপা -মগা।	
কি — স্থ —।	থা — — —।	
জ্ঞপা -জ্ঞপা -মা -জ্ঞপা।	মা -গা গা মা।	মা -ধা জ্ঞা -পা।
ও — — ই।	ম — দি র।	ন — য় —।
-গা -মা -রা সা।	-া সসা সা মা।	-মগা গা পা পা।
— — — নে।	— মন ভৃ ঙ্গ।	— আ কু ল।
জ্ঞা -া পা -া।	জ্ঞপা -ধনা -জ্ঞধা -পা।	র্সা না -ধা পধা।
লো — ভে —।	থা — — য়।	তা হা — রি।
ধনধা -পা -জ্ঞধা পা॥	পা ধা পা পা।	র্সা -না র্সা র্সা।
পা — — নে॥	ম য় ভে,	কি। স্ব — র. গে।
-া র্সা -র্মা -া।	র্রা -র্সা -া র্রা।	র্সা -া -া -া।
— ফো — —।	থা — য়,	আ। ছি — — —।
-র্সা -ধা -পা -া।	জ্ঞা -পা -ধা পা।	মা -া -গা -া।
— — — —।	আ — — নি।	নে — — —।

। -া গা মা -ধা। -ঋা পা -া মা। -া -গা সা -পা।
। — মৃ দু — । — ল — মো। — — হে —।

। মা রা -া সা। সা সা সা -মা। -া গা পা পা।
। র ঘো— র। লা গি ল —। — অ ব শ।

। ঋপা ঋপা ধনা -ঋধপা। র্সা নধা -পা -ধা।
। অ ল স —। প রা — —।

। -না -ধপা -ঋধা পা॥ ॥
। — — — ণে॥ ॥

গান্ধারী তোড়ী—মধ্যমান।

কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে।
মন্দ মন্দ মলয় বহে অন্ধ ফুল-গন্ধে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে, মুঞ্জরে কুঞ্জে চূত-মুঞ্জরী কি সুন্দর,
কোথা প্রিয়ে এ হেন বসন্তে।

৪ ৮ ৩

। লমা -মমা মা। -পদদা -পপদঞা পা। মঞ্জলা ব
। কোয়ে -লি য়া। — — মা তো।

২ ৩
। মা পা -া ঞদা। -দঞা পা -া দা। পদা -দপা পা দা।
। য়া রা — আন। — ন্দে — র। ম,ম -ম ম ম

। গা পা র্সা -া। পা মা -ঙ্গা মপা। মা -ঙ্গা -লসা -লা।
। ম ব হে —। অ ন্ধ — কূল। গ — — —।

। সা॥ ১ মমা ঞদা ঞা। র্সর্না র্সা র্স র্সনা।
। ন্ধে॥ ভ্রম রা শু। ঞ্জ রে, মু ঞ্জ।

। র্সর্সা -া র্সর্সা -র্সর্না। র্সা ঞর্সা ঞদা পপা।
। রে — কু —। ঞ্জে চূত মু ঞ্জরী।

। মঙ্গা -লা সা সা। র্সা র্না -র্সর্না র্সা।
। কি সু — ন্ধ র। কো থা -প্রি য়ে।

। ঞদা দপা মা দদপমা। ঙ্গলসা॥॥
। এ,হে ন ব ম। ন্তে॥॥

ব্যাখ্যা।

১। স্বরাক্ষরের উপর বিন্দু কম্পনের চিহ্ন। যথা, সা।

২। কোমল র=ল; কোমল গ=ঙ্গ; কড়ি ম=ন্ধ; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ঞ।

৩। লমা—মমা=লমাঃ মা।
কোয়ে -লি=কোয়ে লি।

৪। যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন।

৫। স্বরাক্ষরের নীচে কসি, মীড়ের চিহ্ন। যথা মা-ঙ্গা।

সমুদ্রের প্রতি।

(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া।)

হে আদিজননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্য বিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথারে,
কোথা তার তল, কোথা কূল! বল কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন তার সমুচ্ছল কলকথা,

তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি!—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে' এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি'
নির্দ্দয় আবেগে; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মত তারে বাঁধি'
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায়
পড়ে' থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিবন্ন নিশ্চল;—ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে' যায় তিমির-মন্দিরে; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি'-ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে' আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে

মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি'নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি'
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা ; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া ! দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদি জননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদয় হতেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে

আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে'।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মত!

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি'
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বল তারে "শান্তি! শান্তি!" বল তারে, "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা!"

"ভারতবর্ষে।"

(২)

ফরাসী পর্য্যটক আন্দ্রে শেভ্রিয়েঁ সিংহলদ্বীপ প্রথম যখন জাহাজ হইতে দেখিলেন তখন তাঁহার কিরূপ মনে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। "গত কল্য 'কোইট'-খেলা দুই বাজি হইল, তাহার মধ্যে একটি ছোট ইংরাজ বালিকা, মুখের রঙ ফ্যাকাসে ও স্বভাব একগুঁয়ে, কাপ্তেনের নিকট এই অঙ্গীকার করিল, যদি আজ সন্ধ্যার সময় আমরা কলম্বো নগরে পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে সে তাঁহাকে তাহার একটি মুচকি হাসি দান করিবে। পাঁচটার সময় পূর্ব্বদিকে কুয়াশার ন্যায় অস্পষ্ট কতকগুলা কাল দাগ দেখা গেল। ছয়টার সময় আকাশে বেগুণী রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ-রাশি; সেই মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশের নীচে নারিকেলবৃক্ষসমাচ্ছন্ন একটি নিম্নভূমি দেখা দিল। যতই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই উচ্চ, সরু বৃক্ষকাণ্ডসকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল। তাহারা একটু হেলিয়া সবেগে যেন আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে এবং তালজাতীয় বৃক্ষের রীত্যনুসারে শিরোদেশে শাখাপত্র বিস্তার করিয়াছে। মনে হয় যেন, একটি বিস্তৃত অরণ্য সাগর-গর্ভ হইতে হঠাৎ সমুত্থিত হইয়াছে। এখনও উপকূল এক ক্রোশ দূরে, এখনও মাটি দেখা যায় না—কেবলই ঘোর হরিৎ বর্ণ-রাশি; তীরভূমির নিকটে গিয়াও আর কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র বিষুবরেখাস্থিত প্রদেশ-সুলভ সেই উদ্দাম সরস উদ্ভিজ্জরাশি বর্ষা-সিঞ্চিত ভূমি

হইতে মস্তকে উত্থিত হইয়া মুক্তবায়ুর আলিঙ্গনে স্বকীয় হরিৎ করতল প্রসারিত করিয়াছে।"

সেখানকার "ওরিএন্টাল" নামক হোটেলে য়ুরোপীয় প্রভু ও দেশীয় ভৃত্যদিগের যেরূপ রকম-সকম গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "ওরিএন্টাল হোটেলের বাড়িটি প্রকাণ্ড ও বেশ সুখবাসযোগ্য। হোটেল-স্বামীর আদব্-কায়দা খুব দুরস্ত; ভৃত্যদের প্রতি তিনি অল্প কথায় আমাকে যথাস্থানে স্থাপিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন—তাঁহার সেই আজ্ঞা ভৃত্যেরা নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আমাকে একটি সৌধ-ধবল বড় কামরা দেখাইয়া দিল। বেশী আস্বাব নাই—কেবল একটিমাত্র মশারি-টাঙ্গানো লোহার খাট; আর, একটি বেতে ছাওয়ানো গভীর-তল আরাম-চৌকি; নিস্তব্ধ ও দুর্বীপ্য সময়ে সেই চৌকির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে বেশ। কামরার চাঁদোয়া-ছাদে একটি অদ্ভুত দাগ; প্রথম একটি, পরে দুই তিনটি অচল ক্ষুদ্র টিক্‌টিকি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ঘরের আশ-পাশের দীর্ঘ ঢাকা বারাণ্ডায় ক্ষীণদেহ কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী ও সিংহলী ভৃত্যের পাল নিঃশব্দে ও ত্রস্তভাবে যাতায়াত করিতেছে। দীর্ঘকায়, গুরুভার-দেহ য়ুরোপীয়দিগের নিকট এবং যে সকল প্রশান্ত ও পেশীবহুল ইংরাজ সায়াহ্ন-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ঝক্‌ঝকে ক্রিস-দেওয়া সাদা ফ্লানেল বুকের নিকট বাহির করিয়া, মানব অপেক্ষা যেন কোন উৎকৃষ্টতর দুরধিগম্য জীব এইরূপ ভাণ ও ভাবভঙ্গী সহকারে সেই বৃহৎ ভোজনশালায় প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগের নিকট ভৃত্যেরা অত্যন্ত বিনয়াবনত।"

কান্দিনগরে যাইবার সময়ে রেলগাড়িতে ইঙ্গ-বঙ্গের ন্যায়

একজন ইংরাজ-বেশধারী ইঙ্গ-সিংহলীর সহিত গ্রন্থকারের আলাপ হয়। তিনি বলেন,—"কান্দিতে যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিলাম এবং গাড়ির মধ্যে একজন সিংহলী 'জেন্‌টল্‌ম্যানের' সহিত আলাপ হইল। এই 'জেন্‌টল্‌ম্যানটি' অতি সুসভ্য; তাঁহার 'টুয়িড্' কাপড়ের ফতুয়ার পরিধানে কোন খুঁৎ নাই, এমন কি, একজন লণ্ডনের 'ম্যাশর্' তাহা পরিয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারেন। তাঁহার বোদায়ের ছিদ্র জার্ডিনিয়া পুষ্পে ভূষিত; তাঁহার পদদ্বয় কেবল, সাদা সরু কষা পায়জামার মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহার মুখশ্রী প্রায় য়ুরোপীয়। বরং একজন ইটালিয়ান তাঁহার অপেক্ষা অধিক ক্ষীণদেহ, কোমলাঙ্গ ও রৌদ্রদগ্ধ। তাঁহার মুখাবয়ব সকল বহিরুন্মুখ ও অস্থিময়। তাঁহার চক্‌চকে শক্ত কাল কোঁক্‌ড়া দাড়ি। সওয়া ঘণ্টা নীরবতার পর, য়ুরোপের রেলগাড়িতে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। তিনি আমাকে দেশালাই বাক্‌স দিবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, বড় গরম হইতেছে। ইংরাজের দেশে শীতোত্তাপের কথা পাড়িয়াই আলাপের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং দুই জনে আলাপ করিতে হইলে কথার আরম্ভে এই গৌরচন্দ্রিমা নিতান্তই আবশ্যক। এক্ষণে তিনি কতকগুলি সুস্পষ্ট কথায়, সিংহল দ্বীপের লোকসংখ্যা, শাসনপ্রণালী ও ধর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার কথাবার্ত্তায় আমার ধারণা হইল, ইংরাজি ছাঁচের ছাপ তাঁহাতে কতটা গভীর বসিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধতার সহিত ইংরাজি ভাষায় কথা কহেন—তাহাতে কোনপ্রকার অযথা উচ্চারণের টান আছে বলিয়া অনুভব হয় না। ইনি খৃষ্টান্, কৌন্সুলি ও এখানকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। ইনি যেরূপ

ঘৃণামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষসহকারে সিংহলবাসী চাষাদিগের অজ্ঞতা ও পৌত্তলিকতার কথা বলিলেন, তাহা ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরই মুখে শোভা পায়। তবে, তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন হইবে; ইতিমধ্যেই রেল-গাড়ি অনেকটা ভাল কাজ করিয়াছে; লৌহপথের সম্মুখ হইতে অসভ্য প্রদেশসকল যেন পিছু হটিয়া যাইতেছে। কলম্বোতে আমরা কলিকাতা, বোম্বাই ও বারাণসীর ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং কিছুকাল পরে যখন আমরা উপযুক্ত হইব, জাতীয় নির্ব্বাচন-মূলক পার্লামেণ্ট সভা প্রবর্ত্তিত করিবারও আমাদের ইচ্ছা আছে। তাহা অবশ্য অল্পে অল্পে ক্রমশঃ হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না—কারণ, ইংলণ্ডের প্রসাদেই আমরা সভ্যজগতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আরও এই কথা বলেন যে, তিনি 'আর্য্যজাতীয়' এবিষয়ে তাঁহার এতদূর ধ্রুব বিশ্বাস, যেমন আমার ধ্রুব বিশ্বাস আমি ফরাসিস্। সুতরাং, তিনি আপনাকে সকল য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ এবং অনেক য়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যাহাই হউক, ইনি বড় বেশী রকম ইংরেজ; প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ইহাঁর নিকট, ইংরাজই যেন মানবজাতির উৎকৃষ্ট আদর্শস্থল। কিন্তু ইংরাজের এতটা অবিকল 'কাপি' বা অনুলিপি আসলে স্বাভাবিক নহে। তা' ছাড়া, তাঁহার পরিহিত সাদা পায়জামা এবং সেই আসিয়াবাসীসুলভ মুখশ্রীর দুই এক পোঁচ যাহা তাঁহার মুখে জাজ্বল্যমান, তাহার সহিত এই সমস্ত য়ুরোপীয় বাহ্যাড়ম্বর একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আসল কথা, একজন লম্বিতবেণী ও নীল রঙ্গের আলখাল্লা-পরা চীনেম্যানকে ভাল লাগে, তবু জ্যাকেট-

পরা ও বিলাতী টুপিপরা জাপানীকে ভাল লাগে না। এই সকল পীত ও কৃষ্ণচর্ম্মধারী লোকেরা যেরূপ আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত আমাদিগের অনুকরণ করে তাহাতে একটু সন্দেহ জন্মে; মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এই অনুকরণ শুধু উপরি-উপরি ভাসা-ভাসা, না, তাহা ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর যায়?—বাস্তবিক মূলে কি সেই মোগল কিম্বা কাফ্রির রহস্য প্রচ্ছন্ন নাই? এই ব্যক্তি যেরূপে ঠাণ্ডাভাবে বাক্যোচ্চারণ করেন, ইহাঁর চাল্-চোল্ যেরূপ খট্‌খটে ও অনম্য—যেরূপ সবিলম্ব আগ্রহ-শূন্য তাচ্ছিল্যভাবের ভঙ্গী সহকারে সাদা ঝিনুকের বাক্স হইতে ইনি সিগারেট চুরোট বাহির করেন, তাহাতে আমি ইহাঁর প্রতি ধরণধারণে আশ্চর্য্য হইতেছি।”

গ্রন্থকার পণ্ডিচারিতে যখন পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার একজন সহযাত্রী ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। এই কর্ম্মচারীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পণ্ডিচারির দেশীয় ও য়ুরোপীয় তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়াছিল। আমাদের দেশে গবর্ণর প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিবার সময় যেরূপ সৈন্যশ্রেণী রাজপথে দাঁড় করাইয়া দিয়া, বিজয়-তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে নানা অনুষ্ঠান করা হয়, এখানেও তৎসমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তবে, পণ্ডিচারিতে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের তিন শ’ মাত্র সৈন্য। এই তিন শ’ সৈন্য লইয়া অলীক যুদ্ধ প্রদর্শন করা নিতান্ত ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার বিদ্রূপের ভাবে বলেন যে, এই সমারোহের সময়ে ঐ সকল সৈনিকেরা বন্দুকের গুঁতার দ্বারা দেশীয় লোকদিগকে সরাইয়া দিতে ও য়ুরোপীয় দেখিলেই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। সেই সবাগত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পণ্ডিচারির বহু সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিদিগের দস্তুর-মত পরিচয় দান এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের সস্মিত বদনমণ্ডলের ভাব প্রভৃতি গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। যখন সেই পরিচয়দানের অনুষ্ঠান হইতেছিল, মহা জাঁকজমক করিয়া এক-জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবাগত কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া মস্তক নত করিল। ইঁহার হস্তে একটি রৌপ্য-দণ্ড ছিল—পূর্ব্বকালের ইংরাজ-ফরাসীযুদ্ধে, ফরাসীদিগের যখন কামানের গোলা ফুরাইয়া যায়, তখন এই ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষেরা রাশি রাশি খনিজ স্বর্ণপিণ্ড গোলারূপে ব্যবহার করিবার জন্য ফরাসীদিগকে দান করিয়াছিল। তাই তাহার প্রতিদান স্বরূপ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মানার্থ একটি রৌপ্য-দণ্ড বক্‌সিস্ করেন। ইহা নিঃস্বার্থ রাজভক্তির একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থকার এদেশীয় স্ত্রীলোকদের গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। "এই সকল স্ত্রীলোক সাদাসিধা অথচ জমকাল পরিচ্ছদ পরি-ধান করে। ইহারা যখন চলা-ফেরা করে তখন যেমন চক্ষের তৃপ্তি হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। মাথায় পিতলের ঘড়া লইয়া, যেরূপ তাহারা পশ্চাতে একটু হেলিয়া সটান ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তাহাতে তাহাদের সুন্দর গঠন-রেখাসকল প্রকাশ পায়। বিচিত্র রঙের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও, উহাদিগকে দেখিয়া পুরাকালের গ্রীক রমণীদিগকে মনে পড়ে। সেই একই প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দেহভঙ্গী, সেই একই অঙ্গভঙ্গীর প্রশান্তভাব—সেই একই মুক্তবায়ুতে জীবন-যাপন—সেই একই ছোট ছোট মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘরে বাস। এই সকল ঘর নিম্ন, ঠাণ্ডা, সাদা ধব্‌ধবে, চৌকোণা ও আসবাব-বির-হিত; এবং তাহাদের ছায়ায় বসিয়া রমণীগণ সুতাকাটা কার্য্যে নিযুক্ত।"

গ্রন্থকার পণ্ডিচারিতে ডুপ্লের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং

তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা বলেন, "একজন ইংরাজ আমাকে বলেন, ডুপ্লে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি—তিনি আমাদের কিছু কষ্ট দিয়া গিয়াছেন। সীমান্ত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে শুল্ক আদায়ের আড্ডা স্থাপন করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি এবং আমাদের যত চোর সব পলাইয়া তোমাদের ওখানে বাস করে। এই উপনিবেশটি রাখিয়া তোমাদের কি লাভ? একজন ফরাসিস্, তাহার উত্তরে এই কথা বলেন, লাভ আর কিছুই নয়, ইহার অর্থ এই মাত্র, ভারতবর্ষে ডুপ্লের প্রস্তরমূর্ত্তি থাকা আবশ্যক এবং তাহা তাঁহার নিজালয়েই স্থাপিত হওয়া প্রার্থনীয়।"

স্বার্থ ও পরার্থ।

স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুইটা বিরোধ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। অথবা যেদিন হইতে এই বিরোধের আরম্ভ, মনুষ্যের সমাজেরও আরম্ভ সেইদিনে। এই বিরোধের ধারাবাহিক প্রবাহকেই সমাজের জীবন বলিলে বলা চলে। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যে সনাতন বিরোধ দেখা যায়, তাহাও মোটের উপর ইহাই। স্থূলতঃ, স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম অধর্ম্ম। পরার্থের অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম ধর্ম্ম। হয় ত ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা সকল ক্ষেত্রে খাটিবে না; স্বার্থপ্রবৃত্তিমাত্রকে অধর্ম্ম পর্য্যায়ভুক্ত করিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তুমুল সমস্যা হইয়া পড়ে; আবার স্বার্থনিবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ধার্ম্মিকের সংখ্যায়

বিব্রত হইতে হয়। তবে দুই চারিটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ হাতে রাখিয়া ধরিলে মোটামুটি বেশী ভুল না হইতে পারে। যুক্তির কথা ও বিচারের কথা ছাড়িয়া নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকলের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাদের দিকে চাহিলেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম ও নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা বড় নূতন নহে।

বলা বাহুল্য, স্বার্থ পরার্থের এই ঝগড়া মানুষ ভিন্ন অন্য জীবে বড় লক্ষিত হয় না। ইতরজীবের জীবন স্বার্থময়; পরার্থ-প্রবৃত্তি যদি কোথাও দেখা যায়, সেখানে পর অর্থে নিজের সন্তান, জোর সহচর বা সহচরী। ইতরজীবের মধ্যে যাহারা দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগের উদাহরণ দেখা যায়, নৈতিক কাব্যলেখকেরা যে সকল উদাহরণ দুঃশীল মানুষের সম্মুখে উৎসাহের সহিত স্থাপিত করেন, সে সমস্তই তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারজাত; মানুষের মত স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত নহে; তাই নীতিশাস্ত্রের বিচারে তাহাদের স্থান নাই। স্বাধীন ইচ্ছা কথাটা উচ্চারণ করিতে ভয় হয়, কেন না, এই কথাটা উৎকট তর্কসমরের ক্ষেত্র। এস্থলে সে তর্কে প্রবেশের কোন আবশ্যকতা নাই, এইপর্য্যন্ত বলা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইতরজীবে নাই, মনুষ্যসমাজে আছে; কেন না, জাতিবিশেষে ইতরজীব হয় সকলেই ধার্ম্মিক, নয় সকলেই অধার্ম্মিক। মানুষে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক। ইতরজীবে যেমন স্বার্থে পরার্থে বিরোধ নাই, যে সব মানুষের অবস্থা এখনও ইতরজীবের সদৃশ, তাদের মধ্যেও তেমনি এই বিরোধের প্রখরতা দেখা যায় না। কেননা, এই বিরোধের সূত্রপাতেই সমাজের সৃষ্টি; এই বিরোধের স্থায়িত্বেই সমাজের

জীবন; এই বিরোধের বর্ণনাই সমাজের ইতিহাস। এবং সভ্যতা নামে যে সমাজবিশেষের একটা বিশেষণ শুনা যায়, তাহাও এই বিরোধের পরিণতি ও আনুষঙ্গিক ফল।

আর একটা কথা আছে। মানুষের জীবনের সমুদয় কার্য্য স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি এই দুইটি মাত্র পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। সূক্ষ্ম হিসাবে, স্বার্থপ্রবৃত্তি, স্বার্থনিবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি এই তিনটা পর্য্যায় আনিতে হয়।

প্রথম, স্বার্থপ্রবৃত্তি;—যেমন ক্ষুধা পাইলে আহার করিও বলা বাহুল্য, এই উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ আড়ম্বরের দরকার নাই; ভোজনকালে বৃদ্ধের বচন সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়, স্বার্থনিবৃত্তি; যেমন চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না। গুরু-পুরোহিতসম্প্রদায়, লোকশাসন ও রাজশাসন, পুলিশ ও আদালত এই শিক্ষাদানে নিযুক্ত। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বেশীর ভাগই এই উপদেশ।

তৃতীয়, পরার্থপ্রবৃত্তি,—দুঃখীর প্রতি দয়া করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রেই এরূপ বাক্য দুই চারিটা পাওয়া যায়। তবে মানুষের এখন যে অবস্থা, তাহাতে পরার্থপ্রবৃত্তির অপেক্ষা স্বার্থনিবৃত্তির দিকেই বেশী টান দেখা যায়।

এই তিনের সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টাতে জীবন। স্বার্থ কিছু বাহাল রাখিতে হইবে, প্রকৃতির নিয়ম এই—নতুবা জীবন টিঁকে না। পরার্থের জন্য স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমাজ চলিবে না, সমাজের মঙ্গল হইবে না। আর, সমাজের মঙ্গল না হইলে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নাই। একটি ব্যক্তিজীবন রক্ষার উপযোগী, অন্যটি সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক। মানুষ দুর্ব্বল জীব; সমাজে না থাকিলে উৎকট জীবন-

সংগ্রামে তাহার কল্যাণ নাই; তাই যেমন করিয়াই হউক, নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াইতে হইবে; নিজের মুখের গ্রাস পরের মুখে না দিলে চলিবে না। ব্যাখ্যাটা নিতান্ত ইউটিলিটি মতানুযায়ী হইল। কিন্তু অভিব্যক্তির প্রণালী সর্ব্বত্রই এইরূপ; ভালর মূলে মন্দ। তাহাতে পরিতাপ করিয়া বিশেষ ফল নাই।

সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা লইয়া জীবন; কিন্তু সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ ব্যাপার; একেবারে ঘটে কিনা সন্দেহ। কতটুকু নিজের জন্য রাখিব, কতটুকু পরের জন্য রাখিব, মীমাংসা সহজ নহে। পাঁচ জনের পাঁচ মত; আবার মত অনুসারে কাজ হয় না; মতের সহিত কাজের মিল নাই। কাজ প্রধানতঃ প্রবৃত্তির অভিমুখে; মত প্রধানতঃ নিবৃত্তির অভিমুখে। উপদেশদানে যিনি পরম সন্ন্যাসী, কাজের বেলায় তিনি ঘোর বিষয়ী। সংসারের এই একটা প্রধান রহস্য বা আমোদ।

নিবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তনার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সংখ্যাতীত নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। অনেক স্থলে বিবাদ বিসংবাদ, রক্তপাত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর, এই গুরুগম্ভীর উপদেশের অপ্রতুল দেখা যায় না।

স্বার্থ বিসর্জ্জন করিব কেন, সহজেই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রশ্নটার সঙ্গত উত্তর না দিলে উপদেশ নিষ্ফল হয়। তাই ঘোরতর পরার্থবাদীরাও ইহার উত্তর দিয়াছেন, বা নানারূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর দুইচারিটার একটু সমালোচনা করিলে শিক্ষা ত আছেই, আমোদও আছে।

প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম, নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আচরণ কর,

সুখে থাকিবে। ধর্ম্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ; প্রথমে দুঃখ আছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুখ। সুখই যখন জীবনের উদ্দেশ্য, সুখলাভের ইচ্ছাই প্রবৃত্তি, তখন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আপাত-দুঃখে ভয় পাইও না। অর্থাৎ, তোমাকে নিবৃত্তি উপদেশ দিতেছি কেন,—না, শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির অনুযায়ী ফল পাইবে বলিয়া। সংসারের বন্দোবস্তটা খারাপ; কষ্ট না করিলে সুখ হয় না; সেইজন্য কষ্ট করিতে বলিতেছি। পরার্থসাধনে যে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এমন নহে; তবে সেটা লইলে স্বার্থসিদ্ধি ঘটে না। অন্যরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে তোমাকে এ উপদেশ দিতাম না। উত্তরটা কতদূর ধর্ম্মসঙ্গত বলা যায় না; তবে মানুষের মনের মত বটে। প্রলোভন দেখাইয়া যদি কাজ পাওয়া যায়, এ হিসাবে বুদ্ধিমানের উপযুক্তও বলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রলোভনটা প্রলোভনমাত্রই; ধর্ম্মপথে সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কষ্ট পাওয়াই সার হয়, ফললাভ সর্ব্বদা হয় না। অধিক বলা আবশ্যক নহে; ধর্ম্মের জয় সংসারের অখণ্ড নিয়ম হইলে, উপদেশের এত বাড়াবাড়ি হইত না।

সুতরাং উত্তরটা নিখুঁৎ হইল না। কাজেই প্রলোভনের মাত্রাটা চড়াইয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। আমরা কল্পনা বলিয়াই নিরস্ত হইলাম; দুষ্টলোকে বলে প্রতারণা। ইহলোকে সুখ দুর্ঘট বটে, কিন্তু পরলোকে সুখ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম কর, পরকালে সুখে থাকিবে। পরকালের সুখ নানাবিধ;—স্বর্গ, নন্দনকানন, পারিজাত, অপ্সরা, ইন্দ্রত্ব। কেহ এতদূর নামিতে সাহস করেন না; তাঁহাদের মতে ঈশ্বরসামীপ্য, মুক্তি, নির্ব্বাণ। এক শ্রেণীর মতে সুখপ্রাপ্তি; অন্যের মতে দুঃখনিবৃত্তি মাত্র। আবার অন্য উপায়ও আছে। উপদেশমত কাজ কর ভালই,

নতুবা পরকালে ঠকিবে। রৌরব, কুম্ভীপাক, ডাঙ্গশ, গন্ধকের আগুন; অগত্যা ন্যূনপক্ষে পুনর্জন্ম। কিন্তু হইলে কি হয়, দুরন্ত মানব ইহাতেও বশ হয় না। গুরুসমীপে উপদেশের যাথার্থ্য সকলেই মানিয়া লয়; কিন্তু কার্য্যকালে "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ন্যায় অবলম্বন করে। সুতরাং, উত্তরটা যেমনই যুক্তি-যুক্ত হউক, কাজে বড় সফলতা লাভ করে না। মানুষের স্বভাব এমনি দুর্দ্দম্য।

তৃতীয় উত্তর সেই একই কথা, আর একটু ঘুরাইয়া। ধর্ম্মের জয় সত্য; কিন্তু সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলে হইবে না। পরকালের ভরসায় প্রস্তুত নহ; ইহকালে সুখের দাবী করিলেও ঠিক্ থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের জয় মিথ্যা নহে। সর্ব্বত্র না হইতে পারে, মোটের উপর; আজিকালি না হইতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত, ধর্ম্মের জয় অব্যাহত। এইরূপে অর্থের পরিসর বাড়াইয়া ব্যাখ্যা করিলে আর আপত্তি বড় চলে না। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম সমাজ লইয়া। যেখানে সমাজ নাই, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টীকৃত হইয়া সমাজজীবনে পরিণত হয় নাই, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োগ বা অস্তিত্ব নাই। যেখানে সমাজ বাঁধে নাই, সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; পরতন্ত্রতার লেশ নাই। সমাজের আঁটাআঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরাধীনতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। আবার যাহা সমাজরক্ষার অনুকূল, স্থূলতঃ তাহারই নাম ধর্ম্ম; যাহা প্রতিকূল, স্থূলতঃ তাহাই অধর্ম্ম। আবার সমাজের অবস্থা-ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃতিভেদ; সমাজের গতি ও অভিব্যক্তির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অভিব্যক্তি। সুতরাং, যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহারই গতি ঊর্দ্ধমুখে; যেখানে লাঞ্ছনা, তাহার গতি অধো-

মুখে। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পার; বস্তুতঃ প্রকৃতির নির্ব্বাচন প্রণালী, যাহা জীবরাজ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সমাজের পক্ষে তাহারই প্রয়োগমাত্র।

এক কথায় এই;—প্রবৃত্তি নিরোধ কর, তাহাতে ভাল হইবে; তোমার ভাল হইবে সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমাদের ভাল হইবে। আমাদের ভাল হইলে কতকাংশে তোমারও ভাল। সেই পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে প্রলোভন। অন্য প্রলোভন তোমাকে যা' দিই, সেটা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সেটা আমাদের পলিসি। পরের মন্দ করিও না, করিলে শাস্তি দিব; পরের ভাল করিও, তোমাকে সুশীল বলিব।

এইরূপ উত্তরে যুক্তি আছে, সরলতা আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইউটিলিটি ও ক্ষতিলাভগণনাও আছে। আবার আত্মপক্ষে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির অঙ্ক গুরু দেখায়; তাই এরূপ উত্তর ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তনায় সাহায্য করে না; সুতরাং ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে গণ্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার স্থান নাই।

চতুর্থ এক সম্প্রদায়ের একরকম উত্তর আছে; তাহার প্রকৃতি এ তিনের হইতে স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম আচরণ কর, কেন না, ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য। সুখের আশা করিও না, সুখ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখিয়া ডরাইওনা; দুঃখ জীবনের সহচর। কর্ত্তব্য এইমাত্র বোধে ধর্ম্মাচরণ কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি, ইহকালে কি পরকালে, সুখপ্রাপ্তি তোমার যদি ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তোমাকে ধর্ম্মাচারী বলিব না। সমাজের লাভ হইবে কি না গণনা করিয়া, ইউটিলিটির হিসাব ধরিয়া, যদি তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রস্তুত হও, তোমাকে ধার্ম্মিকের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহি না। কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, কর্ত্তব্যপালনই তোমার প্রকৃতিগত

হউক, কর্ত্তব্যপালন বিনা তোমার যেন শান্তি না জন্মে। কেবল করিব, জিজ্ঞাসা করিও না, যুক্তিতর্ক অন্বেষণ করিও না, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। ইহাই প্রকৃতির আদেশ। ইহাই প্রকৃতির নিয়মিত ধর্ম্মশাস্ত্র।

বলা বাহুল্য, সকল শাস্ত্র এই প্রাকৃতিক ধর্ম্মের উপদেশ দেয় না। যে শাস্ত্র দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কোন্ শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অধিবাসীকে বলিতে হইবে না।

কাব্যগ্রন্থ মধ্যে রামায়ণের নায়কনায়িকার চরিত্র এই উপদেশ দেয়। তাই রামায়ণ কাব্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হইতে পারে, এরূপ উপদেশে প্রলোভন নাই, প্রবোধ নাই, সান্ত্বনা নাই। কিন্তু আদর্শ মানুষ প্রবোধ খুঁজে না; কর্ত্তব্য পালন করে। সংসারে প্রবোধ ও সান্ত্বনার অস্তিত্ব নাই।

টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন।

(লিওপার্ডির ইতালীয় হইতে অনুবাদিত।)

বেতাল। আছ কেমন হে টরকোয়াটো?

টাসো। কারাগারে দুঃখযন্ত্রণায় আগ্রীব নিমজ্জিত হ'য়ে লোকে যে কি রকম আরামে থাকে তা'ত তোমার অবিদিত নেই।

বে। আঃ যাও, আহারান্তে এখন কি দুঃখ গাইবার সময়? মনে স্ফূর্ত্তি কর, এস দু'জনে মিলে ভাবনাচিন্তার কথা সব হাস্য-পরিহাসে উড়িয়ে দেওয়া যাক্।

টা। হাসিখেলা আমার তেমন সহজে আসে না। তা যাই হোক্, তোমাকে দেখ্‌লে এবং তোমার কথাবার্ত্তা শুন্‌লে আমি অনেকটা সান্ত্বনা পাই। এস, আমার পাশে এইখানে ব'স।

বে। হুঁ, তুমি ত বল্লে, কিন্তু আমি বসি কি করে'? অশরীরি-দের পক্ষে ও কাজটা তেমন সহজসাধ্য নয়। আমি এই-খানেই রইলুম, ধরে' নাও যেন তোমার পাশেই বসেছি।

টা। হায়, আবার কখন কি লিওনোরার সঙ্গে আমার দেখা হবে! যখনই তার কথা মনে পড়ে তখনই প্রচণ্ড জ্বালার ন্যায় একরকম আনন্দ আমার দেহমন অধিকার করে' ফেলে, মাথার কেশাগ্র হ'তে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দাহ করতে থাকে, শরীরের প্রতি শিরা, প্রতি স্নায়ুটি পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে। তখন, তার বিষয় ভাবতে ভাবতে স্মৃতিতে সেকালের সব আশা ভরসা, সব বাসনা, সব সুখের কল্পনা জেগে ওঠে—ক্ষণিকের জন্য ভুল হয়, যে, দুরদৃষ্ট ও মনুষ্যজাতির সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্ব্বে যেমন ছিলুম আজও বুঝি সেই টাসোই আছি। আর আজকাল? চোখের জলে শুধু মৃত্যুর আবাহন কচ্ছি। আমার বিশ্বাস যে, সমাজের সংস্রবে ও জীবনের নানা কষ্টে আমাদের প্রকৃত ভিতরকার মানুষটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়—আমাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতর তার সমাধি হয়। কখন কখন সেটি দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য জাগ্রত হয়ে ওঠে, কিন্তু দিন যত যায় তার নিদ্রা-ভঙ্গও তত বিরল হ'য়ে আসে। সাধারণতঃ ক্রমে সেটি আমাদের মধ্যে গভীর হ'তে গভীরতম প্রদেশে অন্তর্হিত হয় এবং যত

সময় যায় তার নিদ্রাও তত গাঢ় হ'য়ে আসে। অবশেষে আমরা জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই তার মৃত্যু হয়। যাক্ ও কথা। আমার এই বড় আশ্চর্য্য মনে হয় যে, একটি রমণীর স্মৃতিমাত্রে এমন কি শক্তি নিহিত আছে যে, আমার হৃদয় মনকে আমায় সজীব করে' তুল্‌তে পারে, আমার সমস্ত দুর্গতির কথা ভুলিয়ে দেয়। জানি যে তার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনও দেখা হবার সম্ভাবনা নেই—নইলে ভাবতুম যে, আমার সুখী হবার ক্ষমতা এখনও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি।

বে। প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া এবং তার বিষয় চিন্তা করা, এ দু'য়ের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে বেশী মধুর মনে কর?

টা। বল্‌তে পারিনে। তবে এইটুকু ধ্রুব যে, সমক্ষে তাকে রমণী বলে' জানতুম—চোখের অন্তরালে সে আমার নিকট দেবী-রূপে প্রতীয়মান।

বে। এই দেবীদের কিন্তু মর্ত্ত্যবাসী পুরুষজাতির প্রতি এত করুণা যে, তোমাদের কেউ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁরা নিজেদের দেবীত্ব লুকিয়ে ফেলেন, নিজেদের কিরণ আশপাশ হ'তে সংহার করে' নিয়েএসে, অঞ্চলের অন্তরালে চাপা দেন—পাছে তাঁদের দীপ্ত প্রভায় কারও চোখ ঝল্‌সে যায়।

টা। যা' বলছ তা' খুব ঠিক। কিন্তু তোমার কি এটা স্ত্রী-জাতির একটা মহা ত্রুটি বলে' মনে হয় না, যে, যাচিয়ে নিতে গেলেই ধরা পড়ে, যে, কল্পনায় আমরা তাদের যে রকম গড়ে' তুলি আসলে তারা তা' হ'তে কত বিভিন্ন।

বে। তারা সুধা দিয়ে গঠিত না হ'য়ে রক্তমাংসে গঠিত এতে তাদের যে কি অপরাধ তা' ত আমি ভাল বুঝতে পারিনে। আচ্ছা বল ত, তোমরা রমণীজাতিতে যে প্রকার চরম উৎকর্ষ

থাকা উচিত মনে কর, তার কণামাত্র কিম্বা আভাসমাত্র পৃথিবীর আর কোন পদার্থে কি লক্ষিত হয়? আমার বিশেষ অদ্ভুত এই মনে হয় যে, পুরুষজাতি যে শুধু মানুষ বই আর কিছুই নয়, অর্থাৎ, কিছু অতিরিক্তরূপ শ্রদ্ধা কিম্বা ভালবাসা উদ্রেক করবার মত জীব নয়, এটা তোমাদের কাছে মোটেই বিস্ময়কর নয়—কিন্তু রমণীরা প্রত্যেকে যে এক একটি সুরকন্যা হয়ে জন্মায় নি, এইটেই তোমাদের নিকট একেবারে দুর্বোধ্য ব্যাপার।

টা। তা' যাই হ'ক্—আমি এখন একবারটি তাকে দেখবার জন্য, দুটো মুখের কথা তা'কে শোনাবার জন্য মরে' যাচ্ছি।

বে। আচ্ছা, আজ রাত্রে স্বপ্নে তোমার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করব; সাক্ষাৎ যৌবনের মত সুন্দরী, এবং তোমার প্রতি এতটা অনুকূলা যে, তুমি সাহস করে' মন খুলে অনেক কথা তার সঙ্গে কইতে পারবে যা' জীবনে এর পূর্ব্বে তোমার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নি। অবশেষে আমি তোমার হাত দু'খানি নিয়ে তার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ করে' দেব, আর সে তোমার ঐরূপ ব্যাকুলতা নিরীক্ষণ করে' তোমার অন্তর এতটা মাধুর্য্যে পূর্ণ করে' দেবে যে, তোমার হৃদয়ে সে সুখের স্থান কুলাবে না—আর, আগামী কল্য যখনই এই স্বপ্নের ব্যাপার স্মরণ করবে, অমনি ভালবাসায় তোমার হৃদয় উথলে উঠবে।

টা। বড়ই প্রীত হলুম, সত্যের পরিবর্ত্তে স্বপ্ন!

বে। সত্য পদার্থটি কি?

টা। পাইলেটের অপেক্ষাও এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কম।

বে। ভাল, আমিই তোমার হ'য়ে উত্তর দিচ্ছি। সত্য ও স্বপ্নে অন্য কোনও প্রভেদ নেই—এই ছাড়া যে, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য স্বপ্নে কখন কখন পাওয়া যায়, সত্যে কখনও না।

টা। তাহ'লে সুখের বিষয় স্বপ্ন দেখা ও সুখ ভোগ করা দুই সমান।

বে। আমার মতে তাই। আমি একটি লোককে জানি, যিনি যে রজনীতে কোনও সুস্বপ্নে তাঁর প্রণয়িনীর দেখা পেতেন, তার পর দিন যাতে উক্ত প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ না হয় সেই-রূপ চেষ্টা কর্‌তেন, কারণ, তিনি বেশ জান্‌তেন যে, স্বপ্নে তাঁর কল্পনার উপর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করে' গেছে সেই নিকষে পরীক্ষা ক'রে' নিলে, এঁর যথার্থ হীনতা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়্‌বে; লাভের মধ্যে সত্য তাঁর মন থেকে মায়ার রচিত চিত্র মুছে ফেলে তাঁকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ থেকে বঞ্চিত ক'র্‌বে। এই সব কারণেই পুরাতন গ্রীকজাতি স্বপ্ন যাতে মধুর এবং প্রীতিকর হয় তার নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ক'র্‌ত বলে', তারা তোমাদের উপহাসের পাত্র নয়। মানুষের পক্ষে যা কিছু সুখভোগ করা সম্ভব, সে সমস্ত লাভ কর্‌বার জন্য তাদের তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক যত্ন পরিশ্রম ছিল, তারা সে বিষয়ে তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক সন্ধানজ্ঞ ছিল। পিথাগোরস্, সুস্বপ্নের ব্যাঘাত করে এবং দুঃস্বপ্ন আনয়ন করে বিশ্বাসে, শিম ভক্ষণ নিষেধ করে' গেছেন বলে' কোন-মতেই নিন্দার্হ নন। এবং সেকালে শয্যা অবলম্বন কর্‌বার পূর্ব্বে সুস্বপ্ন কামনায় স্বপ্ন-দেবতা মার্কারীর উদ্দেশে যে সকল প্রার্থনা ও পূজাবিধি প্রচলিত ছিল, সে সকল কুসংস্কার উক্ত কারণেই মার্জ্জনীয়। জাগ্রত অবস্থায় সুখ নেই জেনেই তারা স্বপ্নে সুখের অনুসন্ধান ক'র্‌ত। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকাংশে তারা সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হ'ত। অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে মার্কারী তাদের ঢের বেশী কাজে লেগেছিলেন।

টা। সুখ যদি কেবলমাত্র স্বপ্নেই নিহিত থাকে, অথবা পরম সুখই যদি শুধু স্বপ্নাবস্থাতেই মেলে, তাহ'লে যখন, কি শারীরিক কি মানসিক, সুখলাভই হ'চ্ছে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন শুধু স্বপ্ন দেখবার জন্যই জীবনধারণে প্রবৃত্ত হ'তে হয়—আমি তা'তে রাজি নই।

বে। যখন তুমি ইহলোকে বেঁচে র'য়েছ এবং স্বেচ্ছায় জীবন গ্রাহ্য করে' নিয়েছ—তখনই তুমি উক্ত ব্যাপারে স্বীকৃত ও প্রবৃত্ত হ'য়েছ। তুমি সুখ বল কাকে?

টা। আমার সঙ্গে ও জিনিষের এতটা সাক্ষাৎ পরিচয় নেই যে, ভাল করে' তার বর্ণনা করতে পারি।

বে। পৃথিবীতে সুখ কেউ অনুভবের প্রসাদে জানে না, সকলেই অনুমানের দ্বারা। কারণ, সুখ পদার্থ কাল্পনিক, যথার্থ নয়। ওটা একটা স্পৃহামাত্র, বস্তু নয়। একটি বাসনামাত্র, যা' চিন্তার দ্বারা ধারণা করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না। অথবা ঠিক বাসনাও নয়, একটি ভাবমাত্র। আচ্ছা, এটা কি কখন আবিষ্কার কর নি যে, তোমরা যে সুখের অবস্থা, সমস্ত হৃদয় মনের আরাধনা, নিয়ত চেষ্টা, বর্ণনাতীত ক্লেশ স্বীকারের ফলস্বরূপ লাভ কর, যখন তা' তোমাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত তখন তাতেই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ না করে' মনে মনে তার চেয়েও অধিক সুখের প্রতীক্ষা কর। আর এইরূপে যথার্থ সুখের মুহূর্ত্তগুলি চিরদিনই ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে মজুত রাখ। অবশেষে যে মুহূর্ত্তগুলিতে সুখী হ'তে পারতে, সেগুলি যে মুহূর্ত্তগুলিতে সুখী হবে আশা কর, তাদেরই শ্রেণীভুক্ত করে' দাও। তারা তোমাদের অন্তরে শুধু সময়ান্তরে সুখী হবার অন্ধ আশা সৃজন করে' রেখে যায়। নিজের মনকে সুখ ভোগ করেছি বলে' প্রবোধ

দেবারও সুবিধে হয় এবং অপর লোকের কাছে নিজের সৌভাগ্যের ইতিবৃত্ত প্রকাশ কর্‌বারও অবসর পাওয়া যায়—অন্যের অপেক্ষা নিজের অদৃষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর্‌বার লোভে শুধু নয়, নিজের যা' বিশ্বাস কর্‌বার সাধ আছে অন্যের মনে সে বিশ্বাস উৎপাদন করে' দিতে পারায়ও একটা সন্তোষ আছে। সুতরাং ইহজীবন যেই কেন গ্রাহ্য করে' নিন না—আসলে স্বপ্ন দেখা ব্যতীত তার আর কোনও উৎকৃষ্টতর ব্যবহার কর্‌তে পারেন না। হয় সুখী ছিলুম, নয় সুখী হব, এরূপ বিশ্বাস শুধু মায়ার প্রবঞ্চনা।

টা। আমি বর্ত্তমানে সুখ ভোগ ক'চ্ছি, এরূপ বিশ্বাস কি কারও মনে জন্মান একেবারে অসম্ভব?

বে। যে ওরকম ভাবতে পারে সে বাস্তবিকই সুখী। কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর কর দেখি। জীবনের কোনও মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে খুব সুখী ভেবেছ বলে' কি তোমার মনে পড়ে? চিরকালই অন্তরের সহিত বলে' আসছ এবং আজও ব'লছ "সুখী হব"। কখন কখন এ কথাও বলে' থাক যে, সুখী ছিলুম—কিন্তু সে বিষয় একটু সংশয় বরাবর থাকে। এর থেকেই প্রমাণ হ'চ্ছে যে, সুখের বসতি, হয় অতীতে, নাহয় অনাগতে, বর্ত্তমানে নয়।

টা। তার অর্থ সুখ নামক পদার্থের অস্তিত্ব নেই।

বে। তাই বটে।

টা। স্বপ্নেও নয়?

বে। যথার্থ কথা ব'ল্‌তে গেলে স্বপ্নেও নয়।

টা। কিন্তু জীবনের শুধু মুখ্য নয়, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য এবং অর্থ হ'চ্ছে সুখলাভ। যে উপায়েই উক্ত পদার্থ সংগ্রহ করা যাক্ না কেন।

বে। মানলুম।

টা। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, জীবনের লক্ষ্য মানবের আয়ত্তের বহির্ভূত বলে' মানবজীবন চিরদিনই অসম্পূর্ণ। জীবিত অবস্থার অর্থ,—একটা বিকৃত যন্ত্রণাময় অবস্থা।

বে। কাজেই।

টা। "কাজেই" যে কেন, তা' আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে। তাহ'লে আমরা বেঁচে থাকি কেন? জীবনের ভার বহন ক'র্‌তে কেন স্বীকৃত হই?

বে। আমি তার কি জানি? তোমরা মানুষ, তোমরা এর কারণ আমার চেয়ে ভাল জান।

টা। আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞাসা কর ত শপথ করে' ব'ল্‌তে পারি যে, আমি ত তার কোনও কারণ খুঁজে পাইনে।

বে। তোমাদের ভিতর যে সব মহা মহা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁদের প্রশ্ন ক'র্‌লে তাঁরা হয় ত তোমার এ সমস্যার একটা মীমাংসা করে' দিতে পারেন।

টা। সে পরে করা যাবে। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহ যে, আমার এ জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ। অন্যান্য দুঃখকষ্টের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু মনের অবসাদে আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে' দিচ্ছে।

বে। মনের অবসাদ জিনিষটি কি?

টা। এ বিষয়ে আমার এতটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে, তোমার প্রশ্নের বেশ ভালরকম উত্তর দিতে পারব বলে' আমার বিশ্বাস।

আমার বিবেচনায় অবসাদের সহিত বায়ুর একটা প্রকৃতিগত ঐক্য আছে। যেমন বায়ু বাহ্যজগতের সমস্ত অবকাশে

এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ প্রতি ছিদ্র পূর্ণ করে' অবস্থিতি করে, এবং কোন স্থান হ'তে একটি বস্তু দূরীভূত হ'লে, সেই শূন্য স্থান অধিকার করে' নেয়—তেমনি অন্তর্জগতের যে সকল অংশে সুখ এবং দুঃখ দুই অনুপস্থিত, অবসাদ সে প্রদেশ অধিকার করে' নেয়। এবং গ্রীক দার্শনিকদের মতে জড়জগতে যেমন শূন্য অবিদ্যমান, তেমনি মনজগতেরও কচিৎ কদাচিৎ চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা ছেড়ে দিলে শূন্যাবস্থা নেই। অন্য সর্ব্বদাই, আত্মা দেহবদ্ধই হ'ক্, কি দেহমুক্তই হ'ক্, একটা-না-একটা মনোবৃত্তি অবলম্বন করে' থাকে। তাই সুখদুঃখও যেমন এও ঠিক তদ্রূপ—একটা মানসিক রাগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বে। তোমার সুখসকল লূতাতন্তুর মত অতিসূক্ষ্ম, অতিক্ষীণ, স্বচ্ছ; তাই বায়ু যেমন উর্ণনাভজালের ভিতর সম্যক অনুপ্রবেশ করে, তেমনি তোমার অবসাদ তোমার সুখেরও স্তরে স্তরে প্রবেশ করে' তার প্রতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রটুকু বুজিয়ে রাখে। সত্যি কথা ব'লতে গেলে আমি কিন্তু অবসাদ অর্থে বুঝি অমিশ্র সুখাকাঙ্ক্ষা—চরিতার্থতার দ্বারা অতৃপ্ত এবং কষ্টের পীড়নে অক্ষুণ্ণ। পূর্ব্বেই বলেছি যে, আকাঙ্ক্ষারও কোন কালে নিবৃত্তি নেই এবং এ বিশ্বে সুখও চিরদিনই দুর্লভ। সুতরাং মানবজীবন দুঃখ এবং অবসাদে মিশিয়ে গঠিত এবং নির্ম্মিত। এর একটির হস্ত হ'তে নিস্তার পেতে হ'লে অন্যটির শরণাগত হ'তে হয়। শুধু তোমার বলে' নয়, জগৎশুদ্ধ মানবের অদৃষ্টের এই একই লিখন।

টা। এ অবসাদরূপ রোগের ঔষধ কি?

বে। নিদ্রা, অহিফেন এবং ঐকান্তিক দুঃখ। শেষোক্তটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট, কারণ, মনে যখন কষ্ট থাকে, তখন অবসাদ অনুভব কর্‌বার অবসর পাওয়া যায় না।

টা। অমন ঔষধের পরিবর্ত্তে চিরদিন স্বেচ্ছায় এ ব্যাধি নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকব। কিন্তু নানারূপ কর্ম্মের বিবিধ বৃত্তি অনুসরণে, নানা চিন্তায় ব্যাপৃত থাকলে, যদিচ লোকে অবসাদের হাত থেকে মুক্তি পায় না, তবুও তার অনেকটা উপশম ও লাঘব হয়। আর, আমি এই কারারুদ্ধ অবস্থায়, মানুষের সংসর্গ বিরহিত হ'য়ে, এমন কি, লেখ্‌বার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অবহিত কর্ণে ঘড়ির টক্‌টক্ শুনে, ছাদের কড়ি বরগা, ছিদ্রসকল এবং তত্রস্থ কীটসকলের সংখ্যা নির্ণয় করে', গৃহতলের প্রস্তর পর্য্যবেক্ষণ করে', না হয় ঘরের ভিতর যে দু'টি একটি প্রজাপতি মক্ষিকা দেখা দেয়, একদৃষ্টে তাদেরই আনাগোনা নিরীক্ষণ করে' একই ভাবে দিন কাটাচ্ছি। আমার এমন কোনও অবলম্বন কিম্বা উপায় নেই যার সাহায্যে এই অবসাদের গুরুভার লঘু ক'র্‌তে পারি।

বে। কত দিন হ'তে এ ভাবে দিন কাটাচ্ছ?

টা। বহু সপ্তাহ ধরে'। তুমি ত সবই জান।

বে। সেই প্রথম দিন থেকে এই আজ পর্য্যন্ত তোমার এই একঘেয়ে জীবনে একটুও কি বিচিত্রতা আসে নি?

টা। না, প্রথম প্রথম এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী অসহ্য বোধ হ'ত। কারণ, ক্রমে ক্রমে আমার মনের অন্য অবলম্বন না থাকায় নিজের সঙ্গেই তার বাক্যালাপ করাটা অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে—এখন তাতেই তার কতকটা আমোদ হয়। নিজের সঙ্গে কথোপকথন করা রূপ গুণটি একবার অভ্যস্ত হ'য়ে যাবার পর এখন এমনি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যেন আমার মস্তিষ্কের ভিতর একটা সভা ব'সেছে, আর সকলে মিলে একত্রে তর্ক বিতর্ক ক'চ্ছে। যতই কেন তুচ্ছ হ'ক্ না, একটা

প্রসঙ্গ উপস্থিত হ'লেই তাই নিয়ে আমার মন আমার কাছে মহা বক্তৃতা যুড়ে দেয়।

বে। আশা করি, এইরূপ মনোভাব সময়ে তোমার প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হবে ও এমনি বৃদ্ধি পাবে যে, আবার যদি তুমি জনসমাজে ফিরে যাও, তাহ'লে পাঁচজনের সম্মুখে তুমি সঙ্গীহীন অবস্থার চেয়েও বেশি ফাঁকা-ফাঁকা অনুভব করবে। মনের এইরকম অবস্থাতেই উত্তীর্ণ হওয়াতেই জীবনের যথার্থ পরিণতি। ভেবো না যে এই রকম সফলতা তোমাদের মত দু'চার জনের, চিন্তা করা যাদের চিরাভ্যস্ত, তাদেরই সৌভাগ্যে ঘটে। শীঘ্র হ'ক্ বিলম্বে হ'ক্, একদিন সকলেই এই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হন। মানবসমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, অর্থাৎ এক রকম জীবন থেকে দূরে থাকার, এই এক মহালাভ যে, সকলেরই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে চোখ ফোটে, মায়ার মোহ ভেঙ্গে যায়; তাই আবার দূর থেকে তারা জীবনকে কল্পনার চোখে দেখতে শেখে, পৃথিবী আবার তাদের কাছে সুন্দর ও মহৎ বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানকার যথার্থ বেদনা ও অসারতার কথা বিস্মৃত হ'য়ে লোকে নিজের মনোমত করে' কাল্পনিক পৃথিবী নির্ম্মাণ করে; একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করে ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আবার তাদের পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধা ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে আশা। যদি তখন আবার মানুষের সহিত মেলামেশা ক্ষমতার বহির্ভূত না হয়, তাহ'লে তারা প্রথমবয়সের অনুরূপ মানুষের সহবাসে আমোদ ও আনন্দ অনুভব করে। নির্জ্জনবাস আবার যেন যৌবন এনে দেয়, প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়—কল্পনা আবার নূতন কাজ পায় এবং প্রবীণ হৃদয় হতে সংসারের নিদারুণ নীরস শিক্ষার ফল খসে' পড়ে' আবার তার শ্যামল তরুণতা বিকাশ পায়। আমি

এখন তবে চল্লুম—তোমার দেখ্‌ছি ঘুম পেয়েছে। আর তা'ছাড়া তোমাকে যে স্বপ্ন পাঠাব প্রতিশ্রুত হয়েছি তার জন্যও আয়োজন ক'র্‌তে হবে। এইরূপে স্বপ্নে ও কল্পনায় জীবন অতিবাহিত করে' দাও। মানবলীলার চরম উদ্দেশ্য হ'চ্চে কোন প্রকারে তা' সমাধা করা। জীবনের এই হ'চ্চে একমাত্র লক্ষ্য যা' আমাদের হাতের বাইরে নয়—সুতরাং প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই একএক-বার এই উদ্দেশ্যটির কথা মনে কর। এই উপায়ে জীবনটাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে—যতক্ষণ না সেই চরম সুখের দিন আসে যখন জীবনকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌বে। তোমার এই কারাগারের ভিতর দিন যতটা দীর্ঘ বলে' মনে হয়—যিনি তোমাকে এখানে বদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর প্রাসাদ ও বিলাসকাননেও দিন এর চেয়ে কিছু বেশী শীঘ্র কাটে না। আজ তবে প্রণাম হই।

টা। প্রণাম। কিন্তু শোনো। তোমার কথাবার্ত্তায় যদিচ আমার বিষাদ ঘুচিয়ে না দিক্ ইহাতে তবুও মনে অনেকটা শান্তি আনয়ন করে। অধিকাংশ সময় আমার মন চন্দ্রহীন নক্ষত্রহীন চিররাত্রির অন্ধকারে আবৃত থাকে, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহবাসে থাকি ততক্ষণ সেই রাত্রির অন্ধকার গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে পরিণত হয়। তুমি কোথায় থাক আমাকে অনুগ্রহ করে' যদি বলে' যাও তাহ'লে আমি যখন মন চাবে তোমাকে ডেকে আন্‌ব।

বে। আমার বসতি কোথায় তা আজও জান না? তীব্র মদিরার অভ্যন্তরে।

সারসংগ্রহ।

আকবরের স্বপ্ন।

কাশ্মীরের কোনও মন্দিরের জন্য রচিত আবুল ফজলের একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে :—

হে ঈশ্বর, প্রত্যেক মন্দিরেই আমি সেই সাধুগণের দর্শন লাভ করি যাঁহারা তোমাকে দর্শন করেন, এবং যত ভাষা আমার শ্রুতিগোচর হয় সকল ভাষাতেই ভক্তগণ তোমারই যশোগান করিয়া থাকেন।

বহুদেববাদ এবং ইস্‌লাম তোমাকেই অনুভব করিতে ব্যাকুল।

সকল ধর্ম্মই বলে, তুমি এক এবং অদ্বিতীয়।

মস্‌জিদে ভক্তগণ তোমারই পুণ্য নমাজ উচ্চারণ করেন, এবং খৃষ্টান ভজনালয়ে তোমার প্রতি প্রেম হইতেই মধুর ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়।

আমি কখনও বা খৃষ্টানদিগের গির্জায় যাই, কখনও বা মস্‌জিদে বিচরণ করি।

কিন্তু মন্দির হইতে মন্দিরে আমি কেবল তোমার সন্ধান করিয়াই ফিরি।

তোমার অন্তরঙ্গেরা নব্য ধর্ম্ম বা পিতৃধর্ম্ম লইয়া কালক্ষয় করেন না; কারণ, তোমার সত্যের পশ্চাতে উভয়ের কোনটিই স্থান পায় না।

নব্যপন্থীর জন্য নব্য মত আছে এবং প্রাচীনপন্থীর জন্য পিতৃধর্ম্ম আছে; কিন্তু গোলাপপুষ্পের রেণু সে কেবল গন্ধব্যবসায়ীর হৃদয়ের ধন।

এই প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন "আকবরের স্বপ্ন" নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রতি উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

আবুল ফজল আকবরের প্রিয় সুহৃৎ ও প্রধান সভাসদ। অবসর পাইলেই দুই জনে বিজনে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। দুই জনের হৃদয় এক ছিল, ধর্ম্ম এক ছিল, লক্ষ্য এক ছিল এবং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনেই উভয়ে দেহপাত করিয়াছেন। সম্রাটের প্রিয় বলিয়া গোঁড়া মৌলবীরা আবুল ফজলের প্রতি অত্যন্ত

বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই হতভাগ্য সভাসদ্ মৌলবীদিগের সনাতন পদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সম্রাট্‌কে নিরন্তর বিপথে লইয়া যাইতেছে। ফতেপুর-শিকরীর ইবাদতখানায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া বাদ্‌শাহের সম্মুখে ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন; পণ্ডিতে পণ্ডিতে তুমুল তর্কবিতর্ক হইত; পরাস্ত হইলে মৌলবীরা আবুল ফজলকে অভিশাপ দিতেন এবং সুবিধামত সেলিমের হৃদয়ে পিতৃদ্রোহ উদ্রেক করিয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না।

এই সঙ্কীর্ণ স্বদেশীয় পাণ্ডিত্যের জ্বালায় আবুল ফজল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অজ্ঞ গোঁড়ামির দম্ভ তাঁহার যেমন অসহ্য বোধ হইত, এখানে তেমনি তাহারই মহাধিপত্য। তিনি নিজ-মুখেই বলিয়াছেন যে, মঙ্গোলিয়ার জ্ঞানীগণ কিম্বা লেবাননের সাধুদিগের দর্শনলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিব্বতের লামা কিম্বা পর্ত্তুগালের পাদ্রীর সাক্ষাৎ পাইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, এবং জেন্দাবেস্তা পণ্ডিতগণের সহিত একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইত; কিন্তু এই স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রসঙ্গ শুনিলে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত।

আবুল ফজলকে বুঝিয়াছিলেন কেবল আকবর, এবং আকবরকে যদি কেহ সম্পূর্ণ বুঝিয়া থাকেন ত পণ্ডিত আবুল ফজল। কবি টেনিসন দুই মহৎ হৃদয়ের এই নিভৃত সমবেদনাটুকু দিয়াছেন তাঁহার "আকবরের স্বপ্ন" রচনা করিয়াছেন।

দৃশ্য ফতেপুর-শিকরী। রাত্রিকাল। প্রাসাদসম্মুখে বিষণ্ণ-মুখ সম্রাট্ আকবর, পার্শ্বে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আবুল ফজল। ফজল জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পৃথিবীপতি, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ

দেখিতেছি কেন?" আকবর একবার দূর নক্ষত্রালোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আবুল ফজলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ঠিক বুঝিয়াছ ফজল, যে দারুণ দুঃস্বপ্ন আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে মুখে তাহারই কাল ছায়া। জানি স্বপ্ন শুধু বিম্বের মত ক্ষণিক বিড়ম্বনা, কিন্তু তবু প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর এ স্বপ্ন যেন সত্য না হয়। প্রার্থনা এবং সাধনা—জীবনে প্রার্থনার অবিচলিত অনুসরণ—ইহাই উপাসনা। যে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম না থাকে, মৃতবৎসা প্রসূতির ন্যায় ঈশ্বরের চক্ষে তাহা নিষ্ফল। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বপ্ন যাহাই বলুক্, আমি ন্যায়াচরণ করিতে বিরত থাকিব না—যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এই বাহু শাণিত অসি ধরিয়া বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে, বিজয়লব্ধ বসুন্ধরায় অক্ষয় শান্তি স্থাপন করিয়া সে সেই উদ্দেশ্য সফল করিবে। ঈশ্বর সহায় হউন্!

"আর তুমি যতক্ষণ আমার সহিত একহৃদয়, আমি এখানেও একক নহি; এবং এমন ভরসা রাখি যে, কেবল রাজমুকুট রচনা না করিয়া তোমার সাহায্যে এমন একটি সুন্দর মুকুট রচনা করিতে পারিব যাহা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, সকলেরই শিরোভূষণ হইবে।

"কিন্তু হায়, ঈশ্বরের প্রেমের অক্ষর কেহ বুঝে না। অজ্ঞ নর না তাঁহাকে বুঝে, না আপনাকে জানে। সকলেই সম্প্রদায় বাঁধিয়া চীৎকার করে, 'আমিই একমাত্র সত্যের পথ পাইয়াছি, আর সকলেই জাহান্নমে চলিয়াছে।'

"গোলাপ তবে পদ্মকে ডাকিয়া বলুক্, 'তুমি ফুল নহ—ফুল একমাত্র আমি।' মাধবী তরুলতাকে বলুক্, 'আমিই সুন্দর—তুমি বিড়ম্বনা।' আম্র অন্য ফলকে বলুক্, 'পরমেশ্বর আমা-

সেই মানবের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তোমরা কে হে বাপু?' প্রত্যেক তারা বলিতে থাকুক, 'স্বর্গে আমিই একা।'

"পিঞ্জর যতই সঙ্কীর্ণ হয় গোঁড়ামির গর্জ্জন ততই গুরুতর। আমাদের পণ্ডিতেরা তাই পালঙ্কে শয্যা রচনা করিয়া অহর্নিশি অন্যের নরক-যন্ত্রণাই দেখিতে পান। যত বলি ঈশ্বরের রাজ্যে অশুচি কেহ নাই, ভ্রূকুটিকুটিলমুখ ততই আমার প্রতি তীব্র অভিসম্পাত বর্ষণ করে। সিংহাসনতলে বসিয়া পাণ্ডিত্য আস্ফালন করিয়া মরে, আমি দেখি যেখানে জল অল্প সেইখানেই তোড় প্রবল। মহাসমুদ্রের গম্ভীর উচ্ছ্বাস এখানে শুনা যায় না।

"যখন মনে করি, এই দিল্লীর সিংহাসন পরধর্ম্মের উচ্ছেদ-মানসে বলপ্রয়োগ করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জাবোধ করে নাই, তখন লজ্জায় আমার শির নত হইয়া পড়ে। কাফের শব্দই আমার কর্ণে বজ্রধ্বনি। যে যেরূপ বুঝে আপন আপন ধর্ম্ম পালন করুক। আমি বিধর্ম্মকে রাজত্ববৃদ্ধির কারণ করিতে চাহি না। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—সেই প্রেমস্বরূপের মঙ্গল-ইচ্ছা সম্পাদনই আমার জীবনের কার্য্য। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করা বালকেরই শোভা পায়। বাহ্যানুষ্ঠান ত বেশভূষার মত। কেহ বা ঢিলা কাপড় পরে, কেহ বা আঁটসাঁট ভালবাসে। প্রেমেই আমি মানবে মানবে একতা সম্পাদন করিতে চাহি।

"স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া আমি যেন সেই প্রেমের মিলন-মন্দির গঠন করিয়া তুলিয়াছি। সেখানে সত্য এবং প্রেম এবং ন্যায় এবং শান্তি বিরাজ করিতেছে।

"কিন্তু এ কি! আমারই প্রাণের পুত্র সেলিম একটির পর একটি করিয়া পিতৃমন্দিরের সমস্ত পাষাণ খসাইয়া ফেলিতেছে?

যেন শুনিতে পাইতেছি, সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে সহস্র জাতির ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বিলাপ করিতেছে।

"হায় সখি, এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার চিত্ত বড় অধীর।—কিন্তু এই দুঃস্বপ্নের শেষে একটু যেন আশার আভাস ছিল। দেখিলাম, দূর হইতে কোন্ এক অপরিচিত জাতি আসিয়া আমার সেই জীর্ণ-মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল এবং যে কার্য্য আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই ধীরে ধীরে তাহা সুসম্পন্ন করিল।

"পরমেশ্বর ধন্য—তিনি কাহার দ্বারা কি উদ্দেশ্যসাধন করেন কে জানে!"

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া আসিল। আকবর ও আবুল ফজল পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্ব প্রাসাদে গমন করিলেন। টেনিসনের কাব্য সমাপ্ত হইল।

ঝুটা শিক্ষা।

"নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী"র বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক মাক্সি শিক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটী চিন্তাশীলতার পরিচায়ক ও সারগর্ভ। ইতরসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অভিপ্রায়ে এক্ষণে যে প্রণালীর আশ্রয় লওয়া হইয়াছে এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রতিযোগী পরীক্ষা লেখকের মতে ঝুটা শিক্ষা। আর যে প্রণালীতে পুরাতন বৃটিশ বিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গ শিক্ষিত হইত তাহা আসল শিক্ষা। লেখক বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিতা বা পরীক্ষা, যথার্থতঃ বিদ্য-

বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত নহে। শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয় কয়েকটী বহুশিক্ষার্থীকে একত্রে নৈতিক বন্ধনে ও সমান আচারে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া এবং সমাচারী সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রের উপর যে সকল শক্তি স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া অতর্কিত ভাবে উৎকর্ষ সাধন করে, সেই সকল শক্তিসঞ্চারের অবসর দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য।

এক্ষণে গ্রেটবৃটন্ ও আয়ার্লণ্ডে একটী সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভূত হইয়া দেশময় নিজের জাল বিস্তার করিতেছে। তাহার সংঘর্ষে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রণালী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। তথায় লেখকের মতে সেই বুনিয়াদী দমিততেজ প্রণালী এখনও আধুনিক প্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট।

নূতন শিক্ষাপ্রণালী লেখকের মতে একরকম ত্রিশিরা রাক্ষস। জবরদস্তি শিক্ষা, সস্তা শিক্ষা ও প্রতিযোগী পরীক্ষা রাক্ষসের তিনটি মাথা। বিলাতে পিতামাতা ছেলেমেয়েকে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে দণ্ডিত হয়েন। এই সকল বিদ্যালয়ে অতি সামান্যরূপে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য লেখা-পড়া শিখান হয়। তাহার পর ছাত্রগণ পুরস্কার, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রলোভনে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হয়। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়-নামধারী পরীক্ষাকারী ও উপাধিদাতা যন্ত্রে ছাত্রবর্গ নিষ্পিষ্ট হয়। উপাধি পাইবার জন্য ও সরকারী চাকরীর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রবেশের জন্য পরিমিত সংখ্যক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থে প্রতিযোগী পরীক্ষার শাসন মানিতে হয়।

পুরাণে ত্রিশিরা রাক্ষস এক মুখে বেদ গান করিত। কিন্তু এই অভিনব ত্রিশিরার তিনটি মস্তকই গ্রাসেচ্ছু। যদি পিতা-মাতাকে ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য জোরজবরদস্তি করিতে হয়

তবে, সম্ভ্রান্ত, সম্বতিপন্ন পিতামাতার প্রতিই করা কর্ত্তব্য। যাহাদের পেটে ভাত নাই, গায়ে কাপড় নাই—যাহাদের নিকট ছোট ছোট দু'খানি হাতেরও দাম আছে, তাহাদিগকে জুলুম জুর্দ্দিয়ে পাঠশালায় ছেলেমেয়ে পাঠাইতে বাধ্য করা একটা ঘোর অত্যাচার। আর লেখক বলেন যে, আয়ার্লণ্ডে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই আইনের দ্বারা শাসিত হয়, ভদ্রলোকেরা আইনের আমলে আসেন না।

সস্তা শিক্ষার দোষ এই যে, দু'চার জন প্রতিভাশালী লোক যাঁহারা সকলপ্রকার বাধাবিপত্তি ডিঙ্গাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাঁহারাই বর্ত্তমান নিয়মেও কৃতকার্য্য হ'ন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হইয়া অসন্তোষে কালযাপন করে। নিজের পৈতৃক অবস্থা ইহাঁদের ভাল লাগে না ও উন্নততর অবস্থালাভে ইহাঁরা কৃতকার্য্য হ'ন না। ঈশ্বর গুপ্তের কথাটা বিলাতেও অনেক অংশে সপ্রমাণ হইয়াছে:—

"যত গোপ গোয়ালা
সদরওয়ালা,
—কে বেচ্‌বে গো ঘোল?"

প্রতিযোগী পরীক্ষার টক্করা-টক্করিতে প্রধানতঃ তিনটি দোষ দেখা যায়। প্রথম অপরিণত বয়সে গুরুভারের চাপনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি। দ্বিতীয়, কেবল পরীক্ষায় সফল হইবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রের চরিত্রগঠনের প্রতি নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়েন। এবং তৃতীয়, এইরূপ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লইয়া ছাত্রগণ শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি চরিত্রের উৎকৃষ্ট গুণসকল হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবন্ধটী পড়িলে আপনা হইতেই এদেশের সম্বন্ধে কথাগুলি কতদূর খাটে, বিচার করিবার ইচ্ছা হয়। এদেশে যে শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহা লেখকের বর্ণিত ঝুটা শিক্ষার প্রতিরূপ। আমরা যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "শিক্ষিত সমাজ" ও তাহার অনুযোগী শব্দ ব্যবহার করি, তাহারা এই ঝুটা শিক্ষার আধার। আমাদের দেশে এখনও জবরদস্তি শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু সস্তা শিক্ষা ও প্রতিযোগী পরীক্ষাসম্ভূত শিক্ষাই এদেশের শিক্ষা। প্রস্তাবিত প্রবন্ধটি পড়িয়া হঠাৎ আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষিত লোকের প্রতি আস্থা ভঙ্গ হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হয় যে, এই ঝুটা শিক্ষা প্রচার হইবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কিরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল। এবিষয় বর্ণনা করিতে হইলে আয়ার্লণ্ডদেশ-বৃত্তান্তের সর্পবিষয়ক বিখ্যাত অধ্যায়টি মনে পড়ে। উক্ত অধ্যায়টি এই—

"আয়ারলণ্ডে সর্প নাই।"

টোল ও পাঠশালার শিক্ষার অন্ধকার রজনীর পর সেকেলে ইংরাজি শিক্ষার প্রাতঃসন্ধ্যা, তদনন্তর ঝুটা শিক্ষার সূর্য্যোদয়। টোলে যা' শিক্ষা হইত তাহার কতকটা নিদর্শন, প্রচলিত গল্প, যাহার নায়ক টোলভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ, তাহাতে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। "তৈলের আধার পাত্র, কি, পাত্রের আধার তৈল," ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা। সাধনায় প্রকাশিত "গম্যমানগর্ভিণী-পত্র," এ সমস্যা পূরণও এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত হইতে পারে। "ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি"ও সর্ব্বজনবিদিত। গভীর ভাবে দেখিলে বলিতে হয় যে, স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বড়লোকের মনযোগানে অল্প-

প্রসর ব্যবস্থা উদ্ধার করা ও প্রয়োগাবসরশূন্য ন্যায়দর্শনের শুষ্ক বিধির চর্চ্চা করাই টোলের সর্ব্বস্ব ছিল; আর যাহা ছিল তাহা ব্যাকরণ। "অস্তি" এই ক্রিয়া-রূপের "অং" ধাতুর কতটা অর্থ ও "তি" বিভক্তির কতটা অর্থ, ইহার অনুসন্ধানে বৎসর দুই তিন ক্ষেপণ করা—এইরূপ শিক্ষাই টোলের শিক্ষা। * তাহার পর সেকেলে ইংরাজি শিক্ষা। সেকেলে ও একেলে ইংরাজি শিক্ষার মধ্যে তুলনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সচরাচর এই দুই প্রণালীর শিক্ষার মধ্যে তুলনার অর্থ, এই দুই প্রণালীতে শিক্ষিত লোকের মধ্যে তুলনা। এইরূপ তুলনা উদ্দেশ্যহীন। প্রথমতঃ সেকালে সাধারণ হইতে উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান ছাত্রগণই ইংরাজি শিক্ষার নিয়োজিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা হয়, তাহাদের বয়সের পার্থক্য এত অধিক যে, একদিক দিয়া দেখিলে তুলনা চলেই না। যাহা হউক, ওরূপ তুলনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহা ঠিক যে, ইংরাজি শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষা এদেশে নাই, হইতেও পারে না। তবে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে অনেক দোষও আছে, তাহা বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। শস্তায় বেসরকারী কালেজ ও জীবিত ভাষায় ব্যাকরণ শিক্ষাই ভাষাশিক্ষা, বহু বিষয়ে উপর-উপর শিক্ষা এ সকল প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, নৈতিক উন্নতি, ধর্ম্মগত উন্নতি, রাজনৈতিক উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি, সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার, ইংরাজি শিক্ষা হইতেই হইয়াছে।

---

* ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য রামমোহন রায় লাট আমর্হষ্টকে যে আবেদন করেন, তাহা হইতে এবিষয়ে অনেক কথা পাওয়া যাইবে।

ডায়ারী।

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল—এ সব তুমি কি লিখিয়াছ? আমি যে সকল কথা কখনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?

আমি কহিলাম, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে?

স্রোতস্বিনী কহিল—এমন করিয়া আমি কখনও কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।

আমি কহিলাম—তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিবে? তুমি যতটা বল, তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলি ত বাদ দিতে পারি না।

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, বুঝিল কি না বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম—তোমার ঐ দৃষ্টিপাত, তোমার ঐ মূক প্রশ্ন, তোমার ঐ স্নিগ্ধ স্মিত-হাস্য, তোমার প্রতিদিনের জীবনের সুন্দর স্বচ্ছ প্রবাহ আমি এই কাগজের খাতার কয়খানি পত্রপুটের মধ্যে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিব? তুমি জীবন্ত বর্ত্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ—তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোন

চেষ্টাই করিতে হইতেছে না—কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। তুমি আজ এই স্নিগ্ধ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিয়া আর্দ্র কেশজাল পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া হাস্যপ্রসন্নমুখে যে দু'টি একটি সামান্য কথা বলিলে, তাহা যদি আমাকে লিখিতে হইত, তবে তোমার ঐ কথা কয়টির সহিত এই প্রাতঃকাল, এই স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ, ঐ কণ্ঠস্বর, ঐ সহজ স্নেহমধুর প্রফুল্ল মুখভাব, আমার কিয়দংশ তোমার কিয়দংশ, এই বহির্জগতের কিয়দংশ, সবই ত ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইত। নতুবা অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে—আমি তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি কাজ, অনেকগুলি আকার-ইঙ্গিতের সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না, লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতখানি দেখ আমি ত বাস্তবিক ততখানি নই।

আমি কহিলাম—আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? অসীম দেশকালের মাঝখানে তোমার যে মুখখানি এবং হৃদয়খানি এমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে কি তোমার প্রতি অনন্ত

দেবতার অল্প স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে? একটা প্রবাদ আছে, আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাকে বাড়াইয়া তুলি—সে কথা ঠিক নহে—আসল কথা, যাহাকে ভাল বাসি না, তাহাকে কমাইয়া দিই। এক একটি মানুষের মধ্যে অনন্ত কালের অনন্ত সম্ভাবনা আছে, ভালবাসিলে তবে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করা যায়। একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মত কাহার স্নেহ!

ক্ষিতি ত একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল—এ আবার তুমি কি কথা তুলিলে? স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর একভাবে তাহার উত্তর দিলে।

আমি কহিলাম, জানি। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এমন অসংলগ্ন উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয় ত দশ হাত দূরে আর এক জায়গায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নির্ব্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায়—আমাদের কথোপকথনসভা সেই উৎসবসভা; সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসুন মশায় বসুন বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।

ক্ষিতি কহিল, ঘাট হইয়াছে, তবে তাই কর, কি বলিতেছিলে বল। ক উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না; একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর একটা উত্তর তোমার মনে ওঠে তবে ত কোন কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদ-জাতীয় লোককে

নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়াই ভাল, যাহা মনে আসে বল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল! স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তিও যে, তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে—কিন্তু একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া ওঠে তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারীর একটা চিরাভ্যস্ত কাজ। নিজের কথা নিজে আয়ত্ত করিবার জন্য বকিয়া যাই, লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

আমি কহিলাম—বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার

জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।

ক্ষিতি কহিল, সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত এ সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম মনে হইত যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি বা, এখন দেখিতেছি অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তূপাকার হইয়া বুঝিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি কহিলাম, ভাষা ভূমির মত। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। দিনকতক "ভারতমাতা" শব্দটাকে লইয়া সকলে মিলিয়া এত বারবার ব্যবহার করিত যে, অবশেষে তাহাতে আর ভাব উৎপন্নই হইত না। এখন তাহার পরিবর্ত্তে "আর্য্য" শব্দটা লইয়া সকলে পড়িয়াছে—কথাটার মধ্যে যতটুকু সার ছিল এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছে। যথার্থ ভাবুক যখন পুরাতন ভাষায় একটা নূতন ভাব বপন করেন তখন যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সেই শস্য যেমন একদিকে ভাষা হইতে সমস্ত সার আকর্ষণ করিয়া লয়, তেমনি অন্যদিকে অজস্র পল্লব বর্ষণ করিয়া মাতৃভূমিকে সারাঢ্য করিয়া তোলে। কিন্তু তাহার সহস্র অনুকরণকারীরা তেমন প্রাণবান বীজবপন করিতে পারে না, কেবল ভূমিকে কর্ষণ করিয়া শ্রান্ত করে, ভাষাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়; কতকগুলা শীর্ষহীন, মৃতপ্রায়, শীর্ণ শুষ্ক যষ্টি উদ্গত হয়, তাহারা দেশকে শস্য দেয় না, ভূমিকে সার প্রত্যর্পণ করে না—তাহারা সত্যকে মিথ্যার মত ক্ষীণকায় করিয়া তোলে। "অনন্ত" এবং "অসীম" শব্দটা আজকাল সর্ব্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য যথার্থ একটা কথা বলিবার না থাকিলে ও দুটা শব্দ ব্যবহার

করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—ভাষার প্রতি তোমার ত যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।

সমীরণ এতক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল, এ কি করিয়াছ? তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থই ভূত? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড় বড় ভাল কথাই বলে কিন্তু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল?

আমি বিষণ্ণমুখে কহিলাম—কেন বল দেখি?

সমীরণ কহিল—তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভাল—তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ বাদ দেওয়া যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন বর্ণ কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক্ বাজে কথাগুলো বাদ দিয়া যে একটি নিরেট মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়াছ, তাহাকে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাই।

আমি কহিলাম—সে জন্য কি করিতে হইবে?

সমীরণ কহিল—সে আমি কি জানি! আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে। সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু স্বাদ অতি নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ কতকগুলা মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে।

এই ভ্রমসঙ্কুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বহি নই, আমি তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা, আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্ব্বদা যাহা বলিয়া জানেন, আমি তাহাই।

ব্যোম এতক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেসান দিয়া আর একটা চৌকির উপর পা দুটা তুলিয়া অটল প্রশান্তভাবে বসিয়া ছিল, সে হঠাৎ বলিল—তর্ক বল, তত্ত্ব বল, সমস্যা বল, সিদ্ধান্ত এ উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্র গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ—অমরতা অসমাপ্তি তাহার সর্ব্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রাম-হীন গতিই তাহার প্র লক্ষণ। অমরতাকে কে সংক্ষেপ করিবে, গতির সারা দিতে পারে? ভাল ভাল পাকা কথাগুলি যদি অ গ্রাসভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও তবে ভ্রম হয় মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই—তাহার যতদূর হইব হইয়া গেছে। চেষ্টা ভ্রম অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও অ দারিদ্র্যের মত দেখিতে হয় কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য্য দ্বারাই প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি, জীবন নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের কথাবার্ত্তা চরিত্রে কাঁচা রংটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা, দুর্ব্বলতাটুকু না রাখিয়া তাহাকে একেবারে সাঙ্গ করিয়া ছোট করিয়া ফেলা হয়। অনন্ত পর্ব্বের পালা একেবারে সূচিপত্রেই সারিয়া দেওয়া হ

সমীরণ কহিল—মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতি —এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়। কেবল

ধ্যে তাহার গতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়; যদি একটা
উপস্থিত কর তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি
টা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না; তাহাকে চালাইতে
তাহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে, তাহার অত্যন্ত
যাইবার জন্য তাহাকে অন্যমনস্কভাবেই দেখাইতে হইবে।
মি কহিলাম, সেইটাই ত কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝা-
যে এখনো শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গীটি
বিষম ব্যাপার।

তন্বিনী কহিল—এই জন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া
তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না,
ভঙ্গীটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার
ছি, ভাল বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের
অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেই-
ধান হইয়া উঠে।

মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল—
বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গীটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে
আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। দেহটা শ্রেষ্ঠ, না,
টা শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার কেমন করিয়া করিবে? দেহ না
ল জীবন থাকে না, জীবন না থাকিলে দেহ থাকে না; কিন্তু
বনটাকে যেন শ্রেষ্ঠ মনে হয়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গীটা
। দেহটা বর্ত্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অস-
তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের
বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা
ক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব
না জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে

ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু ভঙ্গ তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, ত তাহার বুদ্ধিশক্তি তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

সমীরণ কহিল—সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাত আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।

স্রোতস্বিনী কহিল—আমার মনে হয় মানুষের প একই কথা। এক একজন মানুষ এমন একটি মনে লইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা মনুষ্যত্বের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।

দীপ্তি কহিল—মনের এবং চরিত্রের সেই আ আমাদের ষ্টাইল্। সেইটের দ্বারাই আমরা পরস্পরের প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি একএকব আমার ষ্টাইলটা কি রকমের! সমালোচকেরা যাহাকে বলে তাহা নহে—

সমীরণ কহিল—কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আকৃতি কহিলে, যেটা বিশেষরূপে আমাদের আপনার, আমিও কথা বলিতেছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।

দীপ্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—কিন্তু চেহারা সকলের সম অতএব অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা কর শুক। কোন চেহারায় বা প্রকাশ করে, কোন চেহা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতই মান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ফেলিতে হয় না, কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই আলোকটুকু বাহির হয়। আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর

শোভা পায় না, যে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় ছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব, যাহার যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটা নূতন শিক্ষা, আনন্দ। সে যেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে ই যথেষ্ট। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর াস বাহির করিতে হয়। শাঁসটুকু যদি বাহির হয় তবে ই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ, তাহাই বা কয়জন র আছে এবং কয়জন বাহির করিয়া দিতে পারে!

মীরণ হাস্যমুখে কহিল, মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তৃণ দীনতা আমি কখনও স্বপ্নেও অনুভব করি না। বরঞ্চ অনেক ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনু- হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরীর শায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার র হইতেছে, পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহ- তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না—মনে হইত মানুষগুলা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লই- সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে কিন্তু "ভোলা মন, ও া মন, মানুষ কেন চিন্‌লি না!" ভোলা মন, এই সংসারের ানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্, এই মানবহৃদয়ের ুর মধ্যে! সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে ারা কথা কহিবে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপে- হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে, বীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব াদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জ্জ-

নের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন মহাকাব্যের নায়ক; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজাতি আছে, সেই আ কোন্ নব দৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে

আমি কহিলাম—না করিলে কি এমন আসে যায়। পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালব করিয়া একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে ব দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না—সে সামান্য লোক ছিল। একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে "পিসিমা" "পি করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌর ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা সেই যে একটী অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্ব্বোধ লোক বসিয়া ব ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান ব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। বেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে ধরাইয়া প্রাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগ্‌বগ্ করিয়া না উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসি কথা ভাবিত না? এক দিন যে তাহার সকলে ভুল হইল, ি যিল হইল না,—তাহার উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট সে লা হইল, সে দিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পী সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের ম

র জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্রহৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা
! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণা
তরভা উদ্বেগ জড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই
র্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে
্যমান হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম, এই তুচ্ছ লোকটিকে
কোন মতে বাঁচাইতে পারি তবে এক বৃহৎ কাজ করা
সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু
সার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—
ার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন
মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য
স কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই,
বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি উন্নত
স আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু
াকপোষাকসমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা,
াও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি
াশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মত দীপ্তিহীন ছোট
লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে
—পিসিমার ভালবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান
া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না,
খানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় মানুষে
পূর্ণ।

ভ্রাতৃবিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল—তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির
তোমার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা
নিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানী বেহারা নীহরকে মনে পড়ে।
ত দুটি শিশুসন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে।

এখন যে কাজ কর্ম্ম করে, দুপুরবেলা বসিয়া বসিয়া [illegible] কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মত হইয়া গেছে [illegible] যখনই দেখি কষ্ট হয়—কিন্তু সে কষ্ট যেন ইহার এ[illegible] নহে—আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় [illegible] মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম—তাহার কারণ, উহার যে ব্যথা [illegible] বের সেই ব্যথা। সমস্ত মানুষই ভালবাসে এবং [illegible] মৃত্যু দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়া[illegible] আনন্দহারা বিষণ্ণমুখে সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের [illegible] হইয়া রহিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিল—কেবল তাহাই নয়। মনে হ[illegible] যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে? কত দুঃখ আছে [illegible] বের সান্ত্বনা কোনকালে প্রবেশও করে না অথচ [illegible] আছে যেখানে ভালবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া [illegible] দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্য্যসহকারে মূকভাবে [illegible] যাইতেছে, ছেলে দুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া [illegible] কারণপূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুখ ফিরাইয়া [illegible] বার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে [illegible] না; জীবনে আনন্দ অল্প অথচ পেটের জ্বালা কম ন[illegible] যত বড় দুর্ঘটনাই ঘটুক দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নি[illegible] চালাইতেই হইবে, কোন ত্রুটি হইলে কেহ আপ[illegible] যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যা[illegible] কষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবি[illegible] দিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই—এবং [illegible] স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না, তখন